সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৮

সুভাষ-রচনাবলী

৪

উপদেষ্টামণ্ডলী

সভাপতি

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

সদস্যগণ

শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী — শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ

ড. অশোকনাথ বসু — শ্রীসমর গুহ

প্রধান সম্পাদক

শ্রীসুনীল দাস

জয়শ্রী প্রকাশন। কলিকাতা ২৬

SUBHAS-RACHANAVALI— Vol. IV
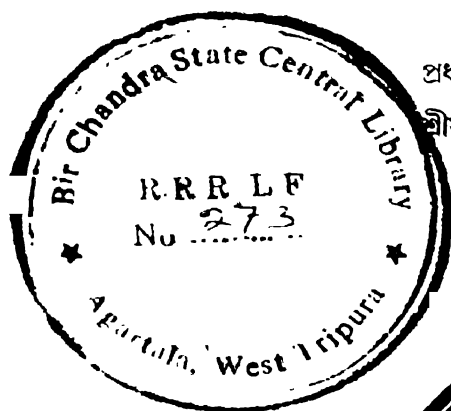
চতুর্থ খণ্ড

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : শ্রীবিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলিকাতা ২৬

মুদ্রক : শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স। ১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

গ্রন্থক : সেঞ্চুরি বাইন্ডিং কোম্পানি
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়েও বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য শক্তি ভারত-ত্যাগে বাধ্য হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের প্রত্যাঘাতে। বস্তুত, মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্রের জীবন-ঐতিহ্য এ যুগের এক সাপ্নেয় বিস্ময়— বৈপ্লবিক নেতৃত্বের কল্পনায় যার মূল্যায়ন আজও রয়েছে অনন্য ও অপ্রতিম। একটি আদর্শবাদী নেতৃত্ব দুর্জয় প্রত্যয়, দুর্নিবার সংকল্প এবং শঙ্কাহীন নির্ভীকতায় কী উত্তুঙ্গ-আরোহী হতে পারে—সুভাষ-জীবন তার এক জ্যোতিরাত্মিক উত্তরণ। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে, সুভাষচন্দ্রের জীবন-বাণীর এই মহাসম্পদ আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সুপরিকল্পিত অবহেলায় আজও রয়েছে অনাদৃত ও উপেক্ষিত।

১৯৩৬-৩৮ সাল সুভাষজীবন-ঐতিহ্যের একটি বিশিষ্ট কাল। এই সময়েই সুভাষচন্দ্রের মননায় পূর্ণতর হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন-দর্শনের সুনিবিড় প্রতীতি ; সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছিন্নতাবোধ ; গড়ে উঠেছে ভাবী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মৌল চিন্তাধারা। সেইসঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্বের প্রত্যাসন্নতা সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হয়েছে তাঁর দূরদৃষ্টি। এই সময়েই তাঁর সত্যসন্ধ অন্তর্লোকে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে সেই চিরন্তন ভারত-পথিকের পরম আহ্বান। সুভাষচন্দ্রের অন্তরাত্মাকে জানার জন্য, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ গতি ও প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য— এই সময়কার সুভাষ-মননার মূল্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ খণ্ড সুভাষ-রচনাবলী সেই মৌল মননার একটি সুনির্বাচিত সঞ্চয়ন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বীর্যদীপ্তি যুদ্ধোত্তর ভারতের জনমানসকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল আকস্মিক আবির্ভূত এক বহ্নিমান জ্যোতিষ্কের মতো। কিন্তু কোন্ উৎস থেকে এই প্রচণ্ড সৌর প্রভার উৎসারণ, আজও তার অনুসন্ধান ও অনুধাবনে জাতীয় উদ্যম যথাযোগ্যভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। ভারতের স্বাধীনতাকে জাতীয় জীবনবেদের নতুন প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তোলার জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনে সুভাষচন্দ্রের জীবন-বাণী জানা এবং জাতীয় মানসের সর্বস্তরে

পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া— এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। 'সুভাষ-রচনাবলী'— এই জাতীয় কর্তব্য পালনের একটি সুনিষ্ঠ প্রয়াস। আশা করি, এই পবিত্র প্রয়াস স্বদেশপ্রেমিক জনমনে সাগ্রহ সমাদর লাভ করে সার্থক হয়ে উঠবে।

কলিকাতা

মুখবন্ধ

১৯৩৩-এর মার্চ থেকে ১৯৩৬-এর মার্চ পর্যন্ত প্রায় সবটা সময়ই সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ-প্রবাসে কেটে গেল। মাঝখানে ১৯৩৪-এর ২৯ নভেম্বর থেকে ১৯৩৫-এর ২০ জানুয়ারি, কয়েকটি সপ্তাহ, ইউরোপ থেকে কলকাতা যাতায়াত এবং পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য সেখানে অবস্থানে অতিবাহিত হয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে চিকিৎসার জন্য বোম্বাই থেকে ইউরোপে রওয়ানা হবার মুখে ১৯৩৩ ২৩ ফেব্রুয়ারি 'এস্. এস্. গাঙ্গে' জাহাজে উঠবার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। আবার দীর্ঘ চিকিৎসার পর ১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে সে-বছর ৮ এপ্রিল ইউরোপ থেকে 'এস এস কান্টে ভার্ডে' জাহাজে বোম্বাই পেঁছানো মাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

'কান্টে ভার্ডে' জাহাজটি বোম্বাই-এর পথে পোর্ট সৈয়দ-এ পেঁছানো মাত্র পুলিস অফিসারেরা সুভাষচন্দ্রের পাসপোর্ট কেড়ে নেয় এবং তিনি ঈজিপ্টে নেমে কোনো মিশরীয় নেতার সঙ্গে যাতে সংযোগ স্থাপন না করতে পারেন, সেজন্য পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়। ২৭ মার্চ জাহাজে বোম্বাই অভিমুখে রওয়ানা হবার পূর্বে সে-মাসের গোড়ার দিকে ভিয়েনার বৃটিশ কন্সাল জে. ডবলিউ. টেলর তাঁকে পত্রযোগে সাবধান করে দেন যে ভারতবর্ষে ফিরলে তাঁকে মুক্ত থাকতে দেওয়া হবে না: "...the Government of India have seen in the Press statements that you propose to return to India this month and the Government of India desire to make it clear to you that should you do so, you cannot expect to remain at liberty."

যে-সময় এই হুমকিটি অস্ট্রিয়ায় বাদগাস্টাইন-এ সুভাষচন্দ্রের হাতে পেঁছয়, জওহরলাল সে-সময় জার্মানীর বাডেনভাইলারে চিকিৎসার জন্য অবস্থানরত শ্রীমতী কমলা নেহরুর সংকটজনক অবস্থার সংবাদে মুক্তি পেয়ে সেখানে এসে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডের লসেনের এক স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৩৬-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি এই স্বাস্থ্যনিবাসে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতেই শ্রীমতী কমলা নেহরু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুতরাং, ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সাল টেলরের হুমকি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে জানাবার সুযোগ পান। ১৯৩৬-এর ১৩ মার্চ জওহরলালকে লেখা পত্রে সুভাষচন্দ্র খোলাখুলিই লিখলেন: "আমার এই মুহূর্তের ইচ্ছা··· এই হুমকি

অগ্রাহ্য করে বাড়ি ফেরা।" করলেনও তাই। সেই পত্রে আরও লিখলেন "... And going home now means going to prison. Of course, going to prison also has its public utility and there is much to be said in favour of defying an official order like this and deliberately courting imprisonment." (*A Bunch of Old Letters* : Jawharlal Nehru.)

১৯৩৩-এর ইউরোপ-যাত্রা চিকিৎসার জন্য অনিবার্য হয়ে উঠলেও ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ মূল্যায়নের, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে উৎসাহের সঞ্চারের এবং বিভিন্ন দেশে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের অনুকূল সংগঠম গড়ে তুলবার লক্ষ্য সামনে রেখে সুভাষচন্দ্র প্রবাসের দিনগুলিকে সার্থক করে তুলতে গোড়া থেকেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেজন্য তিনি ইউরোপের সব দেশগুলিতেই তাঁর এবারকার প্রবাসের সময় যাবার জন্য উদ্যোগী হলেও, ইংল্যান্ডে এবং সোভিয়েত রুশে প্রবেশাধিকার পান নি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে ইংল্যান্ডে যাবার অনুমতি দেন নি। আর ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে ওয়ারশ' থেকে মস্কো যেতে চাইলে সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তাঁকে ভিসা দিলেন না। গোড়ায় তাঁর এ-যাত্রার পাসপোর্টে জার্মানী প্রবেশের অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু ভিয়েনায় পেঁছাবার দুই মাসের মধ্যেই সেখানকার চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে জার্মানীতে যাবার অনুমতি পেলেন। সুতরাং, ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রুশ বাদে তিনি ১৯৩৩ মার্চ থেকে ১৯৩৬ মার্চ গোটা ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন এবং ইটালী ও জার্মানীতে যান বেশ কয়েকবার। এই ক'বছর সুভাষচন্দ্র ইউরোপে কার্যত ভারতের বে-সরকারী রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সংগে ভারতের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। ভিয়েনায় তিনি অস্ট্রিয়ান-ইন্ডিয়ান সোসাইটি গঠন করে এই কাজে প্রভূত সারা পান।

১৯৩৩-র ডিসেম্বর রোমে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করলেন মুসোলিনি স্বয়ং, ইটালী সরকার এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। এই ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনের পরই ইউরোপে প্রবাসী প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রদের কংগ্রেস— Congress of Oriental students in Europe— অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই কংগ্রেসে ভাষণ দিয়ে সমবেত আরব, ইজরাইল, চীন, ভারত, ইরানের ছাত্রবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। প্রবাসী ভারতীয়

ছাত্রদের রোমে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে একই সময়ে একটি ফেডারেশন গঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে ম্যাটসিনির চিন্তাধারায় জাতীয় ঐক্যসাধনের বৈপ্লবিক আবেদন সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার আলোচনায় অনেকটা স্থান জুড়ে থাকত।

এই ডিসেম্বরে রোমে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের দুইবার মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ১৯৩৪-এর এপ্রিলে মুসোলিনির আমন্ত্রণে তিনি আর-একবার রোমে যান এবং ক্রমাগত তিনদিন মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। ১৯৩৫-এর জানুয়ারির শেষে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবার পর ইউরোপে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর গ্রন্থ *The Indian Struggle 1920-1934* উপহার দেন। জার্মানীতে ন্যাশনাল স্যোসালিস্ট পার্টি ও তার নেতা হিটলারের উগ্র বর্ণমন্যতার নীতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ১৯৩৪-এর গোড়াতেই মিউনিখের 'ইন্ডিয়ান কমিটি অফ্ দি জার্মান আকাডেমি'র কাছে এবং জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত বর্ণ-সম্পর্কিত আইনের এবং সাধারণভাবে জার্মান জনসাধারণের ভারতীয়দের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈরীসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি অনতিবিলম্বে জার্মানীর কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী মুখপাত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ জানালেন। প্রসঙ্গত, তিনি মুসোলিনি এবং চেকোস্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডোয়ার্ড বেনেস-এর সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারেরও উল্লেখ করেন। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলার ডিয়েকহফ্ ছাড়া কারো সাক্ষাৎ তিনি পেলেন না। ডিয়েকহফ্ স্তোকবাক্য দিয়ে তাঁকে শান্ত করবার জন্য বলেন: "that in Germany no responsible person would think of hurting Indians or Indian feelings"... ("Hitler and India : Von Johannes. H. Voigt : *INDO GERMAN* March/June 1919, pp. 18)।

প্রাগে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডওয়ার্ড বেনেস-এর সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে, বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, প্রবাসে গ্রেট ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সহায়তায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চেক মুক্তিবাহিনীর গঠন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করেন। ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক লেসনীর সহায়তায় ১৯৩৪-এ প্রাগে চেক-ভারত সমিতি গঠন করে সুভাষচন্দ্র তার উদ্বোধনী সভায় সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ভাষণ

দেন। প্রাগ থেকে তিনি পোল্যান্ডের ওয়ারস যান এবং সেখানে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রুশীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জাপানে সামরিক শিক্ষণপ্রাপ্ত পোলিশ লিজিয়ন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

জার্মান-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্ররাও নাৎসীদের বর্ণমন্যতার নীতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি করে ১৯৩৪-এর মার্চে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে স্মারকপত্র পাঠালেন। এর উত্তরে জার্মান বর্ণনীতি নির্ধারক দপ্তর থেকে বলা হ'ল জার্মান-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের উদ্বেগের কোনো কারণ নাই। জার্মান রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির ওপর অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই মৌখিক সাফাই গাওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগের দিক থেকে নাৎসীদের ভারত-বিরোধী আচার-আচরণ অব্যাহত রইল। সুভাষ-চন্দ্র তখন অন্য পথ ধরলেন। জার্মানীতে ভারতীয় ছাত্র এবং প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ বর্ণনা করে ভারতেও জার্মানীর অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্যকর পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে ভারতীয় যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য অতঃপর জার্মানীতে না পাঠিয়ে ইটালী, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়াতে পাঠাতে বলেন (S. C. Bose : "Practical Training Abroad For Indian Students", *Advance* [Calcutta] : Aug 25, 1935)। সুভাষচন্দ্রের নিরন্তর প্রতিবাদে নাৎসী নেতারা পররাষ্ট্রনীতিতে উগ্র জাতিমন্যতা স্তিমিত ক'রে স্বীকার ক'রে নেয় যে আদর্শনৈতিক কারণে আর্থিক স্বার্থের ক্ষতিসাধন তাদের কাম্য নয় : "...they had no intention of sacrificing material interests to ideological principles." (Von. J.H. Voigt : "Hitler and India", *Indo German* : p. 20)। জার্মানীর বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের নূতন অর্থ-নৈতিক প্রচাব-অভিযানে হিটলারও যে বিচলিত হয়ে উঠেছেন, ১৯৩৫, ৬ ডিসেম্বর ইন্ডো-জার্মান নিউজ এক্সচেঞ্জ-এর ডিরেক্টর ড. এ. এল. সিন্‌হাকে সাক্ষাৎকার দিয়ে হিটলার তা সপ্রমাণ করেন।

Voigt উক্ত প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন ১৯৩৬ জানুয়ারিতে সুভাষচন্দ্র জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলার ডিয়েক্‌হফ্‌-এর (Dieckhoff) সঙ্গে দ্বিতীয়-বার বা শেষ সাক্ষাতের সময় এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে ব্রিটেনের প্রতি মৈত্রীসুলভ নীতির সম্পর্ক বজায় রাখা সত্ত্বেও জার্মানী ভারত-ব্রিটেন বিরোধে নিরপেক্ষ থাকবে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্বার্থসংঘাতে জার্মানীকে সুভাষচন্দ্র বরাবরই ব্রিটেনের বৈরী-

রূপে স্থাপন করে এসেছেন। সুতরাং, শত্রুর শত্রুর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে স্বাভাবিক কৌশলগত হিসাব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সরকার ঘোষণা করেছিলেন যুদ্ধে জয়ী হলে তারা আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতা দেবেন, এই নজীরও সুভাষচন্দ্রকে জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল।

এই কয়েক বৎসর ইউরোপ-প্রবাসে থাকাকালীন 'লীগ অফ্ নেশনস্' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে কোনো ভূমিকায় নিয়োজিত হতে পারে কিনা সে-পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কুক্ষিগত ছিল। এই সংস্থার সদস্যরূপে ভারতের অর্থব্যয় অপচয়ের নামান্তর মাত্র। সুতরাং, ভারতের এই সংস্থা বর্জন জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য অপরিহার্য। এই সংস্থা বর্জনের সপক্ষে প্রচার করে সুভাষচন্দ্র অনুকূল জনমতও সৃষ্টি করেছিলেন। বরং তিনি জেনেভায় অবস্থিত "ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্ডিয়া" নামক সংগঠনের সহযোগে ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় ইস্তাহার প্রকাশ ও ব্যাপক প্রচারে সহায়তা ক'রে ভারতীয় সংগ্রামের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতে সফল হন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মাদাম ই. হোরাপ (Madame E. Horup) নামক এক ড্যানিস মহিলা।

এই সময়কার প্রবাসে তিনি যেমন বার বার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ত্বরিৎ সফর করেছেন, ব্রিটিশ গোয়েন্দারাও তেমনি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। তাদের কাজই ছিল শুধু সংবাদ সংগ্রহ নয়, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশে সম্ভব হলে প্রচার বন্ধ করা, না হলে প্রচার খর্ব করা। এই গোয়েন্দারা তাঁকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে কম্যুনিস্টরূপে প্রচার করে তাঁর আবেদন যেমন খর্ব করতে উদ্যোগী হয়েছেন, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে তাঁকে ফ্যাসিস্টরূপে চিত্রিত ক'রে একই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হয়েছেন (*The Indian Struggle* 1920-42, p. 327)। এই বিরূপ পরিস্থিতিতেও ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক সংগ্রামের এই প্রস্তুতিপর্বে বাছাই করা ব্যক্তিদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং কোনো কোনো দেশে ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি রচনার জন্য পৃথক সংগঠন পত্তনেও উৎসাহ দিয়েছেন।

এবারকার প্রবাসে থাকাকালীন আগামী দিনের ঘটনার প্রবণতা জানবার জন্য বহু দেশ একাধিকবার পরিক্রমার উপান্তে সুভাষচন্দ্র আয়ারল্যান্ডে পৌঁছে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের এবং আয়ারল্যান্ডের

রিপাবলিকান আন্দোলনের নেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বৈপ্লবিক কর্মকৌশল সুভাষচন্দ্রকে সেই বিশ দশকের গোড়া থেকেই আকর্ষণ করেছে। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে ভারতীয় বিপ্লবীদের মানসিক সম্পর্ক প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন আয়ারল্যান্ডের ইস্টার বিদ্রোহের আমল থেকে। এই কারণেই সুভাষচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ *The Indian Struggle* 1920-42-এ ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের পৃষ্ঠভূমিকায় আইরিশ সংগ্রামীদের বৈপ্লবিক কৌশলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন।

দেশে ফিরবার পূর্বে, আয়ারল্যান্ডে যাবার মুখে ব্রিটেন বাদ সাধতে পারে। সেজন্য তাঁকে অত্যন্ত সংগোপনে আয়ারল্যান্ড যাবার উদ্যোগ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। ইন্ডিয়ান-আইরিশ ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সম্পাদিকা শ্রীমতী এফ. এম. উড্‌সকে ফ্রান্সের নিস থেকে (সুভাষ-রচনাবলী ৩য় খণ্ড : পৃ. ৩২৮-৩১) ৭. ১২.৩৩ এর চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখছেন : ‘আমার ইউনাইটেড কিংডম-এ যাওয়া নিষেধ থাকলেও আইরিশ ফ্রি স্টেট গভর্নমেন্ট আমাকে আয়ারল্যান্ড পরিদর্শনে অনুমতি দেবেন। কিন্তু এটা অতিশয় গোপনীয় রাখতে হবে। কারণ আমার কিছু সুহৃদ আমার ইংলন্ডে যাবার অনুমতি সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি জানতে পারে যে আমি আয়ারল্যান্ডে যাবার পরিকল্পনা করছি তারা বাধা দেবে এবং আমাকে কখনোই ইংল্যান্ডে যাবার পাসপোর্ট দেবে না।• তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ইংল্যান্ডে যাবার প্রস্তাবটির সমাধান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আয়ারল্যান্ড যাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরব থাকতে চাই।’

আয়ারল্যান্ড ও আইরিশ বিপ্লবীদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত প্রত্যয় তাঁর বিপ্লব-চিন্তায় গভীর স্থান করে নিয়েছিল। কী মমত্ববোধ নিয়ে যে তাঁদের ইতিহাস তিনি অনুধাবন করেছেন, এই পত্রের কোনো কোনো ছত্রে তা উপচে পড়েছে! তিনি বলছেন : ‘আমার দেশের যে অঞ্চলের আমি অধিবাসী, সেখানকার স্বাধীনতাকামী নরনারীবৃন্দ সাম্প্রতিক আইরিশ ইতিহাস গভীর মনোযোগের সংগে পড়ে থাকেন এবং বহু গৃহে বহু আইরিশ ব্যক্তি-মানুষ দেবতার মতো পূজিত হয়ে থাকেন’— “In my part of the country (Bengal), recent Irish history is studied closely by freedom-loving men and women and several Irish characters are literally worshipped in many a home.” ১৯৩৪-এর ২১ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী উড্‌সকে একটি পত্রে দুঃখ করে লিখছেন : ‘আমার বহু দেশবাসী লন্ডন যান, কিন্তু

ডাবলিন যান না। সেখানে গেলে সেই-সব জীবন্ত মানুষদের সাক্ষাৎ পেতেন, যাঁরা ইতিহাস রচনা করেছেন বা করছেন'। এই পত্রে আবার তিনি বলেছেন: 'ভারতবর্ষের যে অঞ্চলের আমি অধিবাসী সেখানে অর্থাৎ বাংলায়, এমন কোনো শিক্ষিত পরিবার নেই যাঁরা আইরিশ বীরদের ইতিহাস শুধু যে পড়েন তা নয়, রুদ্ধশ্বাসে গ্রাসও করেন। বর্তমানে আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে গ্রন্থ দুর্লভ হয়ে উঠেছে, কারণ গভর্নমেন্ট মনে করেন আইরিশ বিপ্লবীদের কাহিনী ভারতীয় জন-সাধারণের চোখ খুলে দেবে।'

এই পত্রেই জানা যায় ইংলন্ডে যাবার সরকারী অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হলেও প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার আইরিশ ফ্রী-স্টেট সরকার তাঁকে সেখানে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি লিখছেন ইউরোপ থেকে সোজা সেখানে যাবেন ১৯৩৬-এর জানুয়ারির শেষে কিম্বা ফেব্রুয়ারির গোড়ায়। পত্র-শেষে শ্রীমতী উড্সকে লিখলেন: "On hearing from you, I shall fix up my plans!" 'fix' কথাটিকে চিহ্নিত করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই পরিভ্রমণের তাৎপর্য তাঁর কাছে কী অপরিসীম।

এই পরিভ্রমণের পরিকল্পনা যাতে নিখুঁত হয় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি কত সতর্ক! ১৯৩৬, ৯ জানুয়ারির পত্রে শ্রীমতী উড্সকে লিখছেন সে-বছর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাঁকে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দিতে হবে তাই ২০ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আয়ারল্যান্ড পরিভ্রমণ-সূচী স্থির করা চাই। সেখানে সাত থেকে দশ দিন যাপন করতে পারবেন এবং তারই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডি. ভ্যালেরার, পার্টি নেতাদের, লর্ড মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা চাই। জনসভায় বক্তৃতার আয়োজনও তারই মধ্যে করা যেতে পারে।

এর পরের পত্রে এল চূড়ান্ত পরিভ্রমণ-সূচী। শ্রীমতী উড্সকে এন্টোয়ার্প থেকে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬। ৩০ জানুয়ারি এস্. এস্. ওয়াংশিটন জাহাজে হ্যাভার থেকে উঠে ৩১ জানুয়ারি কব্-এ (Cobb) নামবেন। ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর ফিরবার শেষ তারিখ। ২৪ জানুয়ারি ডাবলিনের পররাষ্ট্র দপ্তর শ্রীমতী উড্সকে জানান আয়ারল্যান্ডে পৌঁছে সুভাষচন্দ্রের প্রথম কর্মসূচী হবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার— প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ডাবলিন ত্যাগের রাত্রিতেই সুভাষচন্দ্র আইরিশ শহীদ টেরেন্স ম্যাকসুইনির কন্যার সঙ্গে দেখা করেন। মাত্র কয়েকদিন ডাবলিনে বাস করে সুভাষচন্দ্র আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে অভিভূত মন নিয়ে

ফিরেছেন। তাই তীব্র অনুভূতির আবেগ নিয়ে আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ৫ মার্চ অস্ট্রিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাদগাস্টাইন থেকে শ্রীমতী উড্‌সকে লিখছেন. কি ভাবে ভারত-আইরিশ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলা যায়— "...to continue this contact between India and Ireland"। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সংগে কবে দেখা হল, কী আলোচনা হল, সে-সম্পর্কে এই পত্রে কোনো উল্লেখ মাত্র নেই। ১৯৩২-র জুলাই মাসে ভারতীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভি. জে. প্যাটেল ডাবলিন যান। প্যাটেলের এই ভ্রমণসূত্রেই ইন্ডিয়ান-আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পত্তন হয়। আইরিশ বিপ্লবী ম্যাদাম গোন্ ম্যাকব্রাইড এই সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন। ম্যাদাম গোন্ ম্যাকব্রাইড-এর পুত্র সীয়ান ম্যাকব্রাইড ডি ভ্যালেরার ক্যাবিনেটের মন্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৯৩৬, ৮ এপ্রিল জাহাজ থেকে নামা মাত্র বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হবার পর দুইমাস কারাবন্দী থেকে স্বাস্থ্যহানির কারণে সুভাষচন্দ্র কার্সিয়াং অন্তরীণ হন এবং সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা-মেডিক্যাল কলেজে ১৯৩৬-এর ১৭ ডিসেম্বর স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৩৭-র ১৭ মার্চ মেডিক্যাল কলেজ হাস-পাতালের মার্টিন ওয়ার্ড থেকে বিনাশর্তে মুক্ত হন। ১৭ মার্চ মুক্তি দেবার পূর্বে ভারত সরকার ও বাংলা সরকার পরস্পর পরামর্শ করে এমন তারিখ বেছে নেয়, যে সময় মুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭-এর নির্বাচনোত্তর নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে যেন কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারেন। তার পর কয়েকমাস ডালহাউসির শৈল-নিবাসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বসবাস করে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭-এর ১৮ নভেম্বর তারিখে বিমানে ইউরোপ রওয়ানা হয়ে ২২ নভেম্বর বাদগাস্টাইনে পেঁছান।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সুভাষচন্দ্র সেখান থেকে শ্রীমতী উড্‌সকে লিখছেন, ১০ জানুয়ারি ১৯৩৮ তিনি লন্ডনে যাবেন। ইংল্যান্ডে যাবার অনুমতি তাঁকে এবার দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডে যাওয়া তাঁর মুখ্য লক্ষ্য নয়। গৌণ উপলক্ষ মাত্র। শ্রীমতী উড্‌সকে গোপনে সংবাদ নিতে বলেন ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারির মধ্যে একবার প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সংগে সাক্ষাৎ করে আসা যায় কিনা। সংবাদটি অতিশয় গোপন রাখতে হবে। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সেক্রেটারি ছাড়া আর কেউ তা জানবেন না। শ্রীমতী উড্‌সের উত্তর সরাসরি সুভাষচন্দ্রের নামে যাবে না সিল করা রেজিস্ট্রি খামের ওপর নাম লেখা থাকবে Miss E. Schenkl। ভেতরে

অপর নামে বন্ধ করা চিঠি থাকবে। ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বার বার গোপনীয়তা রক্ষা করতে দেখা গেছে। ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক অনন্য নেতা অপর এক প্রখ্যাত আইরিশ বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সর্বতোভাবে গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন, তাতে বিচিত্র কী ? সুভাষ-চরিত্রের এই বৈপ্লবিক-মানসের প্রতিফলন তাঁর সংশ্লিষ্ট পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের উল্লিখিত পত্রটি কী সতর্কতাজড়িত ভাষায় লেখা, পড়লে অবাক হতে হয়: "Can you make enquiries *Confidentially,* if I can pay a visit to President De Valera when I am in England ?... Please treat this matter as *strictly confidential* and not a soul should know beyond the President and his Secretary. When you write back, please address the cover to Miss E. Schenkl, Post Restante Badgastein and send it in a *sealed Registered* Cover. It is important and necessary to take this precaution, because I donot like that anybody else should know about this visit until I *actually* arrive in Dublin.''

৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৭ শ্রীমতী উড্‌সকে আবার লিখছেন যে তিনি ১০ জানুয়ারি ১৯৩৮ লন্ডনে পৌঁছে ১৭ পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। ১৮ জানুয়ারি ডাবলিনের কর্মসূচী তাঁর চাই-ই চাই। সেদিন সকাল ৬টা ৪৫-এ ডাবলিন পৌঁছে জরুরি কাজটি সেরে ৮টা ১০ মিঃ-এ ডাবলিন ত্যাগ ক'রে পরদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় লন্ডন পৌঁছাবেন। শেষে কর্মসূচীটি গোপন রাখবার জন্য আবার সতর্ক করে দিয়ে লিখলেন: "Please keep the appointment a secret for the present. Just send a line please to say that you have got this letter."

শ্রীমতী উড্‌স-এর পত্র কোনো গোয়েন্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা, সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার জন্য সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী উড্‌সের পত্রের খামটাও তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, খামটি দেখে যেন সুভাষচন্দ্রকে শ্রীমতী উড্‌স জানাতে পারেন খামটি ডাবলিনে ডাকে দেবার সময় যে অবস্থায় ছিল, সুভাষচন্দ্রের নিকট পৌঁছাবার পরও তেমনিই রয়েছে কিনা। কী প্রখর বৈপ্লবিক সতর্কতা সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি পদক্ষেপকে ঘিরে রেখেছে !

আরো সতর্কতার স্বাক্ষর রয়েছে সাক্ষাতের দিনটির চূড়ান্ত নির্বাচনে। ১৮ জানুয়ারি তাঁর ডাবলিনের কর্মসূচী চাই-ই— ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৭ শ্রীমতী

উড্‌সকে সুভাষচন্দ্র লিখছেন। কিন্তু ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮-র Artillery Mansions, Victoria Street, London SWI থেকে শ্রীমতী উড্‌সকে সুভাষচন্দ্র জানাচ্ছেন ১৫ জানুয়ারি রাত্রিবেলা তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সাক্ষাৎকার এবং দীর্ঘ আলোচনা হয়। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দেবার অপূর্ব বৈপ্লবিক কৌশল! ঘোষিত দিনের আগেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার শেষ!

ইন্ডিয়ান-আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মড্ গোন্ ম্যাক্‌ব্রাইড এবং দুই সেক্রেটারি এম.এফ. উড্‌স এবং জে. জে. হিলির প্রচারিত ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্র যেমন ব্রিটিশ সম্পর্করহিত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত রয়েছেন, আয়ারল্যান্ডও সেই অন্তিম লক্ষ্য অনুসরণে প্রতিশ্রুত। এই ইস্তাহারে ভারত-আইরিশ আত্মিক বন্ধন ধ্বনিত হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে : "...Ireland has realised that the only road to prosperity and honour is complete severance from the British Empire ; India is realising this also. The English also know that a free Ireland and a free India is the end of the British Empire and are employing every weapon in their armoury of force and hypocrisy to retard the inevitable end"... পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী পরিচালনার বৈপ্লবিক পর্যায়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আইরিশ বিপ্লব এবং আইরিশ বিপ্লবীদের কীর্তি-গাঁথা বার বার উল্লেখ করে আজাদ হিন্দ সংগ্রামে বৈপ্লবিক শক্তি সঞ্চারে প্রয়াসী হয়েছেন।

আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ও জওহরলালের মনোভাব যে কতটা বিপরীতমুখী ১৯৩৫-এর শরৎকাল থেকে ১৯৩৬-এর মার্চ পর্যন্ত এই দুইজনের ইউরোপ-প্রবাসে থাকাকালীন আচরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। জওহরলাল লন্ডন, প্যারিস গেছেন। আয়ারল্যান্ড যান নাই, কারণ সে সময় আয়ারল্যান্ড ব্রিটিশ-বিরোধীরূপে চিহ্নিত ছিল। জওহরলাল ইটালী কিম্বা জার্মানীতে খুব সতর্কভাবে কোনো যোগাযোগ করতে বিরত থেকেছেন পাছে তার ইংরেজ কিংবা ফরাসী বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হন। *The Indian Struggle* 1920-42তে জওহর-লালের এই স্পর্শকাতরতার উল্লেখ করে মন্তব্য আছে : "In countries like Italy and Germany, he carefully avoided making any contacts, either because of his dislike of Fascism and National

Socialism, or because he did not want to offend his friends in England and France." (p. 325).

১৯৩৩-৩৬-এ ইউরোপে প্রবাসে থাকাকালীন মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর তুর্কীর পরিস্থিতি সুভাষচন্দ্র গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। বহু সমস্যা সম্পর্কে তুর্কী এবং ভারতের প্রকৃতিগত, স্বাজাত্য কামাল পাশার তুর্কী-সম্পর্কিত সমাধান সুভাষচন্দ্রকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। নূতন তুর্কী গঠনে কামাল পাশার অভিজ্ঞতার সাফল্য সুভাষচন্দ্রকে পশ্চিমী পরিষদীয় গণ-তন্ত্রের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপে উদ্‌বুদ্ধ করে। ইউরোপ প্রবাস-কালে যেমন বিভিন্ন দেশের পরাধীনতার ও শোষণের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং ক্ষমতা দখলের কৌশল সম্পর্কে এবং সংগ্রামোত্তর পর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সামাজিক-আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আত্মস্থ করেন তেমনি সুভাষচন্দ্র ভারতের জাতীয় বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট প্রত্যয়ে পৌঁছলেন।

১৯৩৮-এর জানুয়ারি মাসে লন্ডনে থাকাকালীন সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষ-চন্দ্রের হরিপুরা কংগ্রেসে (গুজরাট) সভাপতিপদে নির্বাচনের সংবাদ এল। এই সংবাদ পাবার পরই প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণায় তিনি বলেন : 'এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে ভারতকে বিশ্বের সম্মুখে অধিকতর রূপে উপস্থাপিত করতে হবে। কারণ ভারতের সমস্যা, বিশ্বের সমস্যা। প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সঙ্গে আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর কেবল ভারতের মুক্তিই নির্ভর করে না, বিশ্বের উৎপীড়িত মানুষের মুক্তিও নির্ভর করবে'—"It will be agreed on all hands that we have to bring. India before the world more than we have done so far. India's problems, after all, are world problems. On our close contact with the progressive movements will depend not only the salvation of India but also of the suffering humanity as well". (*A Beacon Across Asia*, Orient Longman Ltd. : p. 71)।

১৯৩৬, ১৯৩৭-এ যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ এবং ফৈজপুর কংগ্রেসে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র ১৯২৮-এর কলকাতা-কংগ্রেসে গান্ধীজীর বিকল্প নেতৃত্বের সূত্রপাত করেছেন এবং ১৯৩৩-এ ভি. জে. প্যাটেলের সহযোগে ভিয়েনায় গান্ধী-বিরোধী ইস্তাহারে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যায় গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে

বাছাই করলেন কেন? ১৯৩৫-এর নূতন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী ১৯৩৬-এর শেষে নির্বাচনের পর ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করেছে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীপন্থীরা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোতে ঘাঁটি করেছে ফলে গান্ধীজীর প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসের এই নিয়মতান্ত্রিকতার অন্তরায় ছিল। তাদের মন্ত্রীত্ব-গ্রহণবিরোধী (Anti-Ministry Campaign) অভিযান কোনো কোনো কংগ্রেস নেতার সমর্থন এবং জওহরলালের নৈতিক সায় সত্ত্বেও, কংগ্রেসে নিয়মতান্ত্রিক বা পরিষদীয় রাজনীতির গান্ধী-সমর্থক পোষকরা তা ঝেড়ে ফেলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পর পর দুইবার কংগ্রেসের সভাপতিপদে নির্বাচনের পরও জওহরলাল না গান্ধীপন্থা পুরোপুরি গ্রহণে প্রস্তুত হয়েছেন, না তার বিরোধী বিকল্প নেতৃত্ব নিয়ে দাঁড়াবার কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন। ১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হবার পর জওহরলাল মূলত গান্ধী-পরিধিতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। একমাত্র সুভাষচন্দ্র এই পরিধির বাইরের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সুভাষচন্দ্রকে হরিপুরার সভাপতি নির্বাচিত করে গান্ধীজী একদিকে যেমন কংগ্রেসের চরমপন্থী তথা সমাজবাদীদের বিরোধিতা নমনীয় করতে চাইলেন তেমনি তাঁর বিকল্প নেতৃত্বর ঘাঁটি দখলের পরীক্ষায় নামলেন। কিন্তু এ পরীক্ষা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হল। ১৯৩৮, ২২ ফেব্রুয়ারি হরিপুরা-কংগ্রেস সমাপ্তির মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ১৪ মার্চ জার্মান সামরিক বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল ক'রে বৃহত্তর জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার পুনর্মিলন বা 'Anschluss' ঘটালো। সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং জার্মানীর মধ্যে মিউনিখে অনুষ্ঠিত চুক্তিতে চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান-ভাষীদের অধ্যুষিত অংশ হিটলারের চাপে রাষ্ট্র চতুষ্টয় জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তিতে সায় দিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রায়-অন্ত্যেষ্টির আয়োজন ক'রে ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধের ছায়াপাত ঘটিয়ে আনল। ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধের প্রেক্ষায় জাতীয় সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতির জন্য ১৯৩৮ সেপ্টেম্বরেই সুভাষচন্দ্র আপন সংকল্পে স্থির হয়ে গেলেন। ভারতীয় সংগ্রামে গান্ধী-নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক নেতৃত্বের উপান্ত পর্যায়ের সংঘাতের শুরুও এইখানে। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরের এই সন্ধিক্ষণে সমগ্র দেশব্যাপী ভারতীয় জনসাধারণকে ইউরোপে প্রত্যাসন্ন যুদ্ধের সমসময়ে জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির অভিযান শুরু করে দিলেন: "...began an open propaganda throughout India in order to prepare the Indian

people for a national struggle, which should synchronise with the coming war in Europe." (*The Indian Struggle* 1920-42 : Asia Publishing House : p. 332) ।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ তাঁকে দ্রষ্টার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছে। বর্তমান সংগ্রামের প্রেক্ষায় অবারিত স্বচ্ছতায়, সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি আগামী দিনের যে রূপরেখা হরিপুরায় তুলে ধরলেন ভবিতব্যের মতো মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে তা বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠল। ফল্গুপ্রবাহের মতো হরিপুরা ভাষণের অন্তঃপ্রবাহে সুভাষচন্দ্রের বিপ্লব-মানসের রেখাঙ্কন আগামী দিনের পথনির্দেশ দিয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতকে যেন তিনি হরিপুরার মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছেন এবং সেই প্রেক্ষায় তাঁর চিন্তাকে বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। বলছেন তিনি : "I am one of those who think in terms of a free India— who visualise a national government in this country within brief span of our own life." মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার তিনি গঠনও করেছিলেন ! তাঁর অভিভাষণে তিনি কোথাও ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে চলেন নি, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল ক্ষমতা দখলের দিকে। ক্ষমতা দখল এবং সমাজবাদী পথে জাতীয় পুনর্গঠন— এই দ্বৈত বৈপ্লবিক ভাবনার বেগবান প্রবাহ হরিপুরার মঞ্চ থেকে বিদ্যুৎ-শিহরণের মতো সমগ্র দেশে তিনি সঞ্চালিত করে দেন : "··· if after the capture of political power, national reconstruction takes place on socialistic lines— as I have no doubt it will— it is the 'have-nots' who will benefit at the expense of the 'haves' and the Indian masses have to be classified among the 'have-nots". এই ক্ষমতা-দখল যে যুদ্ধেরই সামিল সে-চিন্তার স্বাক্ষরও রয়েছে তাঁর অভিভাষণে। এই ক্ষমতা-দখল যাঁরা করবেন তাঁরাই পরবর্তী 'যুদ্ধোত্তর' "post-war" পুনর্গঠনকেও রূপায়িত করবেন : "The party that wins freedom for India should be also the party that will put into effect the entire programme of post-war reconstruction". সুতরাং, ক্ষমতা-দখলের পর কংগ্রেস 'বিলুপ্ত' হবে— এই ভাবনাটাই অবান্তর। ইউরোপেও তাই দেখা গেছে যে, যে-দল ক্ষমতা দখল করেছেন তাঁরাই পরিকল্পিত পুনর্গঠন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন।

তাই মূল জাতীয় সমস্যাগুলি যথা : দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, বিজ্ঞান-

সম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন সমস্যাসমূহের সমাজতান্ত্রিক পথে মীমাংসা চাই। সেজন্য আমাদের আগামী জাতীয় সরকারের অব্যবহিত দায়িত্ব হবে—"... to set up a commission for drawing up a comprehensive plan of reconstruction". সুতরাং জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠনের জনকরূপে ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান হরিপুরা ভাষণে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলোপ, ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, কৃষিঋণ বিলোপ, গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র হরিপুরায় সমাজ-পরিবর্তনের ধারা ত্বরায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বে ব্যাপক শিল্পায়নের নির্দেশ, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে গেল হরিপুরা ভাষণ। তারই পূর্ণায়নের পথনির্দেশরূপে দেশের শিল্প এবং কৃষিব্যবস্থার সামগ্রিক সামাজিকরণের পথ গ্রহণের উল্লেখও হরিপুরা ভাষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য : "The state will have to adopt a comprehensive scheme for gradually socialising our entire agricultural and industrial system in the sphere of both production and appropriation"। পরিকল্পনার কর্মসূচীতে অদূর ভবিষ্যতে গান্ধীজী ও তাঁর মতাবলম্বীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধের বীজ নিহিত ছিল, যদিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের আর্থিক বিন্যাসে হরিপুরা ভাষণে কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন, চরকা এবং হস্তচালিত তাঁতশিল্পের স্থান-নির্দেশও করা ছিল।

ইউরোপে তিন বছর প্রবাসে থাকাকালীন বিভিন্ন দেশের প্রথম যুদ্ধোত্তর সামাজিক-আর্থিক গড়নের ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের ভবিষ্যৎ রূপরেখা স্পষ্টতর করে তুলেছিলেন। তাঁর সমাজবাদে প্রত্যয়, ভারতে একাধিক পার্টির অবস্থান এবং কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক বনিয়াদ, ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্রে পরিণতির পরিবর্তে গণতন্ত্রে স্থিতিতে বিশ্বাস —তাঁর বিরুদ্ধে নাৎসীবাদ-প্রীতির অভিযোগের প্রবল খণ্ডন। রোমাঁ রোলাঁ ১৯৩৫-এর এপ্রিলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর ডায়ারিতে লিখছেন : "...Bose too seems on the verge of Communism ; but he will hear nothing of it." (Extracts from Roman Rolland's Diary, April 1935) কিন্তু তার পরই সুভাষচন্দ্রের পররাষ্ট্র নীতির স্বচ্ছতা

বোঝাবার জন্য লিখেছেন যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সোভিয়েত রুশের সাহায্যে কোনো ক্ষতির কারণ আছে বলে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই মনে করেন না : "... he declares that he would certainly see no harm in the U.S.S.R. helping India to liberate herself." *Romain Rolland and Gandhi : Correspondence* : Publications Division, Govt. of India, p. 224.)

কিন্তু হরিপুরা-ভাষণে সুভাষচন্দ্র দিব্যদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন ভারত-বিভাগ প্রসঙ্গে। বিভেদনীতি সাম্রাজ্যবাদীদের চিরকালের অস্ত্র। কোনো দেশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অনিবার্য হয়ে পড়লে তার পূর্বে সেই দেশকে তারা দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে যাবেই : "An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power." ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত প্রদেশগুলির সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক পথে শাসিত দেশীয় রাজন্যবর্গদের রাজ্য জুড়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা প্রস্তাবিত ফেডারেশনে বিভেদ নীতি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এই ফেডারেশন যদি কোনো কারণে বানচাল হয়ে যায়, ব্রিটিশ উদ্ভাবনী শক্তি অন্য কোনো সাংবিধানিক পথে ভারত বিভাগ ক'রে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অচল করে দেবে : "...British ingenuity will seek some other constitutional device for partitioning India and thereby neutralising the transference of power to the Indian people." হরিপুরার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বাস্তব রূপ নিল এবং তারও কয়েক বছরের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক বিকল্প নেতৃত্বের বিরোধী কংগ্রেস-নেতৃত্ব, গান্ধীজী সহ, দেশবিভাগে সায় দিলেন !

হরিপুরা-ভাষণের আরো বৈশিষ্ট্য— জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব, হিন্দী-উর্দু-মিশ্রিত ভাষাকে আদান-প্রদানের ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব, রোমান হরফ গ্রহণের প্রস্তাব, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব এবং সর্বোপরি ভারতে বিপুল জনসমষ্টির উদ্যম সংহত করে জাতিগঠনে সঞ্চালনের প্রস্তাব জাতিকে গতানুগতিক পথ থেকে নূতন পথে পরিক্রমার আহ্বান জানালো।

কিন্তু সংকট ঘনিয়ে এল। হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন পরিচালনায় সকল মতের, সকল দলের শুভেচ্ছা এবং নিরপেক্ষতার সুনাম নিয়ে সফল সভাপতি-রূপে উত্তীর্ণ হলেও সুভাষচন্দ্র সেপ্টেম্বরের পর থেকে ইউরোপে মিউনিখ-

চুক্তিউত্তর সংকটে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির ডাক দিয়ে একদিকে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসকামী পরিষদীয় নেতৃত্বের বিরূপতা অর্জন করলেন, অপর দিকে পর পর কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন করে, শিল্প-মন্ত্রীদের আহ্বান করে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে অগ্রসর হয়ে অবশেষে ১৯৩৮-এর ১৯ ডিসেম্বর বোম্বেতে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরি-কল্পনা কমিটির উদ্বোধন করে গান্ধীজীর ও গান্ধীপন্থীদের বিরূপতা বেগবান করে তুললেন। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ-পরিকল্পিত ভারতীয় ফেডারেশনের ঘোরতর বিরোধী। কংগ্রেস এদেশে পরিষদীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বটে কিন্তু প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আঁকড়ে থাকবে, তা ভাববার কারণ নেই। হরিপুরা-ভাষণে সভাপতি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, জোর করে অবাঞ্ছিত ফেডারে-শন চাপাতে চাইলে বৃহত্তর আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হতে পারে: '... a determined opposition to the forcible inauguration of federation may land us in another big campaign of civil disobe-dience.''

ফেডারেশন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনোপ্রকার আপসের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এ-পথে গান্ধীপন্থীদের কাছ থেকে বাধা আসছিল কারণ আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের পরিমাপ সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না এবং তাঁরা জাতীয় সংগ্রামের পথে না গিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে আপসের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। তিনি *The Indian Struggle* 1920-42 গ্রন্থে লিখছেন: "In this task he had been obstructed by the Gandhi wing at every step— because the latter had no comprehension of coming international developments and was working eagerly for a compromise with Britain without the nececsity of a national struggle" (pp. 333-34).

১৯৩৮-এর শেষে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হয়ে গেছে— আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকট ও শিল্পায়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে— সে-সময় ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিপদে নির্বাচনের জন্য সুভাষচন্দ্রের নাম বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাবিত হয়। কংগ্রেস সমাজবাদী দলের নেতৃস্থানীয়দের, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ মনীষীদের, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের পক্ষ

থেকে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু গান্ধীজী এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ সে-প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। ১৯৩৮-এর শেষে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আসন্ন যুদ্ধের প্রাক্‌কালে, সুভাষচন্দ্রের বিকল্প বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে এসে দাঁড়ালো !

সুভাষচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা এবং সমকালীন ইতিহাসের বাস্তববাদী বিচার নিয়ে সে-সময় নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে মনস্বী রোমাঁ রোলাঁর বিচার প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ্য। *The Indian Struggle* 1920-34 গ্রন্থটি মনস্বী রোলাঁ পেয়ে তাঁর Villeneuve (Vaud) Villa Olga থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ সুভাষচন্দ্রকে লিখছেন : "...In it you show the best qualities of the historian : lucidity and high equity of mind. Rarely it happens that a man of action as you are is apt to judge without party spirit. (*Romain Rolland and Gandhi : Correspondence* : p 318.)

সুভাষচন্দ্রের ইতিহাস-সচেতনতা এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে এর চাইতে প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন আর কী হতে পারে !

১৯৩৬-৩৮-এর প্রবাস-জীবনে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে প্রচারের উপযোগিতা ও ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণকে অবহিত করবার জন্য সুভাষচন্দ্র নিরন্তর প্রয়াসী হয়েছেন। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সে-সকল বিষয়ে তাঁর বিবৃতি, বিবরণী, বিশ্লেষণমূলক বহু আলোচনা স্থান পেয়েছে। আই.সি.এস. পদ ত্যাগের পূর্বে ইংল্যান্ড থেকে দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জনকে লেখা পত্রে কংগ্রেস প্রচারযন্ত্র ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব দিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচারের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে বৈদেশিক প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং বিঠলভাই প্যাটেল। বিদেশে ভারত সম্পর্কিত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে উঠবার কারণ উল্লেখ করে 'বিদেশে ভারত' (১৯৩৬) বিবৃতিতে তিনি বলছেন : "১. ইউরোপে আমার অভিজ্ঞতা এবং ২. আমার ইতিহাস অধ্যয়ন"। এই বিবরণীতে প্রচারের লক্ষ্য, প্রচারের ব্যবস্থাগুলিরও উল্লেখ রয়েছে। আর প্রচার যে নেতিবাচক হবে না সে-সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বল-ছেন : "এই প্রচার ব্রিটিশ-বিরোধী হওয়া উচিত নয়, শুধু হওয়া উচিত ভারতের

অনুকূলে।” ‘ইউরোপ : আজ ও আগামীকাল’ (আগস্ট, ১৯৩৭), ‘দূর প্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা’ (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭), ‘ভারতের প্রতি আয়ারল্যান্ডের সহানুভূতি’ (মার্চ ১৯৩৬), ‘ইউরোপীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি’ (আগস্ট, ১৯৩৮) প্রভৃতি বিবরণী-বিবৃতিগুলি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে।

এরই মধ্যে ১৯৩৭-এর অক্টোবরে ডালহৌসী স্বাস্থ্যনিবাস থেকে ফেরার পর কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার ভাষণে বলছেন : “কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হউন।… আপনারা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হউন।”

১৯৩৭ অক্টোবরে মেদিনীপুর কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপনের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ১৯৩৭ নভেম্বর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাত্রার প্রাক্‌কালে বিনাবিচারে আটক বন্দীদের এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য দেশবাসীর প্রয়াসের সফলতা কামনা করছেন। ১৯৩৮ জানুয়ারিতে লন্ডনে জনগণ কর্তৃক রচিত সংবিধান দাবি করছেন। হরিপুরা-কংগ্রেসে সভাপতি পদে নির্বাচনের সংবাদ পেয়েই তিনি বলেন : “ভারতকে আরো বেশি পরিমাণে বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে।… ভারতের সমস্যা মূলত বিশ্বসমস্যা। বিদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর কেবল ভারতের মুক্তিই নির্ভর করিবে না, বেদনার্ত মানবতার মুক্তিও নির্ভর করিবে।” এক লহমায় ভারতীয় জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে মানবতার মুক্তিসংগ্রামের পাদপীঠে পৌঁছে দেবার অপূর্ব বৈপ্লবিক মানসিকতা এই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় নিহিত ছিল। হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে জাতীয় বিপ্লবের ও বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনের যে অপূর্ব রেখাঙ্কন রয়েছে তার মর্মমূলে মানবতার মুক্তির পরম ঐশ্বর্য স্থাপন করে সুভাষচন্দ্র মহাবিপ্লবীর স্তরে উন্নীত হয়েছেন। হরিপুরা-ভাষনের অন্তিম বাণী : “We are, therefore, fighting not for the cause of India alone but of humanity as well. India freed means humanity saved”. হরিপুরা-ভাষণের এই অন্তিম বাণী উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবের প্রাঙ্গণে প্রত্যক্ষ দিবালোকে অথচ সবার অলক্ষ্যে এক মহাবিপ্লবীর পদসঞ্চারণ শুরু হয়ে গেল। এই খণ্ডে সংগতভাবেই হরিপুরা-ভাষণ শ্রেষ্ঠ দলিলের স্থান জুড়ে আছে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিত্ব-সংকট সম্পর্কে ১৯৩৮ সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত বিবৃতিও অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে। এই সংকট একদিকে প্রশাসনিক, অন্য দিকে দলীয়ও

বটে। সুতরাং, যে গভীর বিচক্ষণতার সঙ্গে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু বিষয়টির বিচার ও মীমাংসা করেছেন তার বিস্তৃত ধারা বুঝবার জন্য এই দীর্ঘ বিবরণী সন্নিবেশিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের নৈর্ব্যক্তিক সংযম ও ন্যায়-বিচারবোধ এই বিবরণীর ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে রয়েছে।

১৯৩৮-এর জুন-আগস্টে বসু-জিন্না পত্র-বিনিময়ে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী নীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর প্রত্যয় স্পষ্টতর হয়েছে।

জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ১৯৩৮-এর আগস্টের আলোচনা এবং এ-বছর ডিসেম্বরে প্ল্যানিং কমিটির উদ্‌বোধনী ভাষণ, ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে দিক্‌-চিহ্নবিশেষ। আর-একটি দিক্‌-চিহ্ন তাঁর ফেডারেশন-বিরোধী বিবৃতি, ভাষণ, বিবরণীগুলি। ১৯৩৮ অক্টোবরে শিলং-এ, গৌহাটিতে, ডিসেম্বরে বোম্বাইতে প্রদত্ত ভাষণে ফেডারেশন-বিরোধিতার ইশারা আছে। শিলঙে তিনি বলছেন: "আমরা বিদেশীদের দ্বারা রচিত সংবিধান গ্রহণ করিব না··· ।" গৌহাটিতে বলছেন: "আমরা যুগ-পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে বাস করিতেছি— শুধু ইহা সন্ধিক্ষণের সময় না, সংগ্রামেরও সময়।" বোম্বাইতে বলছেন: "ফেডারেশন সম্পর্কে ভাবী কার্যক্রম এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে বিবেচিত হইবে।"

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ আসামে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভার পতন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতিত্বকালীন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের পূর্বপ্রান্তে মুসলিম লীগের ক্ষমতা খর্ব করে এই রূপান্তর ঘটিয়ে সুভাষচন্দ্র সেদিন তাঁর বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের প্রগাঢ় পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩৭-এর বাংলার মন্ত্রীসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের এই নীতি প্রয়োগের অবকাশ থাকলে ভারতবর্ষের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক খাতে পরিণতি পেত না।

পূর্বেকার খণ্ডগুলি প্রকাশের সময় যে-সব উপাদান সময়মতো সংগৃহীত না হওয়ায় ক্রম-অনুযায়ী বিভিন্ন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা যায় নাই, এই খণ্ডের সংযোজনে সে রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সন্নিবিষ্ট করা হ'ল। অন্যান্য খণ্ডের মতো এবারও তথ্য ও উল্লেখ -পঞ্জী এবং নির্দেশিকা গ্রন্থের অনিবার্য অনুষঙ্গরূপে দেওয়া হ'ল।

এই খণ্ড আরো পূর্বে প্রকাশ করবার আয়োজন থাকলেও নানা কারণে বিলম্ব হওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সহৃদয় গ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে তাঁদের সহমর্মিতা দিয়ে গ্রহণ করবেন, এই আশা পোষণ করি। প্রথম তিন খণ্ড সংকলনে যাঁদের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রসারিত ছিল, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশেও তাঁদের আনুকূল্য সমভাবেই প্রসারিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপাল ভৌমিক ও শ্রীশিবব্রত ঘোষের নাম উল্লেখ্য।

বর্তমান খণ্ডে শ্রীগোপাললাল সান্যাল একটি পত্র প্রকাশের এবং শ্রীঅমিয়নাথ সরকার একটি আলেকচিত্র মুদ্রণের সম্মতি দেওয়ায় তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অন্যান্য খণ্ডের মতো বর্তমান খণ্ড প্রকাশেও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, শ্রীপবিত্র-কুমার ঘোষ, শ্রীবিজয় নাগ ও শ্রীশেখর দাশগুপ্তর ঐকান্তিকতার উল্লেখ ভুলবার নয়। এ-ছাড়া যে-সব শুভানুধ্যায়ী বন্ধু অন্তরাল থেকে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

গ্রন্থপ্রকাশে অনিবার্য বিলম্ব সত্ত্বেও রচনাবলীর এই খণ্ডের জন্য যাঁরা গভীর মমত্ববোধ নিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানিয়ে এই খণ্ডটি সংশ্লিষ্ট সকলের হাতে তুলে দিলাম। ইতি

সুনীল দাস

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

সুভাষ-রচনাবলী

১৯৩৬ - ডিসেম্বর ১৯৩৮

বিদেশে ভারত

বিদেশে ভারত বিষয়ে প্রচার প্রসঙ্গে ইউরোপ হইতে প্রচারিত বক্তব্য।

ভারতকে অন্যান্য দেশে পরিচিত করাইবার যে প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে পরলোকগত দেশবন্ধু সি. আর. দাশই প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। পরলোকগত দেশবন্ধু এবং পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এলাহাবাদে স্বরাজ্যদলের পত্তন করিয়া তাহার জন্য একটি নতুন কর্মসূচীর খসড়া রাখার সময় ইহা ঘটিয়াছিল। আমরা সকলেই যখন কারাগারে ছিলাম সেই অবস্থায় ১৯২২-এর এপ্রিল হইতে নূতন কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। দেশবন্ধুর পরিকল্পনায় এমন দুইটি বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু দেশবাসীদের মধ্যে সে-সময় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই, কারণ আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি দখলের উপর জনগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। এই দুইটি বিষয় ছিল— অন্যান্য দেশে ভারত সম্পর্কে প্রচার এবং একটি প্যান-এশীয় লীগ গঠন।

কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর বিদেশে ভারত সম্পর্কিত প্রচারের প্রশ্নে পুনরায় আমার আগ্রহ উজ্জীবিত হইয়াছিল। ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে কলিকাতায় থাকার সময় একজন মার্কিন সাংবাদিক (এই মুহূর্তে আমি তাঁহার নাম মনে করিতে পারিতেছি না) আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমাদের আলোচনার সময় চীন কিভাবে সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তিনি তাহার প্রাণোচ্ছল বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে ভারতের উচিত বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করা। কিভাবে তাহা করা হইবে সেই পদ্ধতি স্থির করার দায়িত্ব ভারতীয়দের কিন্তু ভারতের নিজের স্বার্থেই ইহার অমোঘ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

ভারতের প্রগতির জন্য বিদেশে ভারতের প্রচার যে অপরিহার্য আমার এই প্রতীতি অন্য দুইটি কারণে দৃঢ়তর হইয়াছে। সেই কারণ দুইটি : ১. গত দুই বৎসরে আমার ইউরোপের অভিজ্ঞতা এবং ২. আমার ইতিহাস অধ্যয়ন। গত দুই বৎসর আমি ইউরোপের বহু দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। সর্বত্র ভারত সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা কিন্তু সেইসঙ্গে ভারত সম্বন্ধে সার্বজনীন সহানুভূতি ও আগ্রহ রহিয়াছে। আমাদের দিক হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে এই

সহানুভূতি ব্যাপকতর ও উন্নীত করা যায়। কিন্তু আমরা যখন এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন মিশনারিগণ ও অন্যান্য "সভ্যতা-বিস্তারকারী সংস্থা" চুপ করিয়া বসিয়া নাই। কয়েক দশক ধরিয়া তাঁহারা ভারতকে এমন একটি দেশ হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন যেখানে বিধবাদের অগ্নিদগ্ধ করা হয়, ৫ কিংবা ৬ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয় এবং জনসাধারণ কার্যত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অজ্ঞ। আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে থাকা-কালীন আমি একটি বক্তৃতা-কক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় একজন মিশনারির ভারত সম্পর্কে বক্তৃতার বিষয়ে একটি সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। সেই বিজ্ঞাপনে ঘনতম কৃষ্ণকায় এবং কুৎসিততম আকারের কতকগুলি অর্ধনগ্ন নর-নারীর ছবি ছিল। স্পষ্টতই সেই বক্তা ভারতে তাঁহার "সভ্যতা-বিস্তারকারী" কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই সামান্যতম অনুশোচনা-বিবর্জিতভাবে তিনি ভারতকে এইভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে সম্প্রতি ভারত পরিদর্শন করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন এমন একজন মহিলা জার্মান সাংবাদিক মিউনিখের একটি পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে তিনি ভারতে বিধবাদের আগুনে পুড়াইতে এবং বোম্বাইয়ের পথে পথে মৃতদেহ-গুলি অযত্নে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। সম্প্রতি ভিয়েনার একটি সচিত্র পত্রিকায় ('ভিয়েনা বিল্ডার', ৩০ জুন) পোকামাকড়ে সমাচ্ছন্ন একটি মৃতদেহের ছবি ছাপা হইয়াছিল এবং পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে ইহা একটি "সাধুর" মৃতদেহ ও "সাধুর" মৃতদেহ সাধারণ মানুষের অপসারণ করা উচিত নয় হিন্দুদের এই বিশ্বাসের দরুন কয়েকদিন ধরিয়া মৃতদেহটি সরানো যায় নাই। ভারতকে সম্ভাব্য জঘন্যতম রঙে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে ইউরোপে প্রচারকারীদের ভারত-সম্পর্কিত চিত্রাবলীর সযত্ন নির্বাচন আমাকে বিস্মিত করে। সচিত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির মতো ইহা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সত্য। 'ইন্ডিয়া স্পীক্স্' ও 'বেংগলী'র মতো চল-চ্চিত্রগুলি যে ভারত-বিরোধী প্রচারের বাহন, সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে ভারত অবহিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার আশংকা 'এভ্রিবডি লাভ্স মিউজিক' নামক চলচ্চিত্রটির দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই। এই চলচ্চিত্রে নিজের পোশাকে মহাত্মা গান্ধীকে একটি ইউরোপীয় নারীর সংগে নৃত্যরত অবস্থায় দেখানো হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে এই ধরনের প্রচার চলিতে থাকিলে, মাঝে মাঝে ইংল্যান্ডে

ভারতীয়দের যে 'ব্ল্যাকি' বলা হয় কিংবা জার্মানীতে কখনো কখনো বলা হয় 'নিগার' (নিগ্রো) তাহাতে বিস্ময়ের কি কিছু থাকে ? এরূপ অবস্থায় আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত ? প্রথম এবং সহজতর উপায় হইল নিজেদের চোখ বন্ধ করিয়া থাকা, নীরবে অপমান হজম করিয়া নির্বাক থাকা। অন্য এবং কঠিনতর উপায় হইল আমাদের নিজেদের প্রচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করা। আমার মনে পড়ে আমি ১৯৩০ সালে বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধে একজন তুর্কী রাষ্ট্রদূতের সহিত কথা বলিয়াছিলাম। আমি এই অভিযোগ করিয়াছিলাম যে বিদেশীদের জন্য খাস তুর্কীদের লেখা আধুনিক তুরস্ক সম্বন্ধে কোনো পুস্তকাদি নাই। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন যে তুর্কীরা প্রচারে বিশ্বাস করে না (ইহা পুরাপুরি সত্য নয়, কেননা তুর্কীরাও নিজেদের প্রচার-কার্য শুরু করিয়াছেন)। এই প্রচারের মুখে অন্য কোনো দেশ নিজের প্রচার-ব্যবস্থার ত্রুটি সমর্থনে এরূপ উক্তি করিবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ইউরোপের ক্ষেত্রে অন্তত প্রচারকে এখন সরকারের অন্যতম স্বাভাবিক ও বৈধ কার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড ও রাশিয়া প্রচার-শিল্পে শীর্ষস্থানীয় এবং তাহাদের পরেই ইটালী ও জার্মানীর স্থান। এশিয়ার দেশ-গুলির মধ্যে চীন এখন বৈদেশিক প্রচারে সর্বাধিক সক্রিয়। নয়া দুনিয়া পুরানো দুনিয়ায় প্রচারের ব্যাপারে সাধারণত উদাসীন কিন্তু আমার বিশ্বাস লীগ অফ্ নেশন্স বর্তমানে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ব্যবধান ঘুচাইতে সাহায্য করিতেছেন। ১৯৩৪ সালে আমি যখন জেনেভায় ছিলাম তখন কয়েকজন দক্ষিণ আমেরিকা-বাসীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হইয়াছিল এবং আমার মনে হইয়াছিল যে এমন-কি দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিও ইউরোপে প্রচার চালাইবার জন্য উদ্বিগ্ন।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে আমাদের জাতীয় অগ্রগতির জন্য বিদেশে ভারত সম্পর্কিত প্রচার বিশেষভাবে প্রয়োজন— আমার এই প্রত্যয় গভীর করিয়া তুলিতে দুইটি কারণ সহায়তা করিয়াছিল : ১. ইউরোপে আমার অভিজ্ঞতা এবং ২. আমার ইতিহাস অধ্যয়ন। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে সাম্প্রতিক বৎসর-গুলিতে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে এরূপ দেশগুলির ইতিহাস পড়িলে এই কার্যের গুরুত্ব পরিস্ফুট হইবে। আমি আশা করি যে ১৯২০ ও ১৯২১ সালে সিন্-ফিন্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যাপক প্রচার চালাইয়াছিল আমার পাঠক-পাঠিকারা সে বিষয়ে সচেতন আছেন। এই দল, এই প্রচার সংগঠন ও পরিচালনার জন্য তাহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে, অর্থাৎ আর কেহ নন, স্বয়ং দলের সভাপতি

মিঃ ভ্যালেরাকে পাঠাইয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাদেশেও এই দলের প্রচার-কেন্দ্রগুলি ছিল। অবশ্য বৈদেশিক প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় উদাহরণ রাখিয়াছেন চেক্ নেতৃবৃন্দ। বিশ বৎসর ধরিয়া ড. মাসারিক, ড. বেনেস ও অন্যান্য নেতারা বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবিছিন্ন ও অব্যাহত প্রচার চালাইয়াছিলেন। মাত্র দুই দশক পরে ইহার ফসল ঘরে তোলা গিয়াছিল এবং এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হইবে যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যতীত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ভব হইতে পারিত না।

শুধু যে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশগুলিই ধারাবাহিকভাবে প্রচারকার্য চালায় তাহাও নয়। এমন-কি, স্বাধীন দেশগুলিও এখন এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইউরোপে হাঙ্গেরী ও এশিয়ায় চীনের মতো দেশ, যাহাদের জাতীয় স্তরে ক্ষোভ রহিয়াছে, তাহারাও বৈদেশিক প্রচারের উপর জোর দেয়। হাঙ্গেরীর যে বর্তমান সীমান্ত ট্রিয়াননের চুক্তিদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং যে চুক্তিকে সে অন্যায় ও অসংগত বলিয়া বিবেচনা করে, আজ শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্বিচারের পর সে তাহার সংশোধনের প্রত্যাশা করে। সুতরাং সে তাহার লক্ষ্যসাধনের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য বহুল পরিমাণ অর্থব্যয় করিতেছে। চীন সম্প্রতি জেনেভাকে প্রধান কর্মকেন্দ্র করিয়া ইউরোপে ব্যাপক প্রচার-পরিকল্পনার সূচনা করিয়াছে। সেখানে তাঁহারা একটি ভিলা লইয়া, যাঁহারা চীন সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাঁহাদের জন্য, একটি চীনা পাঠাগার গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপে চীনা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য সমিতি ফরাসী ও ইংরেজীভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশ করে। তাঁহারা জেনেভায় আর-একটি গৃহও লইয়াছেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৪ সালে তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্কদের অঙ্কিত রঙিন চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন এবং ইহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। জেনেভায় প্রদর্শনীর পর চিত্রগুলি অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানীতে পাঠানো হইয়াছিল এবং সেই-সব স্থানে অনুরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৩৫-এর এপ্রিলে আমি আবার যখন জেনেভায় যাই তখন আমি জানিতে পারি যে তাঁহারা শিশুদের অঙ্কিত রঙিন চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী পরিচালনা করিতেছিলেন এবং আমি আরো জানিতে পারি যে এই প্রদর্শনীটিকে পরপর অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানীতেও পাঠানো হইবে। যে কেহ এরূপ প্রদর্শনী দেখিয়া এইরূপ মনোভাব লইয়া ফিরিয়া আসিবেন যে, চীনারা জাতি

হিসাবে বিশেষ গুণ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লন্ডনের বার্লিংটন হাউসে একটি শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে এক জাহাজ বোঝাই চীনের শিল্পসম্পদ লন্ডনে আনা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমি এই মন্তব্য না করিয়া পারি না যে চীন তাহার অবিচ্ছিন্ন, অব্যাহত প্রচার দ্বারা সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছে। মাঞ্চুকুও লইয়া চীন-জাপান বিরোধের সময় ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, যে-সময় জাপানের সর্বোত্তম চেষ্টা সত্ত্বেও চীন লীগ অফ নেশনস্-এর সমর্থন লাভ করিয়াছিল। চীন যে এই কষ্টার্জিত সমর্থনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই, তাহার কারণ তাহার সামরিক দুর্বলতা। যাহা হউক, চীনের জনসাধারণ প্রচারের মূল্য এতটা উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহারা এখন ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে লইয়াছেন। এই পরিকল্পনার পিছনে নানকিং সরকারের সমর্থন থাকিলেও ধনভাণ্ডারের বহুলাংশ আসে বেসরকারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে।

এমন-কি, যে-সব স্বাধীন দেশের জাতীয় স্তরে কোনো ক্ষোভ নাই তাহারাও বৈদেশিক প্রচারে অনেক মনোযোগ দেয় ও অর্থ ব্যয় করে। তাহাদের সাধারণত দুইটি উদ্দেশ্য থাকে, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক। তাহারা একদিকে অন্যান্য দেশে নিজেদের সংস্কৃতিকে পরিচিত করাইতে চায় এবং অপর দিকে তাহাদের সহিত আরো বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে চায়। আমার মতানুসারে ব্রিটিশরা যে প্রচার করেন তাহা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর, কেননা ইহা অধিকতর স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক। প্রচারের ব্রিটিশ পদ্ধতি মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ—

১. রয়টারের মতো সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলি দৈনন্দিন সংবাদের হেরফের করিয়া গ্রেটব্রিটেনের অনুকূলে সূক্ষ্ম প্রচার চালায়।

২. পৃথিবীর যে-কোনো অংশে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইলে ব্রিটিশরা তাহাতে নিশ্চিতরূপে যোগদানের ব্যবস্থা করেন।

৩. প্রতি দেশে সেই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সমিতি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েনায় আছে অ্যাংলো-অস্ট্রিয়ান ফ্রেন্ডস নামক একটি সমিতি। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি দেশে অনুরূপ সংগঠন আছে এবং এই-সব সংগঠনের আবার অনুরূপ সংস্থা আছে গ্রেটব্রিটেনে।

৪. জীবনের বহু ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরূপে বহু সংখ্যক ব্রিটিশ নরনারী প্রতি বৎসর সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য বিদেশে যান। ব্রিটিশ শিল্পীরা এদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫. বিদেশীদের ও বিদেশী ছাত্রছাত্রীদেরও গ্রেটব্রিটেন পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

৬. কোয়েকার্স, অল পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বহু আন্তর্জাতিক সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র লন্ডনে ও শাখাগুলি সারা ইউরোপে। এগুলির মাধ্যমে গ্রেটব্রিটেনের অনুকূলে খুব সূক্ষ্ম প্রচার পরিচালিত হয়। এই-সব সমিতি সাধারণত তাহাদের পাঠাগারগুলিতে ইংরেজী বইয়ের ভালো সংগ্রহ রাখে।

৭. ইউরোপের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে একটি করিয়া ইংলিশ স্পীকিং ক্লাব আছে। এই ক্লাবগুলি অপরিহার্যভাবেই প্রচারের কেন্দ্র।

৮. গ্রেটব্রিটেন-সম্পর্কিত পুস্তকাদি নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রদূতাবাস ও বাণিজ্য-দূতাবাসগুলির মাধ্যমে সরকারী প্রচার ছাড়াও প্রধানত বেসরকারী সংস্থাগুলি কর্তৃক উল্লিখিত প্রচার চালানো হয়। ব্রিটিশ প্রচার বাধার সৃষ্টি করে না এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই প্রচার, তাঁহারা প্রায় বুঝিতেই পারেন না যে সুপরিকল্পিত প্রচার চালানো হইতেছে। আর প্রচার যেখানে অধিকতর সূক্ষ্ম, যেমন মিস মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' কিংবা 'বেঙ্গলী' নামক চলচ্চিত্র, সেখানে প্রচার চালানো হয় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যাহাতে কেহ না বলিতে পারে যে ইহার পিছনে ব্রিটেনবাসীরা আছেন। ইহার সঙ্গে তুলনায় জার্মান প্রচার-পদ্ধতি স্থূল ও প্রত্যক্ষ। সুতরাং কখনো কখনো ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

গত দুই বৎসরে আমি বার বার বুঝিতে পারিয়াছি নিজের প্রয়োজনানুযায়ী প্রচার না হইলে ইংরেজরা সে সম্বন্ধে কত বেশি স্পর্শকাতর। সাধারণভাবে ইহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে যে ইংরেজদের মতো একটি শক্তিশালী জাতি, অন্যেরা তাহাদের সম্বন্ধে কী ভাবে, কিংবা কী বলে, সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিব। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সম্পর্কে আমার মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে বেলগ্রেডে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত যুগোস্লাভ পত্র-পত্রিকায় আমার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ না করার জন্য বৈদেশিক দপ্তরকে অনুরোধ করার মতো যে অস্বাভাবিক পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই কথা। জেনেভায় ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্য স্যার ওয়াল্টার স্মাইলসের ক্রোধের কথাও আমার মনে পড়ে (স্যার ওয়াল্টার স্মাইলস চাহিয়াছিলেন যে আমি দেশে

ফিরিবার পর এই বক্তৃতার জন্য আমাকে কারাগারে প্রেরণ করা হউক। আমি এই বক্তৃতায় কোনো ভুল উক্তি করিয়া থাকিলে তাহা সংশোধনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি নিরুত্তর ছিলেন)। বৈদেশিক মতামতের উপর মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার দরুন গ্রেট-ব্রিটেন এখন বিদেশে তাহার প্রচার জোরদার করিয়া তোলার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। সম্প্রতি অন্যান্য দেশে ব্রিটেনের অনুকূলে প্রচার পরিচালনার জন্য হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স অব ওয়েলসের পৃষ্ঠ-পোষকতায় "ব্রিটিশ কাউন্সিল অফ রিলেশন্স উইথ ফরেন কান্ট্রিজ" নামে একটি সমিতি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ২ জুলাই হিজ রয়াল হাইনেসকে সম্বোধন করিয়া সমিতির সভাপতি লর্ড টাইরেল বলিয়াছিলেন যে এই সমিতি বৈদেশিক দপ্তরের উদ্যোগে ও পাঁচটি সরকারী বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর সরকারী কোষাগার ইহার জন্য ৬০০০ পাউন্ড অনুদান মঞ্জুর করিয়াছে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ এই উদ্যোগকে আন্তরিক সমর্থন জানাইয়া ৩ জুলাই তারিখে লিখিয়াছিল :

"এখন ফ্রান্স ও ইটালী প্রত্যেকে জাতীয় 'প্রচার ও মর্যাদা'র জন্য প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ পাউণ্ডের বাজেট বরাদ্দ করে। একই উদ্দেশ্যে জাপান সম্প্রতি বাজেটে একলক্ষ পাউন্ড বরাদ্দ করিয়াছে এবং জার্মান প্রচার মন্ত্রকের বিপুল সম্পদ যেমন রাইখের (জার্মান রাষ্ট্র) মধ্যে তেমনই রাইখের বাহিরে ব্যয় করা হইতেছে। নিজেদের পরিচিত করাইবার জন্য আমাদের অনুরূপ আগ্রহ দেখাইতে হইলে ৬০০০ পাউন্ডের অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন : তবে সে অর্থ সবটাই যে সরকারী ভান্ডার হইতে আসিবে এমন কোনো কথা নাই।"

ভারতের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইল— আমাদের কী করা উচিত? এই প্রসঙ্গে এ কথা বলিতে আমার দুঃখ হয় যে প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে বিদেশে ভারতীয় প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিতে পাই। প্রবীণ ব্যক্তিরা কী ভাবেন শ্রীভুলাভাই দেশাই ও 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারে'র সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত মন্তব্য তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিমত কিছুটা বেশি প্রগতিশীল। তিনি এই ধরনের প্রচারকে স্বাগত জানান কিন্তু দুঃখ করিয়া বলেন যে এই কাজ হাতে লইবার মতো যথেষ্ট সংগতি কংগ্রেসের নাই। কাজেই মানুষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে প্রধান ব্যক্তিরাই ইহাকে অপ্রয়োজনীয় বিলাস বলিয়া মনে করেন, অপরিহার্য প্রয়োজন বলিয়া নয়। তাঁহারা ইহাকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলে অবশ্যই ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেলেরই বৈদেশিক প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ উপলব্ধি ছিল এবং কিভাবে তাহা পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই প্রচারের স্বার্থেই তিনি নিজের মূল্যবান জীবন বলি দিয়াছিলেন। আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি তিন মাসে ৮৫টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার ইতিপূর্বে ভগ্নস্বাস্থ্যকে দুরারোগ্যরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। এই অভিযানের শেষে এবং ভারত-বন্ধু আমেরিকানদের সঙ্গে সুচিন্তিত আলোচনার পর তিনি এই প্রত্যয় লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন স্থায়ী প্রতিনিধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা উচিত। এই প্রস্তাব যথারীতি মহাত্মা গান্ধীকে জানানো হইয়াছিল। পরলোকগত শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের অভিমত হইল এই যে আমাদের প্রচারকার্যের জন্য জেনেভায় আমাদের প্রধান কর্মকেন্দ্রসহ ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র শাখা থাকা উচিত। তিনি তাঁহার জীবিতকালে ডাবলিনে ইন্দো-আইরিশ লীগ নামে এমনই একটি শাখার কাজ শুরু করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শোচনীয় অকালমৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্বে তিনি যে জেনেভায় গিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে একটি কেন্দ্রের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে এই কাজ সম্পন্ন করিতে দেন নাই।

স্বাধীন দেশগুলির ও যে-সব দেশ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করে তাহাদের যদি বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতের মতো যে-সব দেশ বলপ্রয়োগ ও সশস্ত্র বিপ্লবের পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। এইরূপ শান্তিপূর্ণ ও বিধিসম্মত কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকারও আপত্তি করিতে পারেন না। খোলাখুলিভাবে ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আমাদের অনুকূলে বিশ্ব-সহানুভূতি আকর্ষণের ন্যায়সংগত অধিকার আমাদের আছে এবং ব্রিটিশ সরকার লীগ অফ নেশনসে ভারতের সদস্যপদ লাভের প্রস্তাব তুলিয়া এই অধিকার পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কাজের অন্তর্নিহিত অর্থ হইল এই যে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতির সকল অধিকার ভারতের আছে।

কোনো কোনো মহলে এই মনোভাব থাকিতে পারে যে বৈদেশিক প্রচারে সম্ভবত গোপনীয় কিংবা বৈপ্লবিক কিংবা ব্রিটিশ-বিরোধী কোনো কিছু থাকা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ মনোভাব যদি কোথাও থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃতিগত ভাবেই প্রচার হইবে খোলাখুলি ও সন্দেহাতীত এবং প্রচারের পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই গোপন ও বৈপ্লবিক পদ্ধতির বিরোধী। অধি-

কন্তু, এই প্রচার ব্রিটিশ-বিরোধী হওয়া উচিত নয়, শুধু হওয়া উচিত ভারতের অনুকূলে। ইউরোপে প্রচার সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে এবং এ বিষয়ে আমার নিশ্চিত অভিমত এই যে, যে-মুহূর্তে আমরা ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের চেষ্টা করিব সেই মুহূর্তে আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। রাষ্ট্র-দূতাবাস, বাণিজ্য-দূতাবাস ও বহুসংখ্যক বেসরকারী সংস্থাসহ ব্রিটিশদের বিরাট প্রচারযন্ত্র রহিয়াছে, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধ-প্রচারকে খণ্ডন করিতে পারেন। তাহা ছাড়া আমরা ব্রিটিশদের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে সহানুভূতি লাভের বদলে তাহা হারাইব। পক্ষান্তরে আমরা যে পর্যন্ত ভারতের অনুকূলে প্রচার করিব, সে পর্যন্ত আমাদের আবেদন অপ্রতিরোধ্য হইবে। আর ব্রিটিশরা যদি আমাদের বৈধ প্রচারে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনা হইতে নিজেদের অন্যায়কারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন এবং সর্বত্র সহানুভূতি হারাইবেন।

আমার মতে বিদেশে ভারতীয় প্রচারের নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলি থাকা উচিত :

১. ভারত সম্পর্কিত মিথ্যা প্রচার খণ্ডন করা।

২. বর্তমানে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বকে অবহিত করানো।

৩. প্রত্যেক মানবীয় কর্মক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণের যথার্থ কৃতিত্বগুলির সহিত বিশ্বকে পরিচিত করানো।"

শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি বিশ্ববাসীদের সম্মুখে আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা ভালো ধারণা তুলিয়া ধরিতে পারি, আমরা তাহা হইলে স্বতঃই ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিব, সভ্যজগতের চোখে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিব এবং সর্বত্র সহানুভূতি-লাভ করিব।

এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে :

১. প্রতিটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয়দের যোগদানে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত।

২. বৈদেশিক পত্র-পত্রিকায় ভারত-সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৩. ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন ভাষায় ভারত সম্পর্কে গ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত।

৪. যাঁহাদের ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ আছে তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে

এরূপ অন্তত একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ইউরোপের কোনো-একটি কেন্দ্রীয় স্থলে থাকা উচিত।

৫. ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিরূপে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়মিত বিদেশ যাওয়া উচিত।

৬. বিদেশে ভারত-সম্পর্কিত চলচ্চিত্র-প্রদর্শন ব্যবস্থা করা উচিত।

৭. সর্বোত্তম শ্রেণীর বিদেশীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনকল্পে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড সহযোগে ভারত সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

৮. প্রতি দেশে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেই দেশের অধিবাসী ও ভারতীয়দের লইয়া মিশ্র সমিতি সংগঠিত হওয়া উচিত। এই ধরনের প্রতিটি সমিতির অনুরূপ সমিতি ভারতেও থাকা উচিত। প্রথম শ্রেণীর একটি উদাহরণ হইল ইন্দো-চেকোস্লোভাক সমিতি।

৯. ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও এই ধরনের মিশ্র সমিতি সর্বত্র গঠিত হওয়া উচিত। (ইহার একটি উদাহরণ হইল ভিয়েনার ইন্ডিয়ান-সেন্ট্রাল ইউরোপীয়ান সোসাইটি)। অনুরূপ সংগঠনের কাজ ভারতেও আরম্ভ হওয়া উচিত।

১০. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে মিশ্র চেম্বার্স অফ কমার্স (যেমন ইন্দো-চেকোস্লোভাক চেম্বার্স অফ কমার্স, ইন্দো-ইটালীয় চেম্বার্স অফ কমার্স, ইন্দো-অস্ট্রিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স প্রভৃতি) গঠিত হওয়া উচিত। ভারতেও অনুরূপ চেম্বার্স অফ কমার্স গঠিত হওয়া উচিত। এই ধরনের মিশ্র বণিক সভা প্রতিটি ইউরোপীয় দেশে আছে। একমাত্র ভারতই অদ্যাবধি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই।

১১. জেনেভায় ভারতের জন্য যে আন্তর্জাতিক কমিটি এ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহার মতো সংস্থাগুলিকে নিয়মিত সহায়তা দান করা উচিত। এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা ইউরোপ ও আমেরিকায় আছে। এই জাতীয় সমিতিগুলির মধ্যে কোনো-না-কোনো ধরনের সমন্বয় ব্যবস্থা থাকা উচিত।

দীর্ঘস্থায়ী বৈরিতামূলক প্রচারের দ্বারা সারাবিশ্বের নানা মহলে এইরূপ একটা ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছে যে আমরা একটা অসভ্য জাতি, আমাদের নারীরা দাসী এবং আমরা একটা জাতিও নাই, কেননা আমাদের সমাজ বিভেদ-বিদ্বেষে সমাচ্ছন্ন। আমরা কি নিজেদের একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়া পৃথিবী আমাদের

সম্বন্ধে কীভাবে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি? আমরা তাহা পারি না। ভালোর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক, আধুনিক ঘটনাবলীর দ্বারা আমরা মানব-সমাজের সাধারণ জীবনের অংশীদার হইতে বাধ্য। সেইজন্য বাহিরের জগৎ আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবে সে বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না। ইহা ছাড়া, অন্যান্য জাতি ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে কী কৃতিত্ব লাভ করিতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পারি। ইতিহাস আমাদের আরো শেখায় যে দাসত্ব-শৃংখলাবদ্ধ ও নির্যাতিত জাতিগুলির— বিশেষ করিয়া যাহারা হিংসার পথ বর্জন করে তাহাদের পক্ষে সভ্য জগতের সহানুভূতি অত্যাবশ্যক এবং সেই সহানুভূতি লাভের জন্য প্রচার চালাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ, ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর মতো বিশিষ্ট ভারতীয়গণ অতীতে বিদেশে কিছু পরিমাণ প্রচার করিয়াছেন এবং বিদেশী ভারতবন্ধুরা তাঁহাদের কাজ পরিপূরণ করিয়াছেন। ইহার ফলে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য এখনো ভারতের কিছুটা খ্যাতি আছে। কিন্তু আমাদের যদি আরো অগ্রগতি করিতে হয় তাহা হইলে ইহা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে যে ভারতীয় জনগণ -কর্তৃক সমর্থিত ধারাবাহিক প্রচার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা উচিত। বিদেশে এমন সব ভারতীয় আছেন যাঁহারা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যে এ কাজ করিতে কৃতসংকল্প। একমাত্র প্রশ্ন হইল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই সর্বগুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব লইয়া অধিকতর কার্যকরভাবে ও সুনিপুণভাবে তাহা করিবেন কিনা।

১৯৩৬ [?]

ভারতের প্রতি আয়ার্ল্যাণ্ডের সহানুভূতি

আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে 'ইউনাইটেড প্রেস' প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্র ভ্রমণের ছাড়পত্র দান ও সে-কারণে আমার জীবনের দীর্ঘ-পোষিত একটি ইচ্ছা পূরণ এবং ডাবলিনে সাদর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনালাভের জন্য আমি প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার কাছে কৃতজ্ঞ। পরলোকগত শ্রী ভি. জে. প্যাটেলের ইচ্ছা ও আদেশ ছিল যে আমি যেন দেশে ফিরিবার পূর্বে ডাবলিন পরিদর্শন করি এবং তিনি যে ভারত-আইরিশ লীগ স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার কার্যাবলী পুনরারম্ভের চেষ্টা করি। আমি আশা করি যে এই দিক হইতে আমার আয়ার্ল্যান্ড ভ্রমণ কিছুটা ফলপ্রসূ হইয়াছে।

আয়ার্ল্যান্ডে থাকাকালীন আমি সেই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্র পাইবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব বেশি-সংখ্যক দল ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নদের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি এমন অনেক কিছু দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি যাহা ভারতে আমাদের কাছে উপযোগী ও আকর্ষণীয় হইবে।

প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার 'ফিয়ানা ফেইল' (Fianna Fail) পার্লামেন্টে (ডেইলে) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং ইহার পিছনে মি. নর্টনের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক দলেরও সমর্থন আছে। মি. কসগ্রেভের 'ফিনে গেইল' (Fine Gael) বিরোধী দলরূপে রহিয়াছে। মি. কসগ্রেভের দলে বহু ভালো বক্তা ও দক্ষ বিতর্ক-পটুরা আছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'ফিয়ানা ফেইলে'র পিছনে দেশের সমর্থন রহিয়াছে, কারণ মি. কসগ্রেভের দল ব্রিটিশ-অনুরাগী দল বলিয়া বিবেচিত ও কার্যত সব ভূতপূর্ব ইউনিয়নপন্থীরা এই দলকে সমর্থন করেন। ব্লু শার্টের সংগঠক জেনারেল ও' ডাফি দলত্যাগ করায় মি. কসগ্রেভের দল দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি ফ্যাসিস্ট ধারায় ন্যাশনাল কর্পোরেট দল স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে দেশে 'ফিয়ানা ফেইলে'র অবস্থা দৃঢ় হইয়াছে।

বর্তমান আইরিশ রাজনীতিতে একমাত্র দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য 'ফিয়ানা ফেইল' ও রিপাব্লিকানদের বিরোধ। রিপাব্লিকানরা অভিযোগ করেন যে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা তাঁহার প্রতিশ্রুত প্রজাতন্ত্রের দিকে পা বাড়াইতেছেন না এবং তাঁহার সরকার রিপাব্লিকানদের উপর নির্যাতন চালাইতেছেন। ২৫ জন রিপাব্লিকানকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সরকারের মনোভাব এই যে রিপাব্লিকানরা

অতিমাত্রায় অধীর ও কৌশলহীন এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্ধ। দেশে একটি ব্রিটিশ-অনুরাগী দলের অস্তিত্ব এবং বিভক্ত আয়ার্ল্যান্ডের বাস্তব অবস্থিতি, অবিলম্বে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, অসম্ভব না হইলেও, কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। 'ফিয়ানা ফেইল' দলের সদস্যরা প্রজাতন্ত্রের আদর্শ মানিয়াও বলেন যে ইহার বাস্তব ঘোষণা কতকগুলি বিষয় কিংবা শর্তের উপর নির্ভরশীল। মোটের উপর আমার অভিমতে সরকারী দল ছাড়াও একটি রিপাব্লিকান দলের অস্তিত্ব আশীর্বাদ-স্বরূপ। 'ফিয়ানা ফেইল' যাহাতে কখনো তাহার প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ না ভুলিতে পারে তাহার সম্বন্ধে ইহা গ্যারান্টি স্বরূপ— কারণ তাহার এই ভুল যদি হয় তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইবে। আমি শুধু 'ফিয়ানা ফেইল' ও রিপাব্লিকানদের মধ্যে আরো হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক দেখিতে চাই— যেরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ১৯৩২ সালে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার প্রথম ক্ষমতায় আসার সময় ছিল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে মতভেদ হয় এবং মতভেদ শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব সৃষ্টি করে।

মি. ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াও আমি ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ 'ফিয়ানা ফেইল' মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই খুব সহানুভূতিসম্পন্ন, মানবিক উদারতাসম্পন্ন ও সহজগম্য ছিলেন। তাঁহারা তখনো 'মাননীয়' হইয়া উঠেন নাই। তাঁহাদের অধিকাংশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় পলাতক ছিলেন এবং তাঁহাদের সন্ধান পাইলে দেখামাত্র গুলিবিদ্ধ হইতেন। তাঁহারা তখনো আমলাতান্ত্রিক মন্ত্রী হইয়া উঠেন নাই এবং তাঁহাদের চার দিকে কোনো সরকারী পরিবেশ ছিল না। তাঁহারা কিভাবে বড়ো জমিদারিগুলি কিনিয়া কৃষিজীবীদের মধ্যে জমি বণ্টনের দ্বারা জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করিতেছিলেন তাহা আমি ভূমি-বিষয়ক মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। খাদ্যসরবরাহের ব্যাপারে তাঁহারা কিভাবে দেশকে স্বনির্ভর করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা আমি আলোচনা করিয়াছিলাম কৃষি-মন্ত্রীর সঙ্গে। সাগ্রহে জানিয়াছিলাম যে এখন বিস্তীর্ণ এলাকায় গম ও চিনির জন্য বীটের চাষ করা হইতেছে এবং কৃষির উন্নয়ন দেশকে গো-মহিষাদি পালনের উপর কম নির্ভরশীল করিয়া তুলিতেছে; সুতরাং ইংরাজের বাজারের উপর নির্ভরতাও কমিতেছে। ভারতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও আমি তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম এবং তিনি দায়িত্ব পাইলে ইহার সমাধান কিভাবে করিবেন সে সম্বন্ধে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শিল্প-মন্ত্রীর সঙ্গে আমি সরকারী শিল্পনীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা শুধু কৃষিতেই নয়, শিল্পেও দেশকে স্বয়ংনির্ভর করিয়া তুলিতে চান। ইহাতে দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইবে এবং সেইসঙ্গে তাঁহারা যদি ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রতিহিংসার সম্মুখীন হন তাহা হইলে তাহাতে তাঁহারা কম কাবু হইবেন। নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য কয়েক বৎসরের মধ্যে বিরাট আকারের অনেক কাজ করা হইয়াছে। শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার যাহা-কিছু করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করিয়াও আমার মনে হয় যে শিল্প পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাঁহারা সম্ভবত আরো বেশি সরকারী উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। মোটামুটি-ভাবে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমরা যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে জাতি-গঠনে আত্মনিয়োগ করিব তখন 'ফিয়ানা' মন্ত্রীদের কাজের অভিজ্ঞতা ভারতে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান হইয়া দাঁড়াইবে।

আয়ার্ল্যান্ডে এত কিছু শিখিবার ছিল অথচ আমার অবস্থান ছিল এত স্বল্পকালের। আমি এ কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম যে আয়ার্ল্যান্ড ইংল্যান্ডের একেবারে পার্শ্ববর্তী হইলেও আমাদের স্বদেশবাসীরা যাঁহারা ইংল্যান্ডে বৎসরের পর বৎসর কাটান তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আয়ার্ল্যান্ড পরিদর্শন করেন। আয়ার্ল্যান্ড ইংল্যান্ড হইতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিয়াছিলাম আয়ার্ল্যান্ডের সকল রাজনৈতিক দল নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিভেদ সত্ত্বেও ভারত এবং তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমান সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। আমি সেখানে থাকাকালীন ভারতের পক্ষে কিছুটা প্রচারকার্য চালাইতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি আনন্দিত। কয়েকটি অভ্যর্থনা-সভায় ও জনসভায় আমি ভারতের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলার সুযোগ পাইয়াছিলাম। নিজেদের তটভূমির বাহিরে যে দুইটি দেশ তাঁহাদের মনে সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহের সঞ্চার করে ভারতবর্ষ ও মিশর সে দুইটি দেশ।

লসেন, ২৩ মার্চ ১৯৩৬

স্বাধীনভাবে বিচরণে বাধা

ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসালের নিকট হইতে পত্র পাইবার পর হইতে এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত তাহা আমি ভাবিয়া চলিয়াছি এবং সেই মহান ভারতপ্রেমিক মঁ রোমাঁ রোলাঁ সহ কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় বন্ধুদের সহিত আমি পরামর্শ করিয়াছি। তাঁহাদের অধিকাংশ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস যখন আইন অমান্যের পথ খোলাখুলিভাবে ত্যাগ করিয়াছে তখন আমার কারাবরণ করা অর্থহীন হইবে এবং তাঁহারা মনে করেন যে আমি ভারতের বাহিরে মুক্ত মানুষ হিসাবে থাকিয়া আমাদের লক্ষ্য-সাধনের জন্য কিছুটা কাজ করিতে পারি। তাঁহারা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আরো বলিয়াছেন যে ইউরোপে আসার পর হইতে আমার স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত হইলেও এখনো সে উন্নতি সন্তোষ-জনক নয় এবং কারাদণ্ডের ফলে আবার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে পারে ও তাহার পুনরুদ্ধার কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।

এ ক্ষেত্রে আর-একটি বিবেচনার বিষয় এই যে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার পর হইতে কংগ্রেস কর্মীরা বহু ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বাধীন গতিবিধি সীমিত করিয়া যে-সকল সরকারী আদেশ জারী করা হইতেছে তাহার বিরোধিতা করিতেছেন না।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন বিবেচ্য নয়

এগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। কিন্তু এগুলিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছি যে লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব সিদ্ধান্তে আমার অটল থাকা উচিত।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে আমি সকল প্রকার ব্যক্তিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছি এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় লক্ষ্য-সাধনের ও জাতীয় কর্তব্যের দিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করিয়াছি। আমি যদি মনে করিতাম যে ভারতের বাহিরে থাকিয়া আমি জাতীয় লক্ষ্য-সাধনের জন্য বহুল পরিমাণে সেবামূলক কাজ করিতে পারিব তাহা হইলে দেশ আমাকে ভুল বুঝিবে এই ঝুঁকি লইয়াও আমি নিশ্চয় আমার প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখিতাম। কিন্তু আমি মনে করিলে বর্তমান অবস্থায় ইউরোপে থাকিয়া আমি জাতীয় লক্ষ্য-সাধনের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিব না।

কংগ্রেসের যথেষ্ট সমর্থন নাই

আমার আয়ত্তে যদি যথেষ্ট অর্থ অথবা যথেষ্ট কংগ্রেসী সমর্থন থাকিত তাহা হইলে আমার ইউরোপে থাকাকালীন জনজীবনগত উপযোগিতা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়া যাইত! কিন্তু প্যাটেল ভাণ্ডারের উইল কার্যকর করিবার ভারপ্রাপ্তগণই জানেন কেন সেই অর্থ সম্পর্কে একেবারে নীরব রহিয়াছেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

যদিও আমি, এই-সব অসুবিধা সত্ত্বেও, গত তিন বৎসর যাবৎ ভারতের লক্ষ্য-সাধনের অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছি, তবুও আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে আমার কৃতিত্ব-সাধন যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে এবং আমি যদি ইউরোপে থাকিয়া যাই তাহা হইলে আমার কৃতিত্ব-সাধন অতীতের তুলনায় বেশি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমার স্থান স্বদেশবাসীদের মধ্যে

এই অবস্থায় দেশে আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে আমার স্থান। আবার কারাগারে বন্দী হইলে আমার স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতে যে-কোনো জননেতাকে এরূপ অবস্থার সম্মুখীন সর্বদাই হইতে হইবে। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইল যখন গণ সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে আইন অমান্য স্থগিত রাখা হইয়াছে তখন আমি সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করিব কিনা। মৌলিক মানবীয় অধিকারে সরকারী হস্তক্ষেপ কখনো মাথা পাতিয়া মানিয়া লওয়া উচিত নয়।

ভারত সরকারের আদেশ রীতিমত কলংকজনক, কেননা ইহা কার্যকর করা হইলে তাহার ফলে বিনা বিচারে আটক করাই শুধু হইবে না, ইহা রাজনৈতিক সক্রিয়তার আশংকায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখার সামিল হইবে।

সরকারী সতর্কবাণীর নিকট আত্মসমর্পণ নয়

আমি গত ১৫ বৎসর ধরিয়া যে জনস্বার্থের সেবা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করিলে স্পষ্টই তাহার মর্যাদার হানি করা হইবে। আর আমার অতীত ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে আমি এরূপ সরকারী ভীতি প্রদর্শনের নিকট কখনো নতি স্বীকার করি নাই যদিও আমার নীতি

অনুসরণের পথে আমাকে বার বার কারাবরণ করিতেই শুধু হয় নাই, পুলিশের হাতে কায়িক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছে।

যদি, সরকারী চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী মৌলিক মানবীয় অধিকার অবদমিত হয়, তাহা হইলে ভারতে ও বিদেশে যে নূতন সংবিধানকে এত উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য ও স্বরূপ উদ্ঘাটনে সহায়তা হইবে।

এই-সব কারণে আমি দেশে ফিরিয়া যাইবার এবং সরকারী চিঠিটির প্রতি প্রাপ্য ঘৃণা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত লইয়াছি।

বাদগাস্টাইন, ৬ এপ্রিল ১৯৩৬

ভারতের স্বাধীনতার অধিকার

রোমাঁ রোলাঁর পত্রের উত্তর। ইউনাইটেড প্রেস-কর্তৃক প্রচারিত।

সম্মানিত মহাশয়,

আপনার ২৩ মার্চের সহৃদয় পত্র এবং তাহাতে যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহার জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আমি যে দুইবার ভিলেন্যুভেতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পাইয়াছিলাম সেজন্য আমি নিজেকে বিশেষরূপে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি সংগ্রামে আপনার চিন্তা ও শুভেচ্ছা আমাদের প্রতি রহিয়াছে— এই উপলব্ধি আমার ও আমার দেশবাসীদের কাছে শক্তি ও প্রেরণার উৎস স্বরূপ। ভারতের যুগার্জিত সংস্কৃতি সম্বন্ধে আপনার মর্মগ্রাহিতা ও সারা পৃথিবীতে সেই সংস্কৃতিকে পরিচিত করাইবার জন্য আপনার প্রয়াস আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভারতের স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আপনার অভিমতকে আমরা অধিকতর মূল্য দিই। আমি ভিলেন্যুভেতে যে আনন্দময় সময় অতিবাহিত করিয়াছি তাহার মধুরতম স্মৃতি আমি বহন করিয়া লইয়া যাইব।

বর্তমানে ভারতে প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখিবার জন্য আপনার পক্ষ হইতে মাদাম রোলাঁ যে পরামর্শ দিয়াছেন আমি তাহা নিবিড় ভাবে ও গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। এ ব্যাপারে আপনাদের অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলেও আমি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে— যাহার একটি নকল এইসঙ্গে সন্নিবদ্ধ করিলাম— যে-সব কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সেই-সব কারণে আমি মনে করি যে সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া অবিলম্বে ভারতে প্রত্যাবর্তন আমার কর্তব্য। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সৃষ্টিশীল বৎসরগুলি কাটানো পরিতাপের বিষয় হইলেও এই পৃথিবীতে দাসত্বাধীন জাতিকে এই মূল্য সর্বদাই দিতে হইয়াছে এবং দিতে হইবে।

মাদাম রোলাঁ ও আপনাকে আমার গভীরতম শ্রদ্ধা এবং আপনাদের সদাশয়তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা, এইসঙ্গে জানাইতেছি।

আপনার শ্রদ্ধাবনত

সুভাষচন্দ্র বসু

বাদগাস্টাইন, ৮ এপ্রিল ১৯৩৫

ইউরোপ : আজ ও আগামীকাল

আধুনিক রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতিকে 'বিত্তবান' ও 'সর্বহারা' এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রথাসিদ্ধ। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশ হইল যাহারা দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে ভার্সাই, ট্রিয়ানন ও নিউইদিল্লির সন্ধিগুলির ফলে লাভবান হইয়াছে। আর সেই-সব দেশ সর্বহারা, যাহারা এই-সব সন্ধির কোনো কোনোটির ফলে নিজেদের ভূখণ্ড হারাইয়াছে কিংবা সন্ধিগুলির শর্তাদি সম্বন্ধে যাহাদের অভিযোগ আছে। ইউরোপে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ভূতপূর্ব অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য হইতে যে-সব রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহারা 'বিত্তবান'দের দলে। অন্যদিকে জার্মানী, ইটালী, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়া 'সর্বহারা'দের দলগত যুদ্ধের ফলে যদিও রাশিয়া বহু ভূখণ্ড হারাইয়াছিল তবু সে এখন স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে আগ্রহী এবং সেইজন্য তাহাকে 'বিত্তবান'দের দলে ফেলা হয়। যদিও যুদ্ধের শেষে ইটালী অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হইতে ভূখণ্ড দখল করিয়াছিল তবু তাহাকে 'সর্বহারা'র দলে ফেলা হয় এই কারণে যে, যুদ্ধের লুঠের আরো বখরা পাইবার প্রত্যাশা তাহার ছিল। ১৯১৫ সালে লন্ডনের গোপন চুক্তির শর্তদ্বারা ইটালীকে মিত্রপক্ষে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাকে ডালমাসিয়ান উপকূল সহ আরো কয়েকটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু পরে শান্তি সম্মেলন যুগোস্লাভিয়াকে ডালমাসিয়ান উপকূল দিয়াছিল (শান্তি চুক্তিতে যুগোস্লাভিয়ার নামকরণ করা হইয়াছে সার্ব, ক্রোট ও স্লোভেনদের রাজ্য রূপে)।

'সর্বহারা'দের মধ্যে বুলগেরিয়া সর্বাপেক্ষা বেশি শান্ত। ১৯১২ সালের বল্কান যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধের ফলে সে তাহার সকল প্রতিবেশী দেশের (রুমানিয়া, গ্রীস ও সার্বিয়া— এখন যুগোস্লাভিয়া) কাছে নিজের ভূখণ্ড হারাইয়াছে। কিন্তু সে গোপনে তাহার অভিযোগ পুষিয়া রাখিয়াছে এবং সুদিনের প্রত্যাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, যদিও সে বিরুদ্ধ শক্তিগুলির বৃত্তের মধ্যে নিজেকে অসহায় বোধ করে। হাঙ্গেরী অন্তত প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্রিয়। তাহার সমর্থকগণ সারা ইউরোপে বিচরণ করিয়া বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে তাহার সীমান্ত সংশোধনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য প্রচারকার্য চালান। সামরিক দৃষ্টিকোণের বিচারে হাঙ্গেরীর আজ আর কোনো গুরুত্ব নাই; সে তাহার ভূতপূর্ব ভূখণ্ডের ও জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি

হারাইয়াছে চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া (পূর্বে সার্বিয়া) এবং রুমানিয়ার কাছে।

অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে দৈত্যাকৃতির বিস্ফোরক শক্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নাই। লেনিনের মৃত্যুর পর ও ট্রট্‌স্কির ক্ষমতাচ্যুতির পর স্টালিনের পরিচালনাধীন সোভিয়েট রাশিয়া সোভিয়েট সীমান্তের মধ্যে সমাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে একমাত্র আগ্রহী। জার্মানীর আকস্মিক পুনরভ্যুদয় এই প্রবণতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং রাশিয়া ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রভাবাধীন জাতি-সংঘে (লীগ অফ নেশনস) যোগ দিয়াছে এবং 'সামূহিক নিরাপত্তা ও শান্তি'র ধ্বনি তুলিয়া ইউরোপে বর্তমান অবস্থার রদবদল প্রতিরোধের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রয়াস করিতেছে।

আজ ইউরোপে ফ্যাসিস্ট ইটালী ও নাৎসী জার্মানী প্রকৃত বিস্ফোরণাত্মক শক্তিসমূহ। তাহাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া। ইউরোপের জটিল দাবার ছকে অসংখ্য চাল চলিতেছে এবং দিনের পর দিন দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিতেছে। মহাযুদ্ধের পূর্বে 'শক্তির ভার-সাম্য' রক্ষা করিয়া স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হইয়াছিল। স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে আগ্রহী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া থাকিত এবং যে-সব সম্ভাব্য বিরুদ্ধ শক্তি তাহাদের সংগে যোগ দিতে অস্বীকৃত হইত তাহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাইবার চেষ্টা করা হইত। ১৯১৯ সালে যে জাতি-সংঘ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল গোপন দৌত্যের অবসান এবং যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগোষ্ঠীগুলি পৃথিবীকে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধকে জিয়াইয়া রাখিত তাহার অবসান ঘটানো। ইহার পরিবর্তে একটা নূতন কর্মপদ্ধতি চালু করা হইয়াছিল এবং তাহার লক্ষ্য ছিল সকল দেশকে জাতি-সংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে 'সামূহিক নিরাপত্তা ও শান্তি'র জন্য যৌথভাবে দায়ী করা। জাতি-সংঘ ও তাহার নূতন কর্মপদ্ধতি উভয়েই লক্ষ্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ এমন কিছু শক্তি আছে যাহারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে আগ্রহী নয়। ইহাদের মধ্যে জাপান ও জার্মানী [illegible] আর সংঘের সদস্য নয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা [illegible] ক্ষমতার অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো কখনো ইহার সদস্যই হয় নাই।

ইউরোপের সাম্প্রতিক গোলযোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে ফ্যাসিস্ট
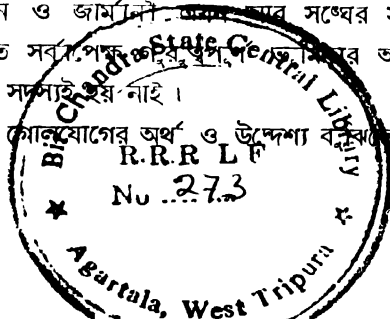
ইটালী ও নাৎসী জার্মানীর লক্ষ্যগুলি বুঝিতে হইবে। ১৯২২ সালে মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার পর হইতে ইটালী আক্রমণাত্মকভাবে সম্প্রসারণের কথা ভাবিতেছে —পৃথিবীতে একটা বড়ো স্থান পাইবার কথা এবং রোমক সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবনের কথা। কিন্তু ১৯৩৫-এর জানুয়োরি মাসের পূর্বে পর্যন্ত ইটালী নিজেই জানিত না তাহার সম্প্রসারণের নীতি কোন্ দিক অনুসরণ করিয়া চলিবে। যে যুগোস্লাভিয়া তাহাকে ডালমাসিয়ান উপকূলে হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ইটালীর অভিযোগ ছিল। ফ্রান্সের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল এই কারণে যে ইটালীয় জেলা স্যাভয় ও নাইস তাহার দখলে গিয়াছে, উত্তর আফ্রিকায় বিরাট ইটালীয় জনসংখ্যা সহ টিউনিসিয়া তাহার দখলে ছিল এবং ভৌগোলিক বিচারে যে কর্সিকা দ্বীপ ইটালীর, ফ্রান্স তাহারও মালিক হইয়াছিল। ইটালী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের এই কারণে বিরোধী ছিল যে ব্রিটেন ইটালীয় 'মাল্টা' নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিল এবং ফ্রান্সের সম্মতিক্রমে ভূমধ্যসাগরকে একটি ব্রিটিশ হ্রদে পরিণত করিয়াছিল।

ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে উত্তেজনা খুব তীব্র ছিল এবং তাহার ফলে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যবর্তী সীমান্ত সুরক্ষিত করা হইয়াছিল ও উভয় দিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তার পর ১৯৩৯ সালে হঠাৎ নাৎসী দানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং ফলে ইউরোপের সমগ্র দৃশ্যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল। নূতন বিপদের বিরুদ্ধে সমর্থন ও মৈত্রীর আশায় ফ্রান্স ব্রিটেনে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন ন যযৌ ন তস্থৌ নীতি লইয়া বসিয়াছিল। হয়তো সে হৃদয়ের অন্তস্তলে আশা পোষণ করিতেছিল যে ইহাতে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব বিস্তার প্রতিহত হইবে। হয়তো সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার ঐতিহ্যগত নীতিকে সরলভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স জালে পড়িয়া বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়াছিল ইটালী ও সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে। ফ্রান্স ইটালীয় সীমান্ত হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে তাহা সমাবেশ করিতে চাহিয়াছিল এবং তদূর্ধ্বে জার্মানীর পূর্বদিকে সে একটি মিত্রশক্তি চাহিয়াছিল। এইভাবে লাভাল-মুসোলিনি চুক্তি ও ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি ঘটিয়াছিল।

১৯৩৫-এর জানুয়ারি মাসে সম্পাদিত লাভাল-মুসোলিনি চুক্তি ইটালীর ভাবী সম্প্রসারণের দিক নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল। ইটালী, ফ্রান্সের সহিত তাহার বিরোধের অবসান ঘটাইয়াছিল এবং ইউরোপে তাহার ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

করিয়াছিল। পরিবর্তে ফ্রান্স, আফ্রিকায় তাহার আত্মসম্প্রসারণের অধিকার মানিয়া লইয়াছিল। আবিসিনিয়া ধর্ষণ তাহার পরিণতি।

আবিসিনিয়া বিজয়ের পর মুসোলিনি একটি বক্তৃতায় পৃথিবীর সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ইটালী এখন 'সন্তুষ্ট' শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবিসিনিয়ার সংযোজনকে ব্রিটেন আফ্রিকায় তাহার রক্ষিত ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই বক্তৃতাটি ইংগ-ইটালীয় বন্ধুত্ব নবীকরণের সম্ভাবনার দিকে নজর রাখিয়া করা হইয়াছিল। সেই প্রত্যাশা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই। যদিও ব্রিটেন প্রথমে আবিসিনিয়ার প্রশ্নে ইটালীকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল এবং পরে মুসোলিনির বাগাড়ম্বর ও হুমকির সম্মুখে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল তবু সে সেই অপমান ভোলে নাই। ভূমধ্যসাগরীয় ও নিকট-প্রাচ্যের জাতিগুলির কাছে তাহার যে মর্যাদা হানি হইয়াছিল, তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে সে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় তাহার নৌ-ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটিগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল। নৌ-বিভাগীয় প্রথম লর্ড স্যার সামুয়েল হোর ভূমধ্যসাগর পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং পরিদর্শন শেষে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ব্রিটেন ওই এলাকা হইতে সরিয়া আসিবে না। অ্যান্টনি ইডেনের মতো মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রী এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভূমধ্যসাগর ব্রিটেনের জীবন-সূত্র— ইহা তাহার সহজ চলাচলের পথ মাত্র নয়, ইহা তাহার ধমনী বিশেষ।

ব্রিটেনের পক্ষে ভূমধ্যসাগরে নিজের শক্তি রক্ষা ও সে শক্তি আরো বৃদ্ধি করার সংকল্প ইটালীকে বিরক্ত ও শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, কারণ ইটালীও তাহার নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে সমান কৃতসংকল্প এবং একমাত্র ব্রিটেনের স্বার্থ বিনষ্ট করিয়া তাহা করা সম্ভব। সুতরাং ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে বর্তমান ইংগ-ইটালীয় উত্তেজনা ইল ডুচের বদমেজাজের ফল নয় কিংবা ইহা একটা সাময়িক ব্যাপারও নয়। যে পর্যন্ত না বিরোধী দুইটি শক্তির যে-কোনো একটির স্বেচ্ছায় পশ্চাদ-পসরণ কিংবা পরাজয়ের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে ভাবী কর্তৃত্বের প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধান হয়, সে পর্যন্ত ইহা চলিবে। নেভিল চেম্বারলেইন ও সিনর মুসোলিনির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সুলভ পত্রবিনিময় হইতে পারে, রাষ্ট্রদূতগণ ও বৈদেশিক মন্ত্রিগণ করমর্দন করিতে পারেন— কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ও শক্তি হইতে উদ্ভূত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণগুলি যতদিন বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তাহাও অব্যাহত থাকিবে।

স্পেনীয় গৃহ-যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের নূতন আগ্রহের উত্তর ইটালী দিয়াছে। ইহা চিন্তা করা কিংবা এরূপ বলা শিশুসুলভ হইবে যে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট লক্ষ্যের প্রতি সহানুভূতির দরুন কিংবা তাহার কম্যুনিজম বিদ্বেষের দরুন, ইটালী ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে গিয়াছে। ফ্রাঙ্কোর প্রতি তাহার রাজনৈতিক সহানুভূতি যে-কোনো অবস্থায় থাকিবে— কিন্তু সে যে ফ্রাঙ্কোর জন্য নিজের রক্ত ও অর্থ নিঃশেষে ঢালিতেছে তাহা মূলত সমরকৌশলের দরুন। জার্মানীর ক্ষেত্রেও এই একই সত্য এবং যিনি তাহা বুঝেন না তিনি স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের কিছুই বুঝেন না।

নিজের অস্ত্রসজ্জায় অগ্রগতি সত্ত্বেও ইটালী কোনোক্রমে ব্রিটেনের সমকক্ষ নয়। সারা বিশ্বে ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জা আবিসিনিয়ার যুদ্ধ অবসানের পর হইতে ইটালীর অবস্থা দুর্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। ইটালীর সঙ্গে যুদ্ধ হইলে ব্রিটেন জিব্রাল্টার ও সুয়েজ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ইটালীয় নৌবাহিনীকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে এবং অর্থনৈতিক অবরোধের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা ইটালীর পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইটালীকে কয়লা, লোহা, তৈল, পশম, তুলা প্রভৃতি অধিকাংশ কাঁচামাল আমদানি করিতে হয় এবং যেখানে তাহার নৌবাহিত বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ আসে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের বুক দিয়া, তাহার আমদানির শতকরা আশিভাগ আসে ভূমধ্যসাগর দিয়া। তাহার তীরভূমি দীর্ঘ ও দুর্ভেদ্য এবং একমাত্র ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য করিতে পারিলে তাহার পক্ষে তাহার আফ্রিকাস্থিত অধিকার লিবিয়া, ইরিট্রিয়া ও আবিসিনিয়ার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব। এই-সব কারণে মাল্টা ও সাইপ্রাসের মতো ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটি হইতে আক্রমণ সহ অর্থনৈতিক অবরোধ ইটালীর ভয়ংকর বিপদ সৃষ্টি করিতে পারে এবং এমন-কি তাহার শ্বাসরোধ করিতে পারে। সে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ অধিকারগুলি আক্রমণ করিয়া কিংবা সেই সাগর দিয়া চলাচলকারী ব্রিটিশ বাণিজ্য আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে; কিন্তু ভূমধ্যসাগর এলাকার বাহিরে অবস্থিত ব্রিটেনকে সে আক্রমণ করিতে পারে না কিংবা ব্রিটেনের কাঁচামাল ও খাদ্যের উৎসগুলিকেও স্পর্শ করিতে পারে না। এইভাবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইটালী কার্যত অসহায় এবং মূলত সে রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

আর যতদিন স্পেন ব্রিটেনের প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন কিংবা এমন-কি নিরপেক্ষ থাকিবে ততদিন ইটালীর অসহায়তা ঘুচিবে না। একমাত্র স্পেনের সহায়তায় ইটালী তাহার দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তির আশা করিতে পারে। স্পেনকে নিজের

নিয়ন্ত্রণে পাইলে ইটালী বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রয়াস করিতে পারে। সে জিব্রাল্টার ধ্বংস করিতে পারে এবং ব্রিটেনের দুইটি বাণিজ্যপথকে— ভূমধ্য-সাগরীয় পথ ও উত্তমাশার পথ— বিপন্ন করিতে পারে। অধিকন্তু তাহা এই যে অতলান্তিক সমুদ্রের দিক হইতে তাহার আমদানি দ্রব্যাদি স্থলপথে স্পেনের উপর দিয়া আসার ব্যবস্থা করিয়া সে সম্ভাবিত অর্থনৈতিক অবরোধ কাটাইয়া উঠিতে পারে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় যেমন ব্রিটেনের সহিত তুলনায় ইটালীয় নৌবাহিনীর দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে তাহার বিমান বাহিনী সহায়তা করিয়াছিল, তেমনই স্পেনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে কিংবা স্পেনীয় ভূখণ্ডে পা রাখিতে পারিলে, ভাবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাহার বর্তমান মারাত্মক রকমের দুর্বল ও আত্মরক্ষা-মূলক অবস্থাকে সে প্রবল ও আক্রমণাত্মক অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবে।

এইভাবে ইটালী, গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্পেনে লড়াই করিতেছে। সে স্পেনের ভূখণ্ডে পা রাখিবার মতো জায়গা পাইবার জন্য ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতেছে।

এই-সব রণকৌশলের দিক বিবেচনা করিলে ইটালী যে ফ্রাঙ্কোর সাফল্যে এতটা আগ্রহী তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না বরং ইহাই বিস্ময়কর যে ফ্রাঙ্কো ও বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইবার মতো মানুষ ব্রিটেনে আছেন। এ-বিষয়ে সুপরিচিত ব্রিটিশ সমরকুশলী ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট তাঁহার 'ইউরোপ ইন-আর্মস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"সমরকৌশলের দিক হইতে বিপদ (ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে) এত স্পষ্ট যে ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে সর্বাধিক স্বীকৃত দেশপ্রেমিক অংশগুলির কিছু মানুষ কিভাবে এত আগ্রহের সংগে বিদ্রোহীদের সাফল্য কামনা করেন তাহা বোঝা কঠিন।"

ইহা হয়তো স্বার্থের উপর রাজনৈতিক কুসংস্কারের (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিস্টদের প্রতি ঘৃণা) বিজয়ী হইবার একটি উদাহরণ।

আমি যাহা-কিছু বলিয়াছি তাহা সত্ত্বেও ইহা বলিতে হইবে যে ইটালী আজ মোটামুটি একটা তৃপ্ত শক্তি। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ প্রভুত্বের হ্রাস তাহার কাম্য এবং মনে করে যে প্রাচীন কালের মতো ভূমধ্যসাগরের একটি রোমক হ্রদ হইয়া থাকা উচিত। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের সহিত তাহার বিরোধে সে চরম কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ তাহার দিক হইতে ভালো মনে করে কেননা সে ইহা ভালোভাবে জানে যে কোনো বৃহৎ শক্তিই এখনো

আন্তর্জাতিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। মুসোলিনি এত সুচতুর রাজনীতিবিদ্ যে তিনি অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে কোনো বিপজ্জনক অভিযানে নিজেকে কিংবা তাহার দেশকে জড়াইয়া ফেলিবেন না। অতএব আমরা নিশ্চিত থাকিতে পারি যে ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য ইটালী আক্রমণাত্মক কিছু করিবে না কিংবা সে বিজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হইলে কোনো যুদ্ধে যোগ দিবে না।

কিন্তু জার্মান সেনাবাহিনীর ধীর ও সাবধানী নীতি সত্ত্বেও হিটলারের অধীন জার্মানী কী করিবে বলা কঠিন। নাৎসী জার্মানী এমন স্বপ্ন দেখিতেছে যাহা কেবল যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ণ হইতে পারে। তাহা ছাড়া জার্মানীর অভ্যন্তরে অর্থ-নৈতিক সংকট এমন তীব্র রূপ ধারণ করিতেছে যে, অনেক পর্যবেক্ষক এই অভিমত পোষণ করেন, এমন দিন সুদূর নয় যখন দেশের অসন্তোষ চাপা দেওয়ার জন্য তাহাকে স্বদেশের বাহিরে যুদ্ধাভিযান আরম্ভ করিতে হইতে পারে। জার্মানীর ভবিষ্যৎ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে আর-একটু গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে।

মহাযুদ্ধের পর হইতে ইউরোপীয় মহাদেশে ফরাসী প্রভুত্ব চলিয়াছে। জার্মানীকে পরাজিত করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া ফ্রান্স, পোল্যান্ড ও ক্ষুদ্র-আঁতাত নামে পরিচিত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সহিত মৈত্রীর মাধ্যমে জার্মানীর চারি দিকে কূটনৈতিক প্রাকার নির্মাণ করিয়াছে। পরে এই নীতি অনুসরণ করিয়া যে তুরস্ক পূর্বে জার্মান প্রভাব-বৃত্তের মধ্যে ছিল তাহার সঙ্গে ফ্রান্স হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। জার্মানী যখন এইভাবে কূটনৈতিক বিচারে সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল তখন অসহায়ের মতো তাকাইয়া থাকা ছাড়া তাহার উপায় ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে র‍্যাপালো চুক্তি সম্পাদন করিয়া এই ঘেরাও-এর কর্মনীতির একমাত্র জবাব সে দিয়াছিল।

১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ফ্রান্সের হীন পরাজয়ের পর হইতে ইউরোপীয় মহাদেশে যে জার্মানীর প্রভাব ছিল সর্বাধিক তাহার কাছে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ফরাসী প্রভুত্ব বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। তখন হইতে জার্মানী কয়েকটি দিকে আত্মসম্প্রসারণ করিতেছিল: ইউরোপের বাহিরে যে ঔপনিবেশিক সম্প্র-সারণের প্রয়াসী হইয়াছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। সে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং ব্রিটেন উহাকে সন্দেহের চোখ দেখিত। সে অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ককে নিজের তাঁবে আনিয়াছিল এবং বার্লিন-বাগদাদ রেলওয়ের পরিকল্পনা

করিয়াছিল। প্রাচ্যে ব্রিটেনের অধিকারগুলির দিকে ইহার লক্ষ্য ছিল এইরূপ মনে করা হইত। কিন্তু যুদ্ধ এই-সব কৃতিত্ব ও আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল এবং দশ বৎসর ধরিয়া সে হতাশার পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল আর এই সময় তাহার চিন্তাবিদ্‌গণ পাশ্চাত্যের অবক্ষয় সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন এবং স্পেংলার তাঁহার *Untergand des Abend-Landes* লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ন্যাশন্যাল-সোস্যালিস্ট কিংবা নাৎসী দলের মাধ্যমে নূতন জাগরণ আসিয়াছিল।

নাৎসী দলের রাজনৈতিক মতবাদ একটি শব্দসমষ্টির মধ্যে সংক্ষেপিত করা যায়— 'Drang Nach Osten' অর্থাৎ পূর্ব দিকে আগাইয়া চলো। এই মতবাদ প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন Muller van den Bruck তাঁহার বই *Das dritte Reich* যাহার অর্থ তৃতীয় সাম্রাজ্য। তিনি ১৯৩৩ সালে হিটলারের অধীনে তৃতীয় রাইখ-এর প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই. কারণ তিনি হতাশার আকস্মিক আক্রমণে ১৯২৫ সালে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যাহা হউক. তাঁহার ভাবনা হিটলার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯২৩ সালে তিনি (হিটলার) কারাগারে বসিয়া 'মেইন্ ক্যাম্প' অথবা 'আমার সংগ্রাম' নামে যে বই লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই ভাবনাটি আরো সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। উল্লিখিত মতবাদের মূল কথা হইল জার্মানীকে নৌশক্তি কিংবা ঔপনিবেশিক শক্তি হওয়ার ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ইউরোপীয় মহাদেশের শক্তি হইয়াই থাকিতে হইবে এবং এই মহাদেশের পূর্বদিকে তাহার সম্প্রসারণ হওয়া উচিত। যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানীর ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রয়াস করিতে গিয়া গ্রেট ব্রিটেনের সহিত বিরোধে জড়াইয়া পড়া বৃহত্তম ভুল হইয়াছিল।

হিটলার যেভাবে নাৎসীদের নূতন সামাজিক দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে ইহুদি-প্রভাবের অবসান ঘটাইয়া জার্মান জাতির বিশুদ্ধিকরণ ও তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলার কথা বলা হয় এবং ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়। জার্মানী জনগণের নূতন ধ্বনি হইল '*Blunt und Boden*' কিংবা 'রক্ত এবং মাটি'। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নাৎসীরা সমস্ত জার্মানভাষী মানুষের একীকরণ এবং বর্ধনশীল জার্মান জাতির জন্য পূর্বদিকে বাসস্থান সংগ্রহের কথা বলেন। বাস্তব রাজনীতিতে উল্লিখিত লক্ষ্যগলির অর্থ হইল : ১. অস্ট্রিয়ার সংযোজন* ২. যে মেমেল সে লিথুয়ানিয়ার কাছে হারাইয়াছে তাহার পুনঃ সংযোজন ;

* ইহা লিখিত হইবার পরে নাৎসীগণ কর্তৃক আন্সক্লাস্ (Anschluss) কিংবা অস্ট্রিয়ার সহিত একীকরণ সম্পন্ন হইয়াছে।

৩. জাতিসংঘের আওতায় যে ডানজিগকে স্বাধীন নগর করা হইয়াছে তাহার পুনঃসংযোজন ; ৪. ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যা সহ চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মানভাষী অংশের সংযোজন ; ৫. যে পোলিশ করিডর ও সাইলেসীয় কয়লাখনি অঞ্চল সে পোল্যান্ডের কাছে হারাইয়াছিল তাহার পুনঃসংযোজন ; ৬. সোভিয়েট ইউক্রেনের সমৃদ্ধ শস্য উৎপাদনকারী জমিগুলির সংযোজন এবং ; ৭. সম্ভবত সুইজার্ল্যান্ড, ইটালীয় টাইরল এবং অন্যান্য সন্নিহিত দেশগুলির জার্মানভাষী অংশগুলিরও সংযোজন।

জার্মানী ১৯৩৫-এর মার্চ মাসে ভার্সাই সন্ধির সামরিক ধারাগুলি মানিতে অসম্মত হইয়াছিল, ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে রাইনল্যান্ড দখল করিয়াছিল এবং সে একটি গুলি না ছুঁড়িয়াও 'অ্যানসক্লাস' অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার সহিত একীকরণ সম্পন্ন করিয়া ইউরোপীয় কূটনীতিবিদগণের সকল হিসাব-নিকাশ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। এইরকম অবস্থার মধ্যে তাহার অব্যাহত অস্ত্রসজ্জার অর্থ একটিই অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। তাহার পুনরস্ত্রসজ্জা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের দেহে শেষ মৃত্যুবাণ হানিয়াছে এবং নিছক সন্ত্রাসের বশবর্তী হইয়া সমগ্র ইউরোপ আজ পুনরস্ত্রসজ্জায় নিয়োজিত। যখন চতুর্দিকে এইরূপ ঝটিতি যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলিয়াছে তখন একদিন সামান্যতম ঘটনায় আন্তর্জাতিক অগ্নিকান্ড ঘটিতে পারে। জার্মানী তাহার লক্ষ্য পূরণের জন্য কতদূর পর্যন্ত যাইবে তাহা এখন আমাদের বিবেচ্য। কোন্ পর্যায়ে এবং কাহার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করিবে?

রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদাই কঠিন কাজ— তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। জার্মানী তাহার অতীত পরাজয়ের শিক্ষা ভোলে নাই। তাহার সামরিক পরাজয় ঘটে নাই, ঘটিয়াছিল অর্থনৈতিক পরাজয়। আর ব্রিটিশ নৌবাহিনীই তাহাকে অনশনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইবার জন্য প্রাথমিক ভাবে দায়ী। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে জার্মানী যদি জানে যে ব্রিটেন তাহার বিরুদ্ধে আছে তবে যুদ্ধে সে যোগ দিবে না। ১৯১৪ সালে জার্মানী মূর্খের মতো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করে নাই যে, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পক্ষ লইয়া ব্রিটেন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবে। ঐতিহাসিকগণ ইহা এখন সাধারণভাবে স্বীকার করেন যে ব্রিটেন যদি পূর্ব হইতে জার্মানীকে তাহার অভিপ্রায় জানাইত তাহা হইলে সম্ভবত সে অস্ট্রো-সার্বীয় বিরোধ হইতে দূরে সরিয়া থাকিত এবং এইভাবে সে বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ রাখিত কিংবা নিদানপক্ষে মুলতুবি রাখিত।

যদিও তাঁহার বই 'মেইন ক্যাম্পে' হিটলার ফ্রান্সের সহিত একটা চূড়ান্ত বোঝা-

পড়ার কথা বলিয়াছেন, তবু নাৎসীরা ক্ষমতায় আসার পর জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি সংশোধিত হইয়াছে। জার্মানী এখন আর ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসাস-লোরেন কিংবা বেলজিয়ামের নিকট হইতে ইউপেন-ম্যানমাতি ফেরত পাইতে চায় না। অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে জার্মানী পশ্চিম ইউরোপে তাহার সীমান্ত সংশোধন দাবি করে না। ইহার কারণ খুঁজিতে দূরে যাইতে হইবে না। জার্মানী ইহা ভালোভাবে জানে যে ফ্রান্স কিংবা হল্যান্ডের উপর আক্রমণ, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনকে যুদ্ধে টানিয়া আনিবে এবং হয়তো তাহার ফলে বিগত যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। জার্মানী সেইজন্য প্রতিনিয়ত পশ্চিমী চুক্তি সম্পাদন করিয়া পশ্চিম ইউরোপে স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের প্রস্তাব করিতেছে। বহুসংখ্যক ব্রিটিশ রাজনীতি-বিদের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় কারণ ইহার ফলে চিরদিনের মতো ব্রিটিশ স্বার্থের সম্ভাব্য বিবাদ কাটিয়া যাইবে। এই প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী আন্তর্জাতিক বাজারে দর-কষাকষির জন্য কঠিন প্রয়াস করিতেছে। তাহার দাবি এই যে এই শান্তির বিনিময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিতে হইবে যাহাতে জার্মানী পৃথিবীর এই অংশের মানচিত্র নিজের খুশিমতো পুনর্বিন্যাসের সুযোগ পায়।

জার্মানী বর্তমানে তিনদিকে প্রস্তুতি চালাইতেছে। প্রথমত, সে সর্বাঙ্গীণ পুনরস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা করিতেছে। দ্বিতীয়ত, সে খাদ্য ও মৌলিক কাঁচামাল সরবরাহে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে। (ইহা ভাবী অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা)। জার্মানীর চতুর্থ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে গত বৎসর এ কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, মধ্য কিংবা পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে পশ্চিমী শক্তিগুলি যাহাতে নিরপেক্ষ থাকে সেজন্য সে এই শক্তিগুলিকে বুঝাইয়া রাজি করানোর চেষ্টা করিতেছে। এই-সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হইলে জার্মানী স্বেচ্ছায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবে— সে-বিষয়ে রীতিমতো সন্দেহের কারণ আছে।

ব্রিটেনকে নিরপেক্ষ মনোভাবে আনিবার জন্য জার্মানী সেই দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচারাভিযান চালাইয়াছে এবং ইহাতে সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এই কাজে ব্রিটেনে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কম্যুনিজম সম্বন্ধে যে সাধারণ ঘৃণা আছে জার্মানী তাহা কাজে লাগাইয়াছে। ফ্রান্স-সোভিয়েট চুক্তি এই কাজে সহায়ক হইয়াছে এবং নাৎসীরা অনবরত জোর দিয়া ইহা বলেন যে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের বন্ধন থাকার অর্থ হইল এই যে, পূর্ব ইউরোপে ব্রিটেনের

কোনো স্বার্থ না থাকিলেও ব্রিটেনকে সে অঞ্চলে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ লইয়া লড়াই করিতে হইবে। ইহার সহিত নাৎসীরা এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন যে তাঁহারা বিশ্বের কোথাও ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবেন না। এই উদ্যোগের ফলে ব্রিটেনে একটা প্রভাবশালী নাৎসী সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টি হইয়াছে— লর্ডস সভায়, লণ্ডন মহানগরীতে এবং সাধারণভাবে শাসক শ্রেণী ও সামরিক বাহিনীতে এই সমর্থকগণ আছেন। ভিন্ন কারণে হইলেও, এমন-কি শ্রমিকদলের মধ্যেও সমর্থকরা রহিয়াছেন।

ইহা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ডের গভর্নর মন্টেগু নর্মান, প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের ভূতপূর্ব শক্ত মানুষ স্যার রবার্ট ভ্যান্সিটার্ট— ইঁহারা সকলেই নাৎসী সমর্থক। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি সোজা পথ ধরিয়া চলিবে কিংবা অতীতে প্রায়ই যেরূপ হইয়াছে সেইরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিবে তাহা বলার সময় এখনো আসে নাই। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ জনমত ভীষণভাবে বিভ্রান্ত। প্রথমত, পূর্বোল্লিখিত একটি নাৎসী সমর্থক গোষ্ঠী আছেন যাঁহারা পশ্চিমী চুক্তি চান এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতে যাঁহারা নারাজ। দ্বিতীয়ত, উইনস্টন চার্চিল যাহার প্রতিনিধি সেই নাৎসী-বিরোধী রক্ষণশীল দল আছেন যাঁহারা নাৎসীদের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং যাঁহারা ভয় করেন যে, জার্মানী যখন ইউরোপে একবার প্রভুত্বশালী হইয়া উঠিবে তখন সে বিদেশে ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হানিবে। ইঁহারা এই প্রসঙ্গে বলেন যে ব্রিটেনের ফ্রান্সের দিক হইতে ভয়ের কিছু নাই এবং ইউরোপের বাহিরে ব্রিটিশ ও ফরাসী ঔপনিবেশিক স্বার্থ সর্বত্র পরস্পরের সহিত জড়িত। তৃতীয়ত, আছেন সমাজতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিস্টগণ যাঁহারা আদর্শগত কারণে সাধারণ মনোভাবের দিক হইতে জার্মান-বিরোধী ও ফরাসী সমর্থক।

এই বিভ্রান্তির মধ্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে অর্থাৎ ফ্রান্সকে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে তাহারা স্বার্থ ত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করিতেছে। ভ্যান্সিটার্টের যে কর্মনীতি এখন লর্ড হ্যালিফাক্স অনুসরণ করিতেছেন তাহার লক্ষ্য হইল জার্মানীকে একটি ইউরোপ মহাদেশীয় শক্তি রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা। এইজন্যই ব্রিটেন জার্মান পুনরস্ত্রসজ্জায় সম্মতি দিয়াছে, জার্মানীর সহিত ১৯৩৫-এর জুনমাসে নৌচুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে জার্মানীর রাইনল্যান্ড অধিকার উপেক্ষা করার পরামর্শ ফ্রান্সকে দিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যদিও

স্পেনীয় সরকারকে সাহায্য দানের স্পষ্ট অধিকার ফ্রান্সের আছে, তবু ব্রিটেন তাহাকে সে সাহায্যদানের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। যাঁহাদের কূটনৈতিক গোপন তথ্য জানার মতো অবস্থা আছে তাঁহারা অভিযোগ করেন যে ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর নাৎসী সরকারের সহিত আপস-রফা করার জন্য পোল্যান্ডকে উৎসাহিত করিয়াছিল। (পরবর্তী বৎসরে জার্মানী-পোল্যান্ড অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল)। ইহা বেলজিয়ামকেও ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিরপেক্ষতায় ফিরিয়া আসার জন্য এবং ফ্রান্সের উপদেশের বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়াকে ইটালী ও জার্মানীর সহিত বন্ধুত্ব করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। অধিকন্তু ইহা চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসী সমর্থক হেনলিন দলকে (Henlein Party) উৎসাহিত করিয়াছিল এবং ক্ষুদ্র আঁতাতের (চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া) ও বল্কান আঁতাতের (যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক) বন্ধন ছিন্ন করার জন্য কিংবা অন্ততপক্ষে শিথিল করার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। উল্লেখ থাকে যে এই আঁতাত দুইটি ফরাসী প্রভাবাধীন।

উল্লিখিত তথ্যগুলি হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা অসংগত হইবে না যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর অন্তত ইউরোপের ক্ষেত্রে গোপনে ফরাসী স্বার্থবিরোধী কাজ করিয়া চলিয়াছে এবং ইউরোপ মহাদেশে ফরাসী প্রভুত্ব হোয়াইটহলের পক্ষে সুখবর নয়। হয়তো এইজন্যই দক্ষিণপন্থী ফরাসী রাজনীতিকগণ ব্রিটেনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ব্রিটেনকে না জানাইয়া লাভাল ইটালী ও সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুত এক দিক হইতে বিচার করিলে লাভালের পররাষ্ট্রনীতিকে ব্রিটিশ-বিরোধী বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুদিনে দুর্দিনে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের একসঙ্গে থাকা উচিত ইহা বিশ্বাস করিয়া বামপন্থী ফরাসী রাজনীতিকগণ অন্ধভাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তরের নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন।

বর্তমানে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে আর ফ্রান্স ব্যস্ত আছে তাহার চাল ও কার্যাদির মোকাবিলা করায়। ব্রিটেনের বাহিরে নাৎসীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে বেলজিয়ামে। বেলজিয়ামে একটি নাৎসী সমর্থক দল (দি রেক্সিস্টস্) গঠিত হইয়াছে ও বেলজিয়ামে ফ্লেমিসভাষী জনগণের মধ্যে নাৎসী প্রচার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বেলজিয়ামের সরকার ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী ছিন্ন করিয়াছেন এবং মধ্য কিংবা পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ ঘটিলে ভবিষ্যতে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিবেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসীদের

ক্ষমতায় আসার পর হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত র‍্যাপোল্লোর চুক্তি কার্যত অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপারে জার্মানীর ক্ষতিপূরণের জন্য যেন নাৎসী সরকার পোল্যান্ডের সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। এই চুক্তি পোল্যান্ডে বহু অংশে ফরাসী প্রভাবের ক্ষতি করিয়াছে। গত বৎসর পোল্যান্ডে তাহার প্রভাব ফিরিয়া পাইবার জন্য ফ্রান্স বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছিল এবং উভয় পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদল দুইটি দেশের মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয় যে ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের মৈত্রী আর কখনো জীবন্ত শক্তি হইয়া উঠিবে না এবং ভবিষ্যতে পোল্যান্ড স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে অর্থাৎ ফ্রান্স-জার্মানী কিংবা রুশ-জার্মান বিরোধের ক্ষেত্রে পোল্যান্ড নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিবে।

উল্লিখিত কর্মাদি ছাড়াও জার্মানী এখন ক্ষুদ্র আঁতাত ও বল্কান আঁতাতের বন্ধন শিথিল করিয়া এবং স্পেনীয় ভূখণ্ডে দাঁড়াইবার স্থান সংগ্রহ করিয়া ফ্রান্সকে দুর্বল করিয়া তোলার চেষ্টায় ভীষণ রকমে ব্যস্ত। বর্তমানে কয়েকটি মৈত্রীচুক্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগের ফলে ফ্রান্সের অবস্থা রীতিমতো সুদৃঢ় এবং যতদিন এ অবস্থা থাকিবে ততদিন সে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। সে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিটভিনোভের মতো জোর দিয়া বলিতে থাকিবে যে শান্তি অবিভাজ্য এবং সমস্ত রাষ্ট্রকে সামূহিক নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের আওতায় একটি ইউরোপীয় চুক্তি থাকা উচিত। ইহাতে জার্মানী সম্মত নয় এবং সম্মত হইবে না।

ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিয়াছে। এই শেষোক্ত শক্তি দুইটির আবার নিজেদের মধ্যেও সামরিক চুক্তি আছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক কোনো বিপদের সময় এই তিনটি শক্তিকে সর্বদা একত্রিত দেখা যাইবে। ক্ষুদ্র আঁতাতের অন্যান্য শক্তি যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সহিত চেকোস্লোভাকিয়ার বোঝাপড়া আছে। আবার বল্কান আঁতাতের মাধ্যমে যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়ার বোঝাপড়া আছে গ্রীস ও তুরস্কের সহিত। জার্মানী আশা করে যে সে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়াকে দলে টানিয়া মধ্য ইউরোপে চেকোস্লোভাকিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিবে—কেননা চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ সাহায্য কেবলমাত্র রুমানিয়া কিংবা পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া আসা সম্ভব। অনাক্রমণ চুক্তির ফলে পোল্যান্ড এখন আর জার্মানীর কাছে কোনো সমস্যা নয়। ব্রিটেনের মাধ্যমে সে ফ্রান্সকে বোঝানোর চেষ্টা করিতেছে

যে সময় শক্তি হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার মূল্য নাই এবং ফ্রান্স-সোভিয়েট চুক্তির সামরিক ধারাগুলিকে ফ্রান্সের বিদায় দেওয়া উচিত।

রাশিয়ায় আট জন সামরিক জেনারেলের সাম্প্রতিক মৃত্যুদণ্ড ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে প্রচারের একটা সুযোগ দিয়াছে এবং তাহারা এই মর্মে ভীষণ প্রচারকার্য চালাইতেছে যে সোভিয়েট সামরিক যন্ত্রে শৃঙ্খলাহীনতার আধিক্য হইয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ইহার উপর আর নির্ভর করা চলে না। সর্বাপেক্ষা শেষে হইলেও যাহা নগণ্য নয় তাহা হইল এই যে যুদ্ধ হইলে সে যাহাতে ফ্রান্সকে পিছন দিক হইতে ছুরি মারিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জার্মানী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে স্পেনীয় ভূখণ্ডে পা রাখিবার মতো জায়গা পাইতে। ইহা সম্ভব হইলে ইউরোপে যুদ্ধের সময় যে উত্তর আফ্রিকা হইতে ফ্রান্স সর্বদা তাহার সৈন্য ও সমরোপকরণের বিরাট সরবরাহ পাইয়া থাকে তাহার সহিত ফ্রান্সের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে। জার্মানী আশা করে যে ফ্রান্সকে সকল দিক হইতে দুর্বল করিয়া তুলিয়া এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মারফত তাহার উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া সে শেষ পর্যন্ত তাহাকে পশ্চিমী চুক্তিতে রাজি করাইতে পারিবে। তাহা হইলে জার্মানী মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যাহা খুশি করিতে পারিবে। ফ্রান্স যদি ইহাতে রাজি না হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে যদি সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে সে ১৯১৪ সালের তুলনায় নিজেকে অনেক বেশি দুর্বল দেখিতে পাইবে।

কিন্তু ফ্রান্স কি জার্মানীর পরিকল্পনা অনুসারে চলিবে? স্পষ্টতই না। ব্রিটেনের কাছে ইউরোপ মহাদেশে কে প্রভুত্ব করিবে— ফ্রান্স কিংবা জার্মানী— তাহাতে কিছু যায় আসে না, কেননা ব্রিটেনের স্বার্থ ইউরোপের বাহিরে। কিন্তু ফ্রান্স এত সহজে ইউরোপের প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে পারে না, কারণ তাহার অবস্থা ব্রিটেনের মতো নয়; সে নিজে ঔপনিবেশিক শক্তি ছাড়াও মহাদেশীয় একটি শক্তি। অধিকন্তু, ফ্রান্স শুধু শক্তি ও মর্যাদার জন্য লড়িতেছে না, সে লড়িতেছে তাহার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য। সে ১৮৭০ সালের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভোলে নাই। তাহার জনসংখ্যা স্থিতিশীল এবং ইহা জার্মানীর জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। জার্মানীর জনসংখ্যা এখনো বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং ফ্রান্সের জার্মান আক্রমণ সম্বন্ধে প্রকৃত ভয় আছে আর সেখানে ব্রিটেনের সে ভয় নাই— অন্তত যতদিন অ্যাংলো-জার্মান নৌচুক্তি অনুসারে জার্মান নৌবাহিনী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। সর্বোপরি ফ্রান্সে জনমানসে আছে জার্মান লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা

সম্বন্ধে গভীর অবিশ্বাস। হিটলারের বই 'মেইন ক্যাম্প'-এ ফ্রান্সের ভয়ানক নিন্দা থাকায় ইহা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। একজন লেখক সংক্ষেপে এ অবস্থা যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইল এইরূপ : ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থীরা জার্মানীকে ঘৃণা করেন, বামপন্থীরা ঘৃণা করেন হিটলারকে। এইরূপ অবস্থায় যতদিন ভীষণ রকমে জাতীয়তাবাদী নাৎসী দল ক্ষমতায় থাকে ততদিন ফ্রান্স কখনো মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে তাহার মিত্রদের ও মৈত্রীবন্ধনগুলি ত্যাগ করিবে কিনা— খুবই সন্দেহের বিষয়।

স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ ঝুলিয়া রহিয়াছে এবং জার্মান কূটনীতি সেখানে সফল হইবে কিনা তাহা বলার সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ইহা যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। রুমানিয়ায় রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলী মোটামুটি জার্মান সমর্থক এবং ফরাসী প্রেমিক ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিটুলেস্কুর প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। সেখানে সরকারের সমর্থনে রহিয়াছে কড্রেনুর নেতৃত্বাধীন ইহুদি-বিরোধী ও নাৎসীদলের সমর্থক আয়রন গার্ড দল। যুগোস্লাভিয়ায় প্রধান মন্ত্রী স্টয়াডিনোভিচ ও তাঁহার সরকার নাৎসী সমর্থক আর রাজপরিবার ব্রিটিশ প্রভাবাধীন। গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাস্, যিনি নিজেকে এক-নায়ক করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে জার্মান প্রভাবাধীন। আর গ্রীস, জার্মানীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষ্ণসাগরস্থিত রুশ নৌবহর যদি দার্দানেলেস দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে তাহা হইলে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটি হইতে তাহার উপর আক্রমণ চালানো যাইবে। ইহার পরে আছে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া। ইহারা 'সর্বহারা' দলভুক্ত শক্তি বলিয়া যদি বোঝে যে তাহাদের জাতীয় অভিযোগগুলির প্রতিকারের কোনো সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে প্রত্যাশা করা যায় যে তাহারা জার্মানীর সহিত যোগ দিবে। এইভাবে দেখা যায় যে সমগ্র বল্কান উপদ্বীপ এলাকায় জার্মানী কূটনীতিতে ফ্রান্সকে পিছনে ফেলিয়াছে এবং সে যত্র তত্র বাণিজ্যিক টোপও ফেলিতেছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। ফ্রান্স সর্বত্র জার্মানীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কতদিন গ্রীসে মেটাক্সাস সরকার কিংবা যুগোস্লাভিয়া স্টয়াডিনোভিচ সরকার টিঁকিয়া থাকিবেন সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। রুমানিয়ায় ফরাসী সমর্থকদল আপাতত ক্ষমতাচ্যুত হইলেও নগণ্য নয় এবং বল্কান মেজাজ কিংবদন্তী অনুসারে পরিবর্তনশীল। অধিকন্তু জার্মানীর অন্য দিকে দাঁড়াইয়া আছেন আধুনিক ইউরোপের একজন

শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট এডোয়ার্ড বেনেস। প্রতিদিন দৃশ্যের পরিবর্তন হইতেছে এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী আর যাহাই হউক সহজ নয়। একটা বিষয় নিশ্চিত। যদি যুদ্ধ আসে তবে তাহা আসিবে মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপের স্থিতাবস্থাকে জার্মানী কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করার ফলে। কিন্তু যুদ্ধ কি আসিবে? উত্তর প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে ব্রিটেনের উপর। জার্মানী ১৯১৪ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবে না এবং যদি সে জানে যে ব্রিটেন তাহার বিরুদ্ধে যাইবে তবে সে যুদ্ধ বাধাইবে না। ১৯১৪ সালে যেরূপ হইয়াছিল সেরূপ অবশ্য হইতে পারে— ব্রিটেন যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবে এই চিন্তা করিয়া সে যুদ্ধের ফাঁদে পা দিতে পারে। যদি ফ্রান্স এবং ব্রিটেন মধ্য কিংবা পূর্ব-ইউরোপের বিরোধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজি হয় তাহা হইলে যে মুহূর্তে জার্মানী প্রস্তুত হইবে সেই মুহূর্তে পূর্বদিকে সূর্যোদয় যেমন নিশ্চিত তেমনই নিশ্চিত-রূপে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবে। এমন-কি, ফ্রান্স যদি সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ নেয় এবং ব্রিটেন যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহা হইলেও যুদ্ধ বাধিতে পারে যদিও সে যুদ্ধের ফলাফল হইবে অনিশ্চিত।

ফ্রাংকো যদি জয়ী হন তবে সে বিজয় হইবে ইটালীর ও জার্মানীর এবং তাহার অর্থ হইবে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসান ও ফ্রান্সের পক্ষে সম্মুখ-বর্তী অন্ধকার সময়। কিন্তু রুশ দানব প্রায়শই বাধা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ইউরোপ বিজয়ী নেপোলিয়নকে ব্যর্থ করিয়াছিল। ইহা কি হিটলারকেও ব্যর্থ করিবে?

ডালহৌসি, ২১ আগস্ট ১৯৩৮

দূর প্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা

প্রায়ই আমরা দৈনিক পত্রিকা খুলিয়া চীন এবং জাপানের মধ্যে সংঘর্ষের সংবাদ পড়িতে পাই। অনেকে সে-সব স্তম্ভকে বাদ দিয়া যান এই ভাবিয়া যে অতদূরে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে ভারতে আমাদের আগ্রহান্বিত হইবার মতো কিছু নাই। অন্যেরা নিয়ম মাফিক সে-সব সংবাদ পড়িয়া থাকেন। কিন্তু যে-সব ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয় সেগুলির তাৎপর্য কত কম-সংখ্যক ব্যক্তি বোঝেন কে জানে।

যে-সব দ্বীপ জাপানীদের স্বদেশ সেগুলিতে লোকসংখ্যা অত্যধিক। সেগুলিকে ৭ কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং তাহার ফলে অত্যধিক জনাকীর্ণতা এবং জমির উপর খুব বেশি চাপ সৃষ্টি হইয়াছে। জাপানীদের প্রজননশীলতা খুব বেশি এবং লাফে লাফে তাহাদের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। চীনে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ১০০ জন আর জাপানে ইহা ৩১৩ জন। অধিকন্তু জাপানের জন্মহার ব্রিটেনের তুলনায় দ্বিগুণ। সেইজন্য জাপান তাহার সন্তান-সন্ততিদের বসবাসের জন্য আরো স্থান চায়— ক্রমবর্ধমান শিল্পগুলির জন্য চায় আরো বেশি কাঁচামাল এবং উৎপন্ন পণ্যের জন্য চায় আরো বেশি বাজার। কেহ তাহাকে এই তিনটি জিনিস উপহার দিবে না— তাই এই বলপ্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে জাপানের অপর একটি মাত্র সমাধান হইল জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যা সীমিত করা এবং নিজের সামর্থ্যানুসারে বাঁচিয়া থাকা কিন্তু স্পষ্টতর সে সমাধানের আবেদন তাহার কাছে নাই। সংক্ষেপে ইহাই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের কারণ।

জাপানী সম্প্রসারণ একমাত্র ঘটিতে পারে চীন, রুশ ব্রিটিশ ও মার্কিন বিরোধিতার পটভূমিকায়। সে যদি এসিয়ার মূল ভূখণ্ডে আত্মসম্প্রসারণ করিতে চায় তাহা হইলে সে চীন কিংবা রাশিয়ার ক্রোধের সঞ্চার করিবে। সে যদি দক্ষিণে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কিংবা অস্ট্রেলিয়ার দিকে আত্মসম্প্রসারণ করে তবে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সংঘর্ষে আসিবে। যতটা বিচার করিয়া দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে সে প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। আর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 'জাপান মাস্ট ফাইট ইংল্যান্ড' নামক গ্রন্থে লেঃ কম্যান্ডার ইসিমারুর আবেদন সত্ত্বেও। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে জাপানের উচিত চীন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি সমাবেশ করা। এসিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপান

যে ভূমির উপরই নজর দিবে তাহা হয় রাশিয়ার নতুবা চীনের। রাশিয়াকে আক্রমণ করা জাপানের মূঢ়তা হইবে কেননা সোভিয়েট শাসনে রাশিয়া পুরাপুরি পুনঃ-জাগ্রত। ইহা ছাড়া তাহার ইউরোপে ও দূর প্রাচ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর সামরিক যন্ত্র রহিয়াছে।

সুতরাং একমাত্র যে বিকল্প জাপানের থাকে তাহা হইল চীনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিয়া নিজের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা। কিন্তু যদিও সে চীনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে পারে তবু সে সম্প্রসারণের পক্ষে তীব্র রুশ বাধা আসিবে। তাহার কারণ নীচে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইবে। আর এ-ব্যাপারে ব্রিটেন যতটা সংশ্লিষ্ট তাহাতে সে এসিয়া মহাদেশে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি যতই অপছন্দ করুক সে এই উৎপাত সহ্য করিবে, কারণ সে ইহা ভালোভাবে জানে যে ইহার একমাত্র বিকল্প হইল জাপানের দক্ষিণ দিকে সম্প্র-সারণ এবং তাহার ফলে জাপানের সহিত তাহার সরাসরি সংঘাত। আর বর্তমান অবস্থায় দূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবে না। এসিয়ার একটি দেশ বলিয়া ও একটি বিরাট মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থিত বলিয়া ইহা স্বাভাবিক যে জাপান তাহার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রথমে এসিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে তাকাইবে। সেখানে সে দেখিতে পায় একটি বিশাল দেশ— ভূতপূর্ব স্বর্গীয় সাম্রাজ্য এবং এখন চীন প্রজাতন্ত্র— কুপরিচালিত ও ঐক্যবিহীন এবং তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশি যে তাহার নিজের পক্ষে সেগুলির উন্নয়ন সম্ভব নয়। চীনের বিশালত্ব, সমৃদ্ধি ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা জাপানের পক্ষে সর্বাধিক প্রলুব্ধির কারণ।

এই দুইটি এসীয় দেশের বিরোধ চল্লিশ বৎসরেরও বেশি কাল স্থায়ী। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেই সময় জাপান তাহার রাষ্ট্র-যন্ত্রকে আধুনিক পদ্ধতির সহায়তায় আধুনিক করিয়া তুলিয়াছিল এবং যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাহার ছিল। সে দেখিতে পাইয়াছিল যে সকল বড়ো ইউরোপীয় শক্তি চীনকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার বিনিময়ে নিজেদের ধনী করিয়া তুলিতেছিল। তাহা হইলে যে জাপান তাহার পার্শ্ববর্তী একটি এসীয় শক্তি, সে কেন একই কাজ করিবে না এবং প্রাচ্যের সম্পদ শোষণ হইতে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে দূরে সরাইয়া রাখিবে না? ইহাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি এবং ইহা সম্বল করিয়াই জাপান তাহার সম্প্রসারণের দৌড় শুরু করিয়াছিল।

বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে জাপান চীন সরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করার একটি সুযোগও ছাড়িয়া দেয় নাই এবং এই সময়-সীমার মধ্যে সে ধীরে ধীরে অথচ স্থিরভাবে পশ্চিমী শোষণকারী শক্তিগুলির প্রভাব ক্ষয় করিয়া চলিয়াছে। তাহার সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী। ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে সে জারের সাম্রাজ্যকে বাধা দিতে পারিয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় সে চীনের, মানচিত্র হইতে জার্মানীকে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবিলা করিতে পারে নাই। আর ইত্যবসরে যে রাশিয়া একবার পরাজিত হইয়াছিল সে সোভিয়েট রাষ্ট্র হিসাবে দৃশ্যপটে ফিরিয়া আসিয়াছে নূতন অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এবং বিশেষভাবে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া।

চীনের বিচ্ছিন্নকরণ শুরু হইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং হংকং, সাংহাই প্রভৃতি 'চুক্তিবদ্ধ বন্দর' পাইয়াছিল এবং ইহার অর্থ ছিল কার্যত চীনা ভূখণ্ড দখল। গত শতাব্দী শেষ হইবার মুখে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হইয়াছিল জাপান এবং চীনের সঙ্গে তাহার আচরণে পশ্চিমী কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।

চীনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফরমোসা দ্বীপটি জাপান ১৯০৪-০৫ সালের যুদ্ধে দখল করিয়াছিল। প্রায় একই সময়ে জাপান কোয়াংটুং রেলওয়ে এবং মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া চলাচলকারী চৈনিক পূর্ব রেলওয়ের দক্ষিণাংশ নিজের দখলে লইয়াছিল এবং এইভাবে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াকে জাপানী প্রভাব-বৃত্তের মধ্যে আনিয়াছিল। চীনের ভূতপূর্ব ভূখণ্ড কোরিয়াকে জাপান নিজের সহিত খোলাখুলিভাবে সংযুক্ত করিয়াছিল ১৯১০ সালে এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ১৮৯৪ সালে জাপান যখন চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তখন সে কোরিয়াকে স্বাধীন করিবার কথা বলিয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং অবিলম্বে সানটুং উপদ্বীপে সিংটাও ও অন্যান্য জার্মান-অধিকৃত ভূখণ্ড দখল করিয়া লইয়াছিল। ১৯১৫ সালে যখন সে দেখিয়াছিল যে সমস্ত পশ্চিমী শক্তি যুদ্ধে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া আছে তখন জাপান চীনের কাছে ২১টি দাবি পেশ করিয়া কয়েকটি সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিল। যুদ্ধের পর জাপান লুটের ভাগ হিসাবে ভূতপূর্ব-জার্মান-অধিকৃত প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শাসন কর্তৃত্ব পাইয়াছিল। এই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্রপথে সরাসরি যাতায়াতের পথে বলিয়া ইহার সামরিক গুরুত্ব অনেকখানি।

তাহার পর কিছুকালের জন্য জাপানী সম্প্রসারণে মন্দা দেখা দিয়াছিল কেননা যাহা সে দখল করিয়াছিল তাহার সমন্বয় সাধনের জন্য তাহার সময়ের প্রয়োজন ছিল। সম্প্রসারণ কার্যের পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল ১৯৩১ সালে যখন জাপান মাঞ্চুকুও (মাঞ্চুরিয়া) দখল করিয়াছিল। ১৮৯৫ সালে কোরিয়াকে যেমন স্বাধীন রাষ্ট্র করা হইয়াছিল সেইভাবে এই সময় ভূতপূর্ব চীনা ভূখণ্ড মাঞ্চুকুওকেও নামে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল। বর্তমানের সম্প্রসারণমূলক অভিযান ১৯৩১ সাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ইহার মূলে আছে বর্তমানে বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত ১৯২৮-এর তানাকা স্মারকলিপি। ইহাতে এসিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানের ভাবী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আমাদের এই গ্রহে নিজের জন্য স্থান সংগ্রহে জাপানের সংকল্প অনড়। বাহিরের ঘটনাবলী এই উদ্ধত অভিযান বন্ধ করিতে পারিবে না— সর্বাধিক যাহা করিতে পারে তাহা হইল ইহার পথ নির্ণয় ও সম্প্রসারণের দ্রুতত। নির্ণয়।

জাপানের আভ্যন্তরীণ এই নীতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ১৯৩১ সাল হইতে জাপানের সামরিক আগ্রাসী নীতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিবে। যখন তাহার জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে তখন তাহার নূতন ভূখণ্ডের প্রয়োজন সহজে বোঝা যায় এবং তাহার বর্তমান ভূখণ্ড বর্তমান জনসংখ্যার পক্ষে অত্যধিক ছোটো। তাহার শিল্পব্যবস্থার দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে তুলা, পশম, কাগজের জন্য মণ্ড লোহা, তৈল প্রভৃতি সব কাঁচামাল জাপানকে বহু দূর হইতে আমদানি করিতে হয়। তাহার ভূখণ্ডের প্রয়োজনের মতো শিল্পব্যবস্থায় সম্প্রসারণও তাহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। সুতরাং তাহার বিরাট জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য জাপানের প্রয়োজন নির্বিঘ্ন ও নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ। শিল্প সম্প্রসারণের জন্য আবার প্রয়োজন হয় নূতন নূতন বাজারের।

এখন এত সব প্রয়োজন কিভাবে মিটানো সম্ভব? চীন কি স্ব-ইচ্ছায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য জাপানকে নিজের ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিবে? সে কি কাঁচামালে তাহার বিশাল সম্পদ এবং তাহার ব্যাপক বাজার জাপানকে কাজে লাগাইতে দিবে? নিশ্চয়ই না। জাতীয় সম্মান এবং আত্মস্বার্থ উভয়ই বাধা

হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া, ইউরোপীয় শক্তিগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় জাপানকে চীনের সম্পদ ও বাজারের একচেটিয়া অধিকার ছাড়িয়া দিবে না। তাহারা শেষ পর্যন্ত চীনের ব্যাপারে 'মুক্ত দ্বার' নীতির দাবিতে অটল থাকিবে কারণ ইহা সকল শক্তিকে চীনের লুট ভোগ করার সুযোগ দেয়। কাজেই জাপানকে জোর করিয়া চীনের ভূখণ্ড দখল করিতে হয়। সে পর্যায়ক্রমে ইহা করিয়া চলিয়াছে, একবার এক কামড় দেয় এবং তাহা হজম করার জন্য সময় নেয়। প্রতিটি আক্রমণের আগে কোনো-না-কোনো সীমান্ত সংঘর্ষ হয় এবং জাপানী আগ্রাসনের ছুতো হিসাবে এই সীমান্ত সংঘর্ষগুলিকে সযত্নে তৈয়ারি করা হইযা থাকে। কৌশল সেই একই— তাহা সেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হউক, কিংবা আবিসিনিয়ার ওয়াল ওয়াল হউক কিংবা দূর প্রাচ্যে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তই হউক।

দূর প্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন ও দাবি মিটিতে পারে একমাত্র যদি সে শ্বেতাংগ জাতিগুলিকে বাদ দিয়া এবং কার্যত 'মুক্তদ্বার' নীতি বাতিল করিয়া চীনের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করিতে পারে। বারে বারে তাহার রাজনীতিকগণ বহুভাবে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, জাপানের মুখপাত্রগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে দূর প্রাচ্যে তাহার বিশেষ স্বার্থ আছে যেগুলির সংগে অন্য কোনো পশ্চিমী শক্তির স্বার্থের তুলনা হয় না অর্থাৎ দূর প্রাচ্যে তদারকি করা, ও সে অঞ্চলে শান্তি রক্ষার যে ব্রত জাপানের আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও জাপানীরা একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত এবং তাহারা অপরাজিত জাতি এই সচেতনতা তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়। প্রসংগত বিদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা জাপানী সমাজের ফাসিস্টপন্থীদের প্রভুত্ব বিস্তারে সফল করে।

চীন যদি কোনো প্রকারে জাপানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা মানিয়া লয়, তাহা হইলে অবিলম্বে চীন-জাপান বিরোধের অবসান হইতে পারে। জাপানের অগ্রণী কূটনীতিবিদ হিরোটা গত তিন বৎসর ধরিয়া এই প্রয়াসই করিয়া চলিয়াছেন। চীন-জাপান সহযোগিতার অবিচ্ছিন্ন আবেদন সহ তাঁহার বক্তৃতাগুলি ভাসা ভাসা ভাবে সবিশেষ সৌহার্দ্যসূচক। এখন প্রশ্ন হইল এই সহযোগিতার লক্ষ্য কি? স্পষ্টতই জাপানের সমৃদ্ধি এবং চীনের কার্যকর দাসত্ব। কিন্তু এই নগ্ন সত্য তো আর চীৎকার করিয়া বলা যায় না— তাই ধ্বনি ওঠে "কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা"। এই ধ্বনিতে শুধু জাপানী উদ্দেশ্যই চাপা থাকে না, ইহা জাপান, চীন কিংবা অন্যত্র সকল সমাজ-

তন্ত্রবিরোধী শক্তিকে খুশিও করে। এইভাবে ১৯৩৭-এর ৭ আগস্টে ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে হিরোটার পররাষ্ট্রনীতির নিম্নোক্তরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—

"চীনের কাছে জাপানের অনুরোধগুলির মধ্যে একটি বড়ো দফা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা। জাপানী প্রতিনিধি পরিষদে এই কথা ঘোষণা করিয়া এম. হিরোটা বলেন যে যদি চীনের বিপ্লবপন্থীদের, বিশেষ করিয়া কম্যুনিস্টদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস চীন-জাপান সহযোগিতা সম্ভব হইয়া উঠিবে। তিনি এ কথাও বলেন যে জাপানী সরকার অকুস্থলে উত্তর চীনের ঘটনার মীমাংসা করিতে এবং একই সঙ্গে চীন-জাপান সম্পর্কের মৌলিক পুনর্বিন্যাস করিতে চান।"

আর কয়েকবৎসর আগে হিরোটা প্রথম জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইবার পর হইতে একই ধরনের বিবৃতি একই ধরনের ভাষায় বার বার প্রচারিত হইয়াছে।

ইহাতে যদি শান্তি আসেও তাহা হইলে কি চীন এই দাবি মানিয়া লইতে পারে? আমার নিজের অভিমত এই যে নানকিং কেন্দ্রীয় সরকারের একনায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেক একা হইলে ইহা হয়তো মানিয়া লইতেন। অন্তরে অন্তরে তিনি ভীষণভাবে কম্যুনিস্ট-বিরোধী এবং ১৯২৭ সালে কুওমিনটাঙে (চীনের জাতীয়তাবাদী দল) ভাঙনের পর হইতে তাঁহার একাধিপত্য স্থাপনের পর তিনি চীনা কম্যুনিস্ট ও তাঁহাদের সহযোগীদের উৎখাত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু মার্শাল চিয়াং দুইটি মহল হইতে অবিরাম বাধার সম্মুখীন হইয়াছেন। চৈনিক সোভিয়েট রাষ্ট্র নামে অভিহিত চীনের পশ্চিমদিকের প্রদেশগুলি কার্যত নানকিং-এর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকায় জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিয়াছে এবং এ বিষয়ে তাহারা চীনের জনগণের অনুভূতির খাঁটি প্রতিধ্বনি করিয়াছে মাত্র। দ্বিতীয়ত চীনে বিশাল স্বার্থ-সমন্বিত এবং প্রাচ্যের জাতিগুলির কাছে নিজেদের মর্যাদা রক্ষায় আগ্রহী পশ্চিমী শক্তিগুলি লাটিন আমেরিকায় (মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা) তাহাদের বৈদেশিক লগ্নী বিপন্ন করিয়া তুলিতে সহজে নিজেদের প্ররোচিত করিতে পারে না। চীনে ব্রিটিশ লগ্নী সম্বন্ধে ১৯৩৭-এর ১৯ আগস্ট তারিখের 'লন্ডন টাইমস' পত্রিকার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি আলোকসম্পাতকারী—

"চীনে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ স্বার্থের মূল্য প্রায় ২৫ কোটি পাউন্ড এবং ইহার মধ্যে আছে ব্যবসায়ে লগ্নী করা ২০ কোটি পাউন্ড ও সরকারী দায়ে আবদ্ধ ৫ কোটি পাউন্ড। মোট অর্থের প্রায় ১৮ কোটি পাউন্ড নিয়োজিত আছে সাংহাইতে এবং

এই ১৮ কোটি পাউন্ডের একটা বড়ো অংশ সুচো ক্রীকের উত্তরে সেটেলমেন্ট জেলায় নিয়োজিত আছে। এই জেলার উপরেই এখন সর্বাপেক্ষা বেশি গোলাগুলি ও বোমাবর্ষণ হইতেছে। এইখানেই অধিকাংশ জনকল্যাণমূলক কার্যালয় ও কারখানা এবং বড়ো ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি রহিয়াছে।"

'টাইমস' পত্রিকার লেখক হতাশার সংগে ইহাও বলিয়াছেন যে পূর্বে যেখানে এই জেলায় ব্রিটিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টদের অধীনে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা ছিল এখন সেখানে থানাগুলি শূন্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেগুলি জাপানীরা দখল করিয়াছে। অতএব শ্বেতজাতিরা এ বিষয়ে সচেতন যে চীনে জাপানী প্রভুত্বের অর্থ শুধু চীনেরই দাসত্ব নয়, দূর প্রাচ্য হইতেও তাহাদের বহিষ্কার।

যেহেতু একটা দেশের ভূগোল অনেক সময় সামরিক কৌশল নির্ণয় করে, সেইজন্য চীনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

চীনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল তাহার প্রধান তিনটি নদী— উত্তরে হোয়াং হো (পীত নদী), মধ্যভাগে ইয়াংসি এবং দক্ষিণে সি-কিয়াং। সি-কিয়াং-এ প্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণ করে ব্রিটিশ বন্দর হংকং ইয়াং-সির প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ করে সাংহাই এবং ইহাও ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রাধান্য সহ যুক্তভাবে বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হোয়াং-হোর প্রবেশপথে প্রভুত্ব জাপানী-দের এবং ইহারা প্রথমে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল কোরিয়ায় ও বর্তমানে মাঞ্চুরিয়ায়ও (মাঞ্চুকুও) ঘাঁটি গাড়িয়াছে। চীনে প্রবেশের একটি মাত্র কার্যকর স্থলপথ আসিয়াছে উত্তর হইতে। এই পথ দিয়া মোংগল ও মাঞ্চুরা খাস চীনে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে রাশিয়া ও জাপান উভয়েরই দৃষ্টি ছিল এই পথটির উপর। ১৯৩১ সাল হইতে জাপান এই পথটি ও ইহার সন্নিহিত এলাকা দখল করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে এবং ১৯৩৭-এর জুলাই হইতে এই অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে উচ্চ পর্বতশ্রেণী খাস চীনকে প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমাঞ্চল (অর্থাৎ সিংকিয়াং বা চীনা তুর্কীস্তান) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে খাস চীনে স্থলপথটি উত্তর হইতে আসিয়াছে এবং আমরা দেখিতে পাই যে ঐতিহাসিক দিক হইতে যে শক্তি মাঞ্চুরিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে সেই শক্তি সর্বদা চীনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছে।

১৯৩১ সাল হইতে দূর প্রাচ্যে যে-সব ঘটনা ঘটিতেছে সেগুলি মোটামুটি বুঝিতে হইলে সামগ্রিকভাবে জাপানী সমর-কৌশল বোঝা প্রয়োজন। শান্তিপূর্ণ

অনুপ্রবেশের মাধ্যমে চীনে জাপানী প্রভুত্ব স্থাপন সম্ভব ছিল না বলিয়া জাপান চীনে সামরিক বিজয়ের কিংবা অন্তত তাহার উপর সামরিক চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জাপানী সমর-কৌশলকে দুই পথে কাজ করিতে হইয়াছিল : প্রথমত চীনের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়ত চীনের সাহায্যে অন্য কোনো শক্তির অগ্রসর হইয়া আসা অসম্ভব করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইত যদি জাপান মাঞ্চুকুও, মোঙ্গলিয়া ও খাস উত্তর চীন সহ প্রজাতন্ত্রের সমগ্র উত্তরাঞ্চল দখল করিতে পারিত। এই ভূমিখন্ডগুলি একযোগে রুশ সাইবেরিয়া হইতে খাস চীনকে (হোয়াং-হো, ইয়াংসি ও সি-কিয়াং নদীর উপত্যকাগুলি) বিচ্ছিন্ন করে। মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জাপান এই এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সময় সে বহির্মোঙ্গলিয়ার মধ্য দিয়া অনুপ্রবেশ করিয়া বৈকাল হ্রদে ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। আর রাশিয়াকে যদি কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে বিপদের সময় চীনের সাহায্যে আর কোনো শক্তি আসিতে পারিবে না। ১৯৩১ সালের পর হইতে জাপান কিভাবে এই অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে আমরা অতঃপর তাহা দেখিতে পাইব।

প্রথমে ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে জাপান একই সঙ্গে কখনো তাহার হাতের তাসগুলি টেবিলে ফেলে না এবং সে সতর্কভাবে আগ্রাসন নীতি লইয়া অগ্রসর হয় যাহাতে [illegible] অন্য কোনো শক্তি আবার তাহাকে আক্রমণ না করিয়া বসে। ইহা ছাড়া চীনা-ভূমি দখলের জন্য সে সর্বদাই কোনো-না-কোনো 'ঘটনা' ঘটাইবার ধুয়া তোলে। প্রথম 'ঘটনা'র সূত্রপাত করিয়াছিলেন জাপানের রাজকীয় বাহিনীর লেফটেনান্ট কাওয়ামোতো ১৯৩১ এর ১৮ সেপ্টেম্বর যখন তিনি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইহার ফলে পরদিন মুকডেন দখল করা হইয়াছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে দখল করা হইয়াছিল সমগ্র মাঞ্চুরিয়া। সেই সময় সমগ্র দুনিয়া একটা ভীষণ অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়া চলিতেছিল এবং রাশিয়া দ্রুততার সঙ্গে তাহার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং জাপান নিশ্চিত ছিল যে তাহার আক্রমণাত্মক চালে কোনো কার্যকর বাধা আসিবে না। জাতি-সংঘ কর্তৃক প্রেরিত লিটন কমিশন জাপানের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল সংঘের সাধারণ পরিষদে নিন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু জাপান সংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ইহার পরে ১৯৩৩

সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন মাঞ্চুকুওর কাছে চীনা পূর্ব রেলওয়ে বিক্রয় করিয়াছিল এবং ১৯৩৪ সালে রুশ-মাঞ্চুকুও জলপথ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। মাঞ্চুকুও যদিও অন্যান্য শক্তির নিকট হইতে আইনগত স্বীকৃতি পায় নাই, তবু তাহাদের অধিকাংশ কার্যত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রভূত সুযোগ সহ মাঞ্চুকুও একটি বিশাল ভূখণ্ড এবং ইহার আবহাওয়া তীব্র হইলেও কয়লা সহ কতকগুলি কাঁচামালে ইহা সমৃদ্ধ। অধিকন্তু কখনো সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ হইলে জাপানের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে ইহা সবিশেষ উপযোগী। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে মাঞ্চুকুওর উন্নয়নে জাপানের অনেক বৎসর লাগিবে এবং ইত্যবসরে দূর প্রাচ্যে শান্তি বজায় থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। অর্থনীতি ও সমর-কৌশল উভয় কারণেই মাঞ্চুকুও একা টিকিতে পারে না। জাপান যে-সব কাঁচামাল চায় তাহার একাংশ মাত্র সেখানে পাওয়া যায় এবং মাঞ্চুকুওর বাজার জাপানের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো নয়। অধিকন্তু চতুর্দিকে বিরোধী ভূমিবেষ্টিত হওয়ায় সমরকৌশলের দিক হইতে মাঞ্চুকুও অত্যন্ত দুর্বল সুতরাং তাহার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এবং নূতন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাপানকে তাহার আগ্রাসন-কার্য অব্যাহত রাখিতে হইয়াছিল।

১৯৩২ সালে সাংহাইতে আর-একটি ঘটনা সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং চীন ও জাপানের মধ্যে সাংহাই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে চীন সাংহাই-এর নিকটস্থ কিছু এলাকায় নিরস্ত্রীকরণ করিতে এবং অপর কয়েকটি জাপানী শর্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। সাংহাই-এর সামরিক গুরুত্ব ১৯৩২ সালে তত স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ (১৯৩৭) ইহার গুরুত্ব সুপরিস্ফুট করিয়াছে।

১৯৩৩ সালের মধ্যে পুতুল সম্রাট পু ই-র অধীনে মাঞ্চুকুওর সংহতি সাধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং জাপান তাহার সীমান্ত আরো সম্প্রসারিত করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উত্তর চীনে মাঞ্চুকুও সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধ হইয়াছিল। জাপানী সৈন্যদল জেহল ও চাহারের একাংশ দখল করিয়াছিল এবং পিকিং-এর (বর্তমানে পাইপিং নামে পরিচিত) প্রবেশদ্বার পর্যন্ত গিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চীনাদের অবশ্যম্ভাবী ফল মানিয়া লইতে হইয়াছিল এবং নিজেদের ভূখণ্ডের আরো একাংশ জাপান-কর্তৃক দখলের দৃশ্য দেখিতে হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে ট্যাংকু সন্ধিতে (Tangku Truce) যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালে তুলনামূলকভাবে বিশেষ কিছু না ঘটিলেও ১৯৩৫ সালে আবার বিরোধ বাধিয়াছিল। জাপানের ক্ষেত্রে সর্বদাই যাহা ঘটে এবারও নূতন আক্রমণের পূর্বে এক দফা আপসমূলক বক্তৃতা ও পররাষ্ট্রনীতিতে মৃদুতার অভিনয় করা হইয়াছিল। ১৯৩৫-এর ২৩ জানুয়ারি হিরোটা একটি ভাষণে অনাক্রমণ নীতির কথা এবং চীনের সহিত বন্ধুত্ব করার উদ্দেশ্যে "সৎ প্রতিবেশী"-সুলভ নীতি অবলম্বনের কথা বলেন। এবার জাপানীরা যে ধ্বনি তুলিয়াছিল তাহা হইল স্বায়ত্ত-শাসিত উত্তর চীনের (স্বায়ত্ত-শাসিত মাঞ্চুকুওর মতো) এবং নানকিং-এর (চীনের নূতন রাজধানী) কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হইয়াছিল তাঁহারা যেন উত্তর চীনে জাপানের কার্যকলাপে ও আপস-আলোচনায় হস্তক্ষেপ না করেন। কিন্তু নানকিং জাপানকে পুরোপুরি বাধিত করিতে পারে নাই এবং উত্তর চীনের জনগণও ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরীয়দের মতো অন্ধ হইয়া জাপানী ফাঁদে পা দেয় নাই। ফলে জাপানী পরিকল্পনা সফল হয় নাই। তৎসত্ত্বেও বিরোধ যখন শেষ পর্যন্ত মিটিয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল যে চীনকে কার্যত নিজের ভূখণ্ডের আর-একটি অংশ হারাইতে হইয়াছিল।

১৯৩৩ সালে জেহল ও চাহারের একাংশ মাঞ্চুকুওর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এখন হোপেই প্রদেশে একটি নিরস্ত্রীকৃত এলাকা গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার রাজধানী হইয়াছিল পাইপিং-এর ১২ মাইল পূর্বে টাংচোতে। ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল পূর্ব হোপেই স্বায়ত্ত-শাসিত এলাকা। এই এলাকার দায়িত্ব ছিল য়িন-চু-কেং নামক একজন চীনা দলত্যাগীর উপর এবং এলাকাটির উপর প্রভুত্ব ছিল জাপানীদের। (পরে সম্ভবত জাপানী যোগসাজশে চীনা শুল্কবিভাগকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে বৃহৎ পরিধিতে চোরাকারবার চলিত)। ইহা ছাড়া, হোপেইর অবশিষ্টাংশ (যাহার মধ্যে পাইপিং ও টিয়েনটসিন পড়ে) এবং চাহারের একাংশ লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক একক গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। ইহা ছিল নানকিং-এর বাহিরে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী নেতা জেনারেল সুং চে য়ুয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত হোপেই-চাহার রাজনৈতিক পরিষদের অধীনে। এই পরিষদ জাপানের বিরোধিতা করিতে শঙ্কিত হইলেও নানকিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই।

১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে টোকিওতে একটি সামরিক বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং কিছু সময়ের জন্য স্বদেশের কাজে জাপান সরকারের হাত ছিল পরিপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের

অবস্থা দৃঢ় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে জাপান জার্মানীর সহিত একটি চুক্তি করিয়াছিল— জার্মান-জাপানী কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি। বৎসরের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে পাইপিং-পাওটাও রেলপথ ধরিয়া অন্তর্মোঙ্গলিয়ায় অনুপ্রবেশের একটা চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু জাপানের মোঙ্গল-মাঞ্চুকুও ভাড়া-করা বাহিনীকে সুইয়ান প্রদেশে নানকিং-এর সৈন্য-সহায়তায় জেনারেল জু সো আই প্রতিহত করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের ছাত্রের কাছে ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে ১৯৩১-এর পর হইতে জাপান শুধু দূর প্রাচ্যে নয় সাধারণভাবে বিশ্বরাজনীতিতেও ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেকে জাহির করিয়া চলিয়াছে। সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে সবল বলিয়া মনে না করিলে সে কখনো চীনের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক অভিযানে রত হইত না। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর তাহার জাতি-সঙ্ঘ ত্যাগের উল্লেখ আমরা আগেই করিয়াছি। ইহার পূর্বে সে ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী-চুক্তিকে বাতিল হইয়া যাইতে দিয়াছিল, সম্ভবত এই কারণে যে সে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহার আর কোনো প্রয়োজন তাহার কাছে ছিল না। ওয়াশিংটনের নৌ-চুক্তিতে জাপান, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের নিজের ক্ষেত্রে যুদ্ধ-জাহাজাদি রাখার ব্যাপারে ৫ : ৫ : ৩ এই আনুপাতিক হারে রাজি হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে এই চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হইয়াছিল, জাপান তখন সমতার দাবি তুলিয়াছিল। কিন্তু লন্ডন সম্মেলনে অন্যান্য শক্তি এই দাবি মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে ঘৃণার সহিত সম্মেলন হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। যখন ব্রিটেন বিশ্বের বাজার সম্বন্ধে জাপানের সহিত একটা অর্থনৈতিক বোঝাপড়া করার চেষ্টা করিয়াছিল তখন জাপান ব্রিটেন-কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলি ছাড়া অন্য কোনো বাজার লইয়া আলোচনায় অসম্মত হইয়াছিল এবং এই দুইটি শক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত ১৯৩৫-এর লন্ডন সম্মেলন ভাঙিয়া গিয়াছিল। এই সব ঘটনা হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে যে ১৯৩৭ সাল আরম্ভ হইলে জাপান নৈতিক ও আন্তর্জাতিক দিক দিয়া দূর-প্রাচ্যে বড়ো ধরনের বিরোধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

কিন্তু সময় সময় যাঁহারা সর্বাপেক্ষা বেশি ওয়াকিবহাল তাঁহারাও বিভ্রান্ত হন। ১৯৩৭-এর মার্চ ও জুলাই মাসের মধ্যে জাপান গোটা বিশ্বকে এই বিশ্বাসে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল যে সে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে এবং তাহার ফলে চীনের বিরুদ্ধে নূতন কোনো সামরিক অভিযান আরম্ভ করিতে সে অসমর্থ। কয়েকটি মার্কিন সামরিক পত্রে এই মর্মে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল যে যখন

পৃথিবীর বাকি অংশে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটিতেছিল তখন জাপানের অবস্থা ছিল বিপরীত। এই পুনরুজ্জীবনের ফলে কাঁচামালের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। জাপানকে এগুলি উচ্চ মূল্যে কিনিতে হইতেছিল এবং তাহার ফলে উৎপাদন ব্যয় পড়িয়া যাওয়ায় তাহার পক্ষে কার্যত বিশ্বের বাজারে সাফল্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। (ভারতে বর্তমানে জাপানী বস্ত্রাদির অস্বাভাবিক রকমের কম মূল্যের দ্বারা এই বিবরণ অপ্রমাণিত হয়)। মার্কিন সাংবাদিকগণ কষ্ট স্বীকার করিয়া এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে এই অর্থনৈতিক সংকটের দরুন জাপান চীনের ব্যাপারে ধীর গতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত লইয়াছিল এবং সেইজন্য তাহার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করিতেছিল। এই একই কারণে এ যুক্তিও দেখানো হইয়াছিল যে জাপানে চরম যুদ্ধবাজগণ সাময়িকভাবে সমর্থনচ্যুত হইয়া পড়িতেছিলেন এবং মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদগণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ইহা এখন দেখা যায় যে জাপানের এই নূতন নীতি তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঢাকিবার আবরণ বিশেষ ছিল। উদ্দেশ্য ছিল নিজের শত্রুদের নিরাপত্তাবোধে ঘুম পাড়াইয়া রাখা। জাপান সঙ্গত কারণে চীন-আক্রমণের এই বিশেষ মুহূর্ত বাছিয়া লইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ব্রিটেন কিংবা রাশিয়া তখনো জাপানকে যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাইতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা সকলে তীব্র বেগে প্রস্তুত হইতেছিল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল এবং দুই কিংবা তিন বৎসর পরে জাপানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং জাপানের অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল 'হয় এখন কিংবা কখনো না' এবং তদনুসারে সে আঘাত হানিয়াছিল। ভালো কথা বলিতে বলিতে ও নরমপন্থী কাজ করিতে করিতে সে সযত্নে এই আক্রমণের প্রস্তুতি করিয়াছিল। আর যখন সকলের মনে প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে জাপান শান্তির কথা চিন্তা করিতেছে, তখন সে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। তাই ১৯৩৭-এর ২৪ এপ্রিল নিউইয়র্কের সুপরিচিত সাময়িক পত্র 'দি নেশন' লিখিয়াছিল: "১৯৩১ সালের পর হইতে এখন দূর প্রাচ্যে শান্তির সম্ভাবনা পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি।" ২৬ জুন এই একই পত্রিকা লিখিয়াছিল যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানের আক্রমণে একটা ভাটা চলিয়াছে। কিন্তু লেখক তখন জানিতে পারেন নাই যে ইহা ছিল ঝড়ের পূর্বের শান্ত অবস্থা মাত্র।

জাপানের আর-একটি আক্রমণের প্রস্তুতি ছাড়াও, অন্য কিছু বিষয় দূর-প্রাচ্যের বর্তমান সংকট বৃদ্ধি করিয়াছিল। সিয়ানের আকস্মিক বিদ্রোহ ও ১৯৩৬

সালের ডিসেম্বরে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের অপহরণ চীনের "যুক্তফ্রন্ট" নীতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এ বিষয়ে খুব কম সন্দেহের কারণ আছে যে চিয়াংকে যাঁহারা বন্দী করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে মুক্তি দিবার পূর্বে চীনা সোভিয়েটগুলি ও নানকিং সরকারের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিরোধের ভিত্তি সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল। এই বোঝাপড়ার অর্থ হইল সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম চীনের একত্রীকরণ সম্পাদন। চীনা সোভিয়েটগুলিকে কম্যুনিজম ও বিভেদবাদ ছাড়িতে হইবে ও নানকিং-এর নির্দেশ মানিতে হইবে। জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ চীনের নেতৃত্ব দিবেন চিয়াং এবং কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ, চৌ-এন-লাই ও চিয়াং-এর নিজের পুত্র তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিবেন। জাপান ইহা জানিতে পারিয়াছিল এবং ঐক্যবদ্ধ চীন সংহতিসাধনের পথে অধিকতর অগ্রসর হইবার পূর্বে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছিল।

সময়টা জাপানের পক্ষে বহু দিক হইতে সুযোগপূর্ণ। যদিও পূর্বোল্লিখিত মতে ব্রিটিশ, রুশ ও মার্কিন পুনরস্ত্রসজ্জা দ্রুত বেগে চলিয়াছে তাহাদের কেহই এখনো বিরোধের জন্য প্রস্তুত নয়। সিংগাপুর ঘাঁটি সম্পূর্ণ করিতে ব্রিটেনের এখনো সময় লাগিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নিরপেক্ষতা আইন স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে সে প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিরোধের বাহিরে থাকিতে চায়। ফ্যাসিস্টদের বিবরণ অনুসারে রুশবাহিনীতে দারুণ অসন্তোষ বিদ্যমান এবং আর যাহাই হউক ইহাকে বারোমাস পূর্বে যেরূপ ভয়ংকর মনে হইয়াছিল সেরূপ ভয়ংকর ইহা নয়। সোভিয়েট-মাঞ্চুকুও সীমান্ত-সংঘর্ষের পর ১৯৩৭ সালের ৪ জুলাই বিতর্কিত দ্বীপগুলি হইতে সোভিয়েট সৈন্যদের প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। এই দ্বীপগুলি ১৮৬০ সালে চীনের সহিত চুক্তির ফলে রাশিয়ার দখলে ছিল। ইহা হইতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে সোভিয়েট সরকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন।

আমুর নদী হইতে সোভিয়েট সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের তিন দিন পর পাইপিং-এর নিকটে নূতন 'ঘটনা' সাজানো হইয়াছিল এবং ১৯৩৭-এর ৮ জুলাই উত্তর চীনের উপর পুনরায় আক্রমণ শুরু হইয়াছিল।

কিংবদন্তী অনুসারে মানুষ বিপদ ঘটিবার পর বিজ্ঞতর হইয়া উঠে। এখন ওয়াকিবহাল সাংবাদিকগণ বলিতেছেন যে জাপান অতীতে কিছুকাল ধরিয়া যুদ্ধ প্রস্তুতি করিতেছেন। সে মাঞ্চুকুও দখল করিয়া সন্তুষ্ট নয়। এই দেশটি জাপানী উপনিবেশ স্থাপনকারীদের পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঠাণ্ডা। জাপানী শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশ এখান হইতে

পাওয়া যায়। ইহা নিঃসন্দেহে জাপানের বাণিজ্য কিছুটা বৃদ্ধি করিয়াছে— সে লাভ অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে প্রশাসনের ব্যয় এবং জাপানী মাঞ্চুরীয় পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষতির দরুন। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক দিক হইতে উত্তর চীন (অর্থাৎ সানটুং, হোপেই, চাহার, সানসী ও সুইয়ান প্রদেশগুলি) মাঞ্চুকুও অপেক্ষা অনেক কিছু বেশি দিতে পারে। সানসীতে আবার উচ্চশ্রেণীর কয়লাও আছে। অধিকন্তু এই পাঁচটি প্রদেশের সর্বত্র টিন, তামা, সোনা ও তেল ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে। জাপানে এখন প্রতি বৎসর ৪০ কোটি ইয়েন মূল্যের যে তুলা ভারত ও আমেরিকা হইতে আমদানি করা হয় তাহা চাষের পক্ষে পীত নদীর (হোয়াং-হো) উপত্যকা উপযোগী। আর জাপানী উপনিবেশ স্থাপনকারীদের পক্ষে ও পশুপালনের পক্ষে আবহাওয়া মাঞ্চুকুও অপেক্ষা অধিকতর অনুকূল।

জাপানীরা এই অঞ্চল কাজে লাগাইবার জন্য কিছুকাল পূর্বে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিল কিন্তু অঞ্চলটি যতদিন চীনের সার্বভৌমত্বে থাকিবে ততদিন সেখানে জাপানী মূলধন নিয়োগে ধনতন্ত্রবাদীদের অনিচ্ছা ছিল। কাজেই যুদ্ধবাদীদের আসিতে হইয়াছিল ধনতন্ত্রবাদীদের সহায়তায়।

বর্তমান আগ্রাসনের পিছনে অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছাড়াও একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল। মার্কিন সাংবাদিকগণ যখন এবৎসরের প্রথম দিকে জাপানের অর্থনৈতিক সংকট সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহারা আংশিকভাবে সত্য কথা বলিলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি ছিল ভ্রান্ত। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বিপরীতভাবে দেশে অসন্তোষ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি 'স্বৈরতান্ত্রিক' সরকারকে বিদেশে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্ররোচনা দিতে পারে। (অদূর ভবিষ্যতে এরই সংকট জার্মানীতেও দেখা দিতে পারে)। জাপানের ক্ষেত্রে ইহা বলা যাইতে পারে যে ক্ষীয়মাণ বাণিজ্য খতিয়ানের ফলে সে সাম্প্রতিক অতীতে যে অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-মনস্তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়াছিল। ইহা ছাড়া, ১৯৩৬-এর নবেম্বরে জাপানীদের পরিচালিত সুইয়ান-বিরোধী (উত্তর চীনের একটি প্রদেশ) অভিযানের ব্যর্থতার পর হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে যদি সমগ্র উত্তর চীনকে দখল করা যায় তবেই শুধু অন্তর্মোঙ্গলিয়ার সমর-কৌশলের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি দখল করা সম্ভব। চাহার ও বিশেষ করিয়া সুইয়ান নিয়ন্ত্রণ না করিয়া মাঞ্চুকুওর দিক হইতে অন্তর্মোঙ্গলিয়ায় প্রবেশ করা অসম্ভব।

জাপান অর্থনৈতিক মূল্যবিহীন ঊষর দেশ অন্তর্মোঙ্গলিয়া সম্বন্ধে এত

আগ্রহী কেন ? কারণটা অর্থনৈতিক নয়, সমর-কৌশলগত। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জাপান মাঞ্চুকুও, উত্তর চীন ও মোঙ্গলিয়া লইয়া গঠিত ঘন সন্নিবিষ্ট ভূমিখণ্ড পাইতে আগ্রহী। এখন ইত্যবসরে সোভিয়েট কূটনীতি বসিয়া নাই এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের দুইটি বড়ো প্রদেশে— সিংকিয়াং (কিংবা চীনা তুর্কীস্তান) ও বহির্মোঙ্গলিয়া (সোভিয়েট রাশিয়া সংলগ্ন মোঙ্গলিয়ার উপরের অংশ) সোভিয়েট প্রভাবের আওতায় গিয়াছে। জাপানের কাছে সিংকিয়াং-এর বিশেষ সামরিক গুরুত্ব নাই (যদিও ইহা ভারতের সন্নিহিত বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে ইহার গুরুত্ব আছে)— কিন্তু জাপানের কাছে বহির্মোঙ্গলিয়ার গুরুত্ব আছে। বহির্মোঙ্গলিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণে থাকায় সোভিয়েট রাশিয়া সহজে উত্তর চীনে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা বন্ধ করার এবং খাস চীন হইতে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন রাখার একমাত্র উপায় হইল অন্তর্মোঙ্গলিয়া (মোঙ্গলিয়ার দক্ষিণাংশ) ও উত্তর চীন দখল করা এবং সেইভাবে রুশ সাইবেরিয়া ও বহির্মোঙ্গলিয়াকে খাস চীন হইতে বিচ্ছিন্নকারী পশ্চিম হইতে পূর্বে একটি ঘনসন্নিবদ্ধ করিডর সৃষ্টি করা। এই অঞ্চল দখল করা এখন জাপানের লক্ষ্য। একবার সে এ-প্রয়াসে সফল হইলে তাহার পরবর্তী উদ্যোগ হইবে এই নবলব্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ তৈয়ারি করা। সে যদি সেখানে নিজের অবস্থা স্থিতিশীল করিতে পারে তখন সে বহির্মোঙ্গলিয়ায় প্রবেশের কথা চিন্তা করিবে। তখন কী হইবে সে সম্বন্ধে এখন ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। বর্তমানে বহির্মোঙ্গলিয়া রুশ প্রভাব-বৃত্তের অন্তর্গত ও সোভিয়েট সরকার স্পষ্টভাবে এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে জাপানের পক্ষে এই এলাকায় প্রবেশের কোনো প্রয়াস যুদ্ধের সামিল বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু জাপান ভবিষ্যতে কোনো এক সময় মোঙ্গলদের নিজেদের প্রভুত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার সকল আশা ত্যাগ করে নাই। এইজন্য জাপানী চরেরা প্রায়ই সমগ্র মোঙ্গলের জন্য 'মেংকুকুও'কে উপযুক্ত রাজনৈতিক আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনা যদি কখনো সফল হয় তাহা হইলে তাহা মাঞ্চু-কুওর মতো ব্যাপার হইবে। ইহা মোঙ্গলদিগকে মিলবার্টীয় ধাঁচের স্বায়ত্তশাসন-সহ নিজেদের রাষ্ট্র দিবে ঠিকই কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা থাকিবে জাপানী নিয়ন্ত্রণে। দূর প্রাচ্যে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মোঙ্গল অধিবাসী আছে। কুড়ি লক্ষ মোঙ্গল মাঞ্চুকুওর সিংগান প্রদেশে বাস করে। বহির্মোঙ্গলিয়ায় বাস করে দশ লক্ষের মতো যদিও এ অঞ্চলটি আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক তবু ইহা

প্রধানত মরুভূমি। আর দশ লক্ষ বাস করে অন্তর্মোঙ্গলিয়ায় এবং প্রায় দশ লক্ষের মতো ছড়াইয়া আছে সিংকিয়াং (চীনা তুর্কীস্তান), তিব্বত ও সোভিয়েট বাশিয়া (বুরিয়াট প্রজাতন্ত্রে)। ভবিষ্যৎ মোঙ্গল রাষ্ট্র 'মেংকুকুও'র একটা কাঠামো ইতিমধ্যে মোঙ্গলীয় রাজনৈতিক পরিষদরূপে গঠিত হইয়াছে। মোঙ্গল নেতাদের মধ্যে যাঁহারা জাপানের প্রভাবাধীন তাঁহারা হইলেন লি শাউসিন ও প্রিন্স তে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত মেংকুকুও জাপানের পক্ষে একটি ভবিষ্যৎ প্রকল্প হইলেও একটি স্বায়ত্তশাসিত উত্তর চীন তাহার অব্যবহিত লক্ষ্য।

মাঞ্চুকুও দখলের পর হইতে উত্তর চীনে জাপানী প্রভাব ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং তাহাই তাহাদিগকে এই আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে যে বড়ো ধরনের কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই চীনের পাঁচটি প্রদেশ লইয়া অদূর ভবিষ্যতে একটি পুতুল রাষ্ট্র গঠিত হইবে। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে মার্শাল চিয়াং-এর সঙ্গে চীনা কম্যুনিস্টদের যে বোঝাপড়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহার পরে সম্প্রতি ক্যান্টন প্রদেশ নানকিং-এর এক্তিয়ারে চলিয়া যাওয়ায় জাপানীদের সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া থাকিবে। দীর্ঘকালের শেষে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ চীন পৃথিবীর চোখের সামনে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল এবং সেই চীন বিনা যুদ্ধে তাহার উত্তর প্রদেশগুলি ছাড়িয়া দিবে না।

১৯৩৭-এর জানুয়ারি হইতে নানকিং উত্তর চীনের রাজকর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব হোপেইর মধ্য দিয়া জাপানীদের দ্বারা রক্ষিত চোরাচালান ব্যবস্থায় নানকিং হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। চীনা সম্মতি ছাড়া জাপান-কর্তৃক সংগঠিত নূতন টিয়েনসিন-টোকিও বিমান চলাচল স্থগিত রাখার নির্দেশ দিবার দুঃসাহসও সে দেখাইয়াছিল। উত্তর চাহারে জাপানী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মাঞ্চুকুও ও মোঙ্গল সৈন্যদের একটা ছোটোখাটো বিদ্রোহ হইয়াছিল। ক্রমবর্ধমানভাবে এই ধরনের জাপানী-বিরোধী ঘটনা ঘটিতেছিল এবং জাপানী দাবি অনুসারে দাসসুলভ নতি স্বীকার করিয়া সেগুলির মীমাংসা করা হয় নাই। সর্বোপরি, খবর ছিল যে নানকিং এবং চীনা কম্যুনিস্টদের মধ্যে বোঝা-পড়ার ফলে কম্যুনিস্টদের ৯০,০০০ অভিজ্ঞ সৈনিককে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত করা হইবে।

১৯৩৭-এর ৩ জুলাই জাপানী রাষ্ট্রদূত শিগেরু কাওয়াগো নানকিং-এর সংগে আপস-আলোচনা আরম্ভ করেন। জাপান তাহার দাবি কমাইয়া প্রস্তাব করিয়াছিল যে যদি নানকিং মাঞ্চুকুওকে আইনসম্মত স্বীকৃতি দেয় এবং জাপানের

সহিত "অর্থনৈতিক সহযোগিতা"য় সম্মত হয় তাহা হইলে জাপান উত্তর চীনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করিবে। জানা যায় নানকিং এ-প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার প্রতি-প্রস্তাব ছিল জাপানী প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে অপ্রতুল। একটি নূতন চীন যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সে যে শীঘ্রই উত্তরের প্রদেশগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপ করিবে— এ বিষয়ে আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং জাপান অবিলম্বে আঘাত হানিয়াছিল এবং পাইপিং-এর (পিকিং) প্রায় ১৮ মাইল পশ্চিমে লুকৌচাইওতে একটি "ঘটনা" সাজাইয়া মঞ্চস্থ করা হইয়াছিল। ইহাতে নৈশ পাহারায় নিযুক্ত জাপানী সৈন্যদের সহিত এই অঞ্চলে অবস্থিত ২৯নং চীনা বাহিনীর ইউনিটের সঙ্গে সংঘর্ষ হইয়াছিল।

আইনের দিক হইতে এই ঘটনাটি দেখিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে জাপানীরাই অন্যায় করিয়াছিল। যদিও ১৯০১ সালের বক্সার চুক্তি অনুসারে পাইপিং দূতাবাস এলাকায় এবং পাইপিং-টিয়েনসিন রেলপথের কয়েকটি স্থানে সৈন্য রাখার অধিকার তাহাদের ছিল—তাহারা কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকাগুলির বাহিরেও সৈন্য পাঠাইত এবং চুক্তিতে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা অভিপ্রেত থাকিলেও তাহারা বরং এই যোগাযোগ ব্যাহত করিত। যাহা হউক, এই সংঘর্ষের পরে পরেই জাপান সরকার নিম্নলিখিত দাবিগুলি করিয়াছিলেন :

১. পাইপিং-এর পশ্চিম হইতে ২৯নং বাহিনী প্রত্যাহার।
২. সংঘর্ষের জন্য দায়ী চীনাদের শাস্তি বিধান।
৩. উত্তর চীনে সকল জাপ-বিরোধী কার্যকলাপের যথোচিত নিয়ন্ত্রণ এবং
৪. কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগুলি বলবৎকরণ।

জানা যায় যে হোপেই-চাহার রাজনৈতিক পরিষদ ১৯ জুলাই দাবিগুলি মানিয়া লইয়াছিল এবং সমাধানের শর্তগুলি টোকিওতে ২৩ জুলাই প্রকাশিত হইয়াছিল। চীনাদের পক্ষে প্রত্যাশা ছিল যে চীনা ও জাপানী সামরিকবাহিনী উভয়েই সংশ্লিষ্ট এলাকা হইতে সরিয়া যাইবে এবং ইহা খুবই সম্ভব ছিল যে নানকিং অনিচ্ছায় হইলেও উল্লিখিত সমাধান অনুমোদন করিবে। কিন্তু যখন জাপানী সেনাবাহিনী ওই এলাকা ছাড়িয়া গেল না, তখন চীনা সৈন্যদের অধস্তন অফিসারগণ ও সাধারণ সৈন্যরা ওই এলাকা ছাড়িতে অস্বীকৃত হইলেন। ২৬ জুলাই জাপানী সমরনায়কগণ এই চরম পত্র দিলেন যে চীনা সৈন্যদের ২৮ জুলাই মধ্যাহ্নের মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে। জাপানীরা গায়ের জোরে তাহাদিগকে উৎখাত করিতে অগ্রসর হইল এবং এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যদিও নানকিং-এর একনায়ক মার্শাল চিয়াং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন, তবু তিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তিনি যে বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করিবেন তাহা মনে হয় না।

জাপান সুদীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং জাপানী ডায়েট ইতিমধ্যে এই অভিযানের জন্য বহু পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরের পক্ষে ভোট দিয়াছে। জানা যায় যে ১৯৩৮-এর জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালাইবার জন্য জাপান ১১৭,৬৫০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ব্যয় করিবে।

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধের সাম্প্রতিকতম অবস্থা এই যে যুদ্ধ সাংহাই এলাকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। ৯ আগস্ট সাংহাই-এর নিকটে হুংজাও বিমান-ঘাঁটিতে একটি নূতন "ঘটনা" ঘটিয়াছিল। দুইজন জাপানী নৌবাহিনীর অফিসার বিমান-ঘাঁটিতে প্রবেশের চেষ্টা করায় তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। ইহার পরে জাপানী নৌবাহিনী এই গুলি চালনার প্রতিশোধ লইবার জন্য কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল এবং জাপানী নৌসেনাধ্যক্ষ দাবি করিয়াছিলেন যে সাংহাই হইতে কম পক্ষে ৩০ মাইল দূরে সব চীনা সৈন্যকে প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যে-সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেগুলি সব অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। এই দাবির উত্তরে চীনের পক্ষ হইতে স্থানীয় সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নানকিং হইতে ৮৮নং ডিভিসনকে সাংহাই অঞ্চলে পাঠানো হইয়াছিল। জাপানীরা ইহাকে ১৯৩২ সালের চুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন বলিয়া মনে করিয়াছিল কিন্তু চীনারা প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল যে জাপানীরা নিজেরাই তো চীনা ভূখণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিয়া এবং উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ঘটনাস্থলে বিরাট নৌবহর আনিয়া চীনকে সেই চুক্তির শর্ত মানার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে।

এইভাবে দুই রণাঙ্গনে পাইপিং এবং সাংহাইতে যুদ্ধ চলিয়াছে। এ প্রসঙ্গে একটা মূল প্রশ্ন এই যে কোন্ পক্ষ সাংহাই-এর রণাঙ্গনে যুদ্ধ সম্প্রসারণ করিতে চাহিয়াছিল? খুব সম্ভব জাপানীরা।

নানকিং-এর সৈন্যবাহিনী হোপেই প্রদেশে প্রবেশ করার পর জাপানীরা স্থল-ভূমিতে আটকা পড়িয়া যাওয়ায় সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল। মার্শাল চিয়াং পাইপিং-এর (জাপানী দখলভুক্ত) চতুর্দিকে যেরূপ অর্ধ-বৃত্তাকারে সৈন্য সাজাইয়াছেন তাহা খুবই সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলের পরিচায়ক হইয়াছে। সরকারী বাহিনীর বাম প্রান্তে আছে প্রসিদ্ধ গিরিপথ ন্যাংকাউতে যেখানে পাইপিং-

পাওতাও রেলপথ পাহাড় কাটিয়া বাহির হইয়াছে। এই অর্ধবৃত্তের কেন্দ্র হইয়াছে হ্যাংকাউ রেলপথে পাইপিং-এর ১০০ মাইল দক্ষিণের পাওটিংফুতে। দক্ষিণ প্রান্ত প্রসারিত রহিয়াছে জাপানের অধিকারগত টিয়েনৎসিনের ৩০ মাইলের মধ্যে। এই অর্ধবৃত্তকে—"হিন্ডেনবার্গ" লাইনকে— ভাঙিয়া ফেলা খুবই কঠিন কাজ। সেইজন্য সমর-কৌশলের দিক হইতে চীনা প্রতিরোধ দুর্বল করার জন্য সাংহাই আক্রমণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

চীনের হৃদয় বলিয়া যদি কোনো স্থানকে চিহ্নিত করা যায় তবে তাহা হইল ইয়াং-সির মোহনাস্থিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-নৈতিক ভিত্তিকে বিপন্ন করা, জাতীয় মনোভাব দুর্বল করিয়া তোলা এবং চীনা বুর্জোয়াদের সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে জাপান আক্রমণ করিতেছে চীনের হৃদয়কে যাহাতে তাহার বিদেশী নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র বানচাল হইয়া পড়ে। সাংহাই কার্যত জাপানী নৌবাহিনীর দয়ার উপর নির্ভর-শীল এবং এই সমৃদ্ধ ও সতত বর্ধনশীল নগরীর উপর আক্রমণ স্পষ্টতই দ্রুত যুদ্ধ শেষ করিবার উপায় বিশেষ। কিন্তু এই আক্রমণের কার্যকারিতা নির্ভর করিবে যুদ্ধের দরুন বাণিজ্য কী পরিমাণ বানচাল হয় এবং বাস্তব ক্ষতি কতটা হয় তাহার উপর।

যুদ্ধ কিছু সময় ধরিয়া চলিবে। একজন প্রসিদ্ধ সমরকুশলী বলিয়াছেন যে জাপান চেষ্টা করিবে "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে চীনের হৃদয়কে অবশ করিয়া ফেলিতে। সুতরাং সাংহাই-এ যুদ্ধের দ্বারাই হয় চীনকে উঠিতে কিংবা পড়িতে হইবে।" চীন কি এই রক্তমোক্ষণের বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে? অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য ক্যান্টন যদি খোলা থাকে এবং সাংহাই-এর যুদ্ধের দরুন যদি গুরুত্ব রাজস্ব ক্ষতি না হয়, তবে চীন হয়তো দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারিবে। এটি যেমন একটি দিক, ইহার অপর একটি দিক এই যে জাপানী নৌ-বাহিনী চীনের বন্দরগুলিকে অবরোধ করার চেষ্টা করিতেছে। ইহা ছাড়া জাপানের জনগণের মধ্যে একটা যুদ্ধ রোগ দেখা দিয়াছে এবং এই দ্বীপ-সাম্রাজ্যে সামরিক বাহিনী ও অসামরিক জনগণের মধ্যে লক্ষ্যের কোনো বিভেদ দেখা যায় না।

চীন ১৯৩১ সালে যেরূপ করিয়াছিল পুনরায় সেইরূপ আবেদন করিয়াছে জাতি-সঙ্ঘের কাছে। কিন্তু এরূপ জরুরি অবস্থায় এই মৃতপ্রায় সঙ্ঘের মূল্য কতটুকু? বিশ্বজনমত অবশ্য চীনের দিকে কিন্তু মেসিনগানের বিরুদ্ধে বিশ্ব-

জনমতের মূল্যও তো বেশি নয়। চীনের ভবিষ্যৎ বাস্তবিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। সময় চীনের পক্ষে এ অভিমত এখন আর ঠিক নয়। আজ চীন সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। ঈশ্বর করুন তাহার যেন জয় হয়।

জাপান নিজের জন্য ও এশিয়ার জন্য ভালো ভালো কাজ করিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় তাহার পুনর্জাগরণ আমাদের মহাদেশের সর্বত্র সাড়া জাগাইয়াছিল। জাপান দূর প্রাচ্যে শ্বেতাঙ্গের মর্যাদা বিনষ্ট করিয়াছে এবং শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমস্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হতমান করিয়াছে। এসীয় জাতি হিসাবে সে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং তাহা যুক্তিসংগতও বটে। সে দূর প্রাচ্য হইতে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া, চীনা প্রজাতন্ত্রকে খণ্ড-বিখণ্ড না করিয়া আর একটি গর্বিত, সংস্কৃতিবান ও প্রাচীন জাতিকে অপমানিত না করিয়া এই সব-কিছু করা কি সম্ভব ছিল না? না, যে প্রশংসা জাপানের পাওয়া উচিত তাহাকে সেই সকল প্রশংসা দেওয়া সত্ত্বেও চীনের এই দুর্দিনে তাহার প্রতি আমাদের হৃদয় ধাবিত হয়। চীনকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে— তাহার নিজের জন্য এবং মানবতার জন্য। অতীতে তাহার ক্ষেত্রে অনেক সময় যেরূপ ঘটিয়াছে সেইভাবে সে এই বিরোধের ভস্মস্তূপ হইতে ফিনিক্সের মতো আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা যেন এই দূর প্রাচ্যের বিরোধ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি। একটি নূতন যুগের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া ভারত প্রত্যেক দিকে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংকল্প গ্রহণ করুক— তবে সে যেন অন্যান্য জাতির বিনিময়ে এবং আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত পথের মাধ্যমে তাহা না করে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমন

'ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে ১৭ অক্টোবর ১৯৩৭ লণ্ডনে আহূত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই হইতে প্রেরিত বাণী।

আমরা এ কথা জানিয়া আনন্দিত যে ১৯৩৭-এর ১৭ অক্টোবর লন্ডনে "ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা" সম্বন্ধে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ এলাকাতেই হউক কিংবা ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতেই হউক, ব্যক্তি-স্বাধীনতা লঙ্ঘন আমাদের জনজীবনের এমন স্বাভাবিক অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে যে আমাদের জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে কখনো কখনো নিরাসক্ত কিংবা উদাসীন থাকিবার প্রবণতা দেখা যায়।

যাহা হউক, গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক চেতনা আমাদের জনসাধারণের উপর যে অন্যায় ও বৈষম্য চাপাইয়া দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি দেশব্যাপী ভারতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইউনিয়ন ও তাহার শাখাসমূহ এই দেশের শাসন-ব্যবস্থার একটি জঘন্যতম দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। বিদেশে এবং বিশেষ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনগণের আদৌ কোনো ধারণা নাই যে, ভারতের রাজশক্তি-কর্তৃক কিভাবে ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পদদলিত হইতেছে।

এই অবস্থায় এবং ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ অজ্ঞতার দরুন ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্মেলন কেবল সময়োপযোগী নয়, ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে সবিশেষ কল্যাণপ্রসূও বটে। আমরা এই সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

আমরা গ্রেট ব্রিটেনের স্বাধীনতাপ্রেমী নরনারীদের সহানুভূতি ও সমর্থন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে পারিলে ভারতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া আমরা মনে করিব।

২০ অক্টোবর ১৯৩৭

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণসভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণসভার উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় ডালহৌসি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম ভাষণ।

কংগ্রেস সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাইতে চায়— সে শোষণ সরকারেরই হউক কিংবা কায়েমী স্বার্থেরই হউক। কংগ্রেস সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিতে চায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত ভারত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও লাভ করিবে। সে পুনরায় পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রথম সারিতে নিজের স্থান করিয়া নিতে পারিবে এবং তাহার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে।

কংগ্রেস আজ শক্তি ও জনপ্রিয়তায় যে পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, দশ বৎসর আগে তাহা সে দাবি করিতে পারিত না। সারা দেশ ব্যাপিয়া কংগ্রেসের অগণিত শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। নিজের প্রতিষ্ঠার দরুন কংগ্রেসকে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থ দেখিতে হয়। এরূপ করিতে গিয়া শক্তিশালী ও কায়েমী স্বার্থের ধারক ভারতীয়গণ-কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের দৃশ্য চোখে পড়া অস্বাভাবিক নয়। ভারতে জন-সংযোগের অর্থ হইল কিষাণদের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রচার। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে ভারতের গৌরব ও কৃতিত্ব নির্ভর করে কৃষির উপর।

ধনের প্রকৃত উৎপাদকেরা দারিদ্র্যের ভারে নিপীড়িত। জনসাধারণের মধ্যে বহু-উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত শ্রেণীর এই মানুষগুলির স্বাভাবিক দাবি সাধারণ-কর্তৃক স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে। ইহাদের প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে ও জমিদারগণের হাতে ইহাদিগকে যে নির্যাতন ভুগিতে হইয়াছে সে কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। ইহা সত্য যে যাঁহারা, এমন-কি আমাদের দেশবাসী-দের মালিকানাধীন কলকারখানায় কাজ করেন তাঁহারাও মালিকদের নিকট হইতে যথোচিত ব্যবহার পান না।

হক্ মন্ত্রীসভা তাঁহাদের লক্ষ্য কতটা পূরণ করিতে পারিয়াছেন তাহা জনগণের বিচার্য। আমার অভিমত এই যে বৈদেশিক প্রভুত্ব থাকা পর্যন্ত বাস্তব কোনো প্রগতি প্রত্যাশা করা যায় না।

কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হউন। তাহা না হইলে আপনাদের অধিকারের দাবি স্বীকৃতি পাইবে না। ইহা ভাগ্যের পরিহাস যে, যাঁহারা আমাদের খাদ্য উৎপাদন করেন,

তাঁহাদিগকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর শিকার হইতে হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষকদের উচিত নিজেদের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট গড়িয়া তোলা। যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁহাদের কাছে আমি আবেদন জানাই যে, আপনারা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হউন। সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সমাবেশ-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে।

২৮ অক্টোবর ১৯৩৭

মেদিনীপুর কংগ্রেস সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা

মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের একশত দশটি সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে কংগ্রেসের কার্যকরী সভায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য।

মেদিনীপুরের ইতিহাস নিশ্চয়ই আমাদের দেশবাসীদের একটা খুব বড়ো অংশের নিকট সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু আমার সন্দেহ, এই ইতিহাসের সকল ঘৃণ্য খুঁটিনাটি তাঁহারা জানেন কিনা। ইহা নিশ্চয়ই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, এই ১৯৩৭ সালে বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যুগে মেদিনীপুর জেলার সকল কংগ্রেস সংগঠন— যাহাদের সংখ্যা একশত দশটির কম নয়— এখনো সরকারী নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

এই নিষেধাজ্ঞার ফল কি হইয়াছে? এই নিষেধাজ্ঞার ফলে এই জেলার কোনো অংশে কংগ্রেস সদস্যদের তালিকাভুক্ত করা যায় না। সুতরাং, জেলায় কোথাও কোনো কংগ্রেস কমিটিরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ইহাও একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয় যে এই জেলার অধিকাংশ সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মী জেলার বাহিরে বহিষ্কৃত জীবনযাপন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পেশাদারী মানুষ, যেমন ব্যবহারজীবী ও চিকিৎসক, তাঁহারা এই প্রদেশের অন্যত্র কোনো প্রকারে জীবিকা-নির্বাহ করিয়া বাঁচিয়া আছেন।

বাংলা সরকার তাঁহাদের প্রচণ্ড ক্রোধ এই দুর্ভাগা জেলার উপর পুঞ্জীভূত করিয়াছেন কেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমাকে যদি কোনো প্রকার ব্যাখ্যা দিতে হয়, যদি কোনো কংগ্রেস কর্মীর পক্ষে সরকারী আচরণের ব্যাখ্যাদান সম্ভব হয়, তাহা হইলে ১৯২১ সালে আপনাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয়।

সেই বৎসর ঐ জেলায় তীব্র করবন্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল। বাংলা সরকার গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন নামে একটি আইন পাস করিয়াছিলেন এবং এই আইনটি কার্যত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শাসন বজায় রাখিয়াছিল। গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চৌকিদারী কর সরাসরি সংগ্রহের পরিবর্তে আইনে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে কর সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং দেখা যায় যে গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন চালু হওয়ার ফলে সুবিধা হইবার পরিবর্তে কর বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল ও এই গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি শুধু যে সরকারের অংগ হিসাবে কাজ করিতেছিল তাহা নয়, আরো শোচনীয় ব্যাপার এই যে, ইহারা গোয়েন্দা-বিভাগের অংগ হিসাবেও কাজ করিতে-ছিল। আইন চালুর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি এই আইন চালু হওয়ার বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন এবং জেলার একটি বড়ো অংশে করবন্ধ আন্দোলন চালানো হইয়াছিল। এই করবন্ধ আন্দোলন আমাদের পরলোকগত বন্ধু শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সুদক্ষ পরামর্শে ও নেতৃত্বে এত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, বাংলা সরকার পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজেদের কথা ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং জেলা হইতে আইনটিও প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

অবিস্মরণীয় পরাজয়

সেই পরাজয় বাংলা সরকার কখনো ভুলিতে পারেন নাই। অন্যান্য স্বৈরতন্ত্রী সরকারের মতো বাংলা সরকার ক্ষমা করিতে কিংবা ভুলিতে পারেন না। ইহার পর হইতে তাঁহারা এই জেলার প্রতি প্রতিশোধের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

১৯২৩ ও ১৯২৬-এর নির্বাচনে এবং ১৯২৯ সালের নির্বাচনেও সব কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়াছিলেন এবং জেলাটি আমাদের নিকট কংগ্রেস প্রভাব ও মর্যাদার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনে লবণ-আইন অমান্য হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী মন্ত্রীসভার অন্যান্য আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে এই জেলা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সারা জেলায় তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলন হইয়াছিল এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকার পর ১৯৩২ সালে এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হইলে মেদিনীপুর আবার চমকপ্রদ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

মেদিনীপুরের করুণ ক্রন্দন

বাংলা সরকারের বর্তমান মনোভাবের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় ঐ হতভাগ্য জেলায় অনেক অত্যাচার করা হইয়াছিল। আমি সেই দমনমূলক নীতির বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না এবং বর্তমানে আইনে যে সীমা নির্দিষ্ট করা আছে সেই সীমার মধ্যে থাকিয়া তাহা করিতে আমি পারিব কিনা সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নহি। বাস্তব ঘটনা এই যে, দমনকার্য বহুল পরিমাণে চলিয়াছিল এবং মেদিনীপুরের করুণ ক্রন্দন জেলার সীমা ছাড়াইয়া সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক যে যখন ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তখন জনগণের বিশেষ করিয়া তরুণদের, মাথা সাময়িকভাবে খারাপ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই অস্থিরতার পটভূমিকায় ঘটিয়াছিল তিনটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করা হইয়াছিল। ইহাই মেদিনীপুর জেলায় বর্তমান ও অতীত দমন নীতির পক্ষে সরকারী অজুহাত। কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য নজির দেখাইয়া বলিতে চাই যে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পর মেদিনীপুরের কংগ্রেস সংগঠনগুলি বিনা দ্বিধায় ও বিনা বিলম্বে তাহার নিন্দা করিয়াছিল। সুতরাং, মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীদের প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহাতে তাঁহাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না এবং অধিকন্তু ১৯২১ সালের পর হইতে কোনো কংগ্রেসকর্মী কোনো হত্যা কিংবা রাজনৈতিক অপরাধে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত, এমন-কি গ্রেপ্তার পর্যন্ত, হন নাই।

এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কাঁধে কি করিয়া কোনো দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব ? যদি দেশে ভয়ংকর নির্যাতন চলে, যদি সাময়িকভাবে জনসাধারণ সংযম হারাইয়া ফেলে এবং যদি কিছু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, তাহার জন্য কংগ্রেসের উপর কিভাবে দোষারোপ করা যায় তাহা আমি জানি না।

ন্যক্কারজনক আদেশ

আইন-অমান্য আন্দোলনের আরম্ভ হইতে কেবল যে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকেই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহা নয়। জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী কয়েকটি ন্যক্কারজনক ধরনের আদেশ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশ আজও বিদ্যমান। কংগ্রেসকর্মীদিগকে জেলার বাহিরে নির্বাসিত করার আদেশ, প্রতি

দুইদিন বা তিনদিন অন্তর জেলাবাসী কংগ্রেসকর্মীগণকে থানায় হাজিরা দানের আদেশ, চৌদ্দ হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হিন্দুদের মেদিনীপুর শহরের কয়েকটি পথ দিয়া চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞার ও অন্যান্য অনেককে তাঁহাদের আসা-যাওয়ার সংবাদ থানায় জানাইবার আদেশের বিষয় আমি এই সভায় উল্লেখ করিতে চাই। এ ছাড়া বিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় যে ব্যক্তিগত বাসগৃহগুলি দখল করা হইয়াছিল তাহার কতকগুলি এখনো সরকারের অধীনে আছে।

এই-সব এবং অন্যান্য অনেক আদেশ এখনো মেদিনীপুর জেলায় বলবৎ এবং আপনারা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন, এই অবস্থায় এই জেলায় কোনো প্রকাশ্য আন্দোলনের অস্তিত্ব থাকা এবং তাহা চালানো কত কষ্টসাধ্য। সরকারের যাহা লক্ষ্য তাহা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন নহে। গোটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সন্ত্রাসবাদ একটা অজুহাত মাত্র। ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালের যে আইন-অমান্য আন্দোলন দেশপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ বলিয়া গণ্য হয় তাহাকে যখন বাংলা সরকারের ১৯৩১-৩২ সালের প্রশাসনিক রিপোর্ট "বস্তুত একটি প্রতি-সরকার সংগঠনের সূত্রপাত করা হইয়াছিল" বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি বাংলা সরকার কোন্ ভয়ে ভীত ছিলেন এবং এখনো আছেন।

১৯৩৪ সালের পরে ওই জেলার অফিসারগণ ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে তাহারা পুরাপুরি এই জেলার কংগ্রেস আন্দোলন দমন করিয়াছেন এই মর্মে গোপন বিবরণ চলাচল করিতেছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

নির্বাচনে হস্তক্ষেপ

আপনারা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন যে এই আবহাওয়ায় কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী অভিযান চালানো কত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আইন সভার কংগ্রেসী সদস্যগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে তাহারা প্রথম যখন নির্বাচনী অভিযান শুরু করেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে সভায় লোক জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণকে কখনো গোপনে, কখনো বা প্রকাশ্যে রাজকর্মচারী-গণ বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের সভায় অংশগ্রহণ সন্ত্রাসবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের সামিল হইবে এবং কংগ্রেস সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের একটি অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। কেবলমাত্র দ্বিতীয় দিনের নির্বাচনী অভিযানে গ্রামবাসীরা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া সভাগুলিতে যোগদানের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন এবং

সবগুলিতে না হইলেও অধিকাংশ সভায় এক বা একাধিক রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অন্তত মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে আমি বলিতে চাই যে, নির্বাচনে রাজকর্মচারীদের পক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে ইহা জানিয়াছি যে, এমন-কি প্রথম দিনের ভোট গ্রহণের পর জেলা অফিসারগণ প্রধান কর্মকেন্দ্রে এই মর্মে গোপন বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন যে, কংগ্রেস প্রার্থীগণকে 'ধরাশায়ী' করা হইয়াছে। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে রাজকর্মচারীদের জ্ঞান যে কত সামান্য ছিল এই বিবরণগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ দ্বিতীয় দিনের ভোট গ্রহণের পর যখন ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল যে একমাত্র একটি আসনে (তহশিলী সম্প্রদায়) ছাড়া অন্য সব কংগ্রেস প্রার্থী শুধু যে জয়ী হইয়াছেন তাহা নয়, তাহারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী হইয়াছেন (হর্ষধ্বনি)। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জামানত জব্দ হইয়াছে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের শীর্ষে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ। তিনি সত্তর হাজার ভোট পাইয়া এ-প্রদেশেই শুধু রেকর্ড করেন নাই, সম্ভবত সারা ভারতেও রেকর্ড করিয়াছেন।

ইহা স্বাভাবিক যে এই অবস্থায় বাংলার কংগ্রেসকর্মী হিসাবে আমাদের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে মেদিনীপুর শুধু বাংলার গর্বের বস্তু নয়, সারা ভারতের গর্বের বস্তু।

৩১ অক্টোবর ১৯৩৭

প্রতিভাষণ

১০ নভেম্বর ১৯৩৭ টাউন হলে কলিকাতা কর্পোরেশনের **কর্মচারী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত অভ্যর্থনার** প্রত্যুত্তরে ভাষণ।

বন্ধুগণ, আজ সন্ধ্যায় এখানে উপস্থিত হইতে পারায় আমি খুব আনন্দিত। আমি দীর্ঘদিন ধরিয়া কর্পোরেশনের কার্যাবলীর সহিত জড়িত। আমি তাঁহাদেরই একজন, যাঁহারা ১৯২৪ সালে তাঁহার নির্বাচনী অভিযানে দেশবন্ধু দাশের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে কর্পোরেশনের সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কাজেই ইহার প্রতি আমার মমতা আছে। ইহার গৌরবে আমি নিজে গর্ববোধ করি এবং যখন ইহার কার্যাবলীর সমালোচনা করা হয় তখন আমি

বেদনা বোধ করি। আমি সর্বদাই দেশবন্ধু দাশের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি।

কংগ্রেস উচ্চ ও নীচকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে না। আমরা যদি বিশ্বস্তভাবে আমাদের কর্তব্যকর্ম করিয়া যাই, তাহা হইলে ঈশ্বর ও মানুষের চোখে আমরা মহান হইয়া উঠি। দেখিবেন যেন আমরা কেহ কর্তব্যে অবহেলা না করি।

আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন, তবে কেহ আপনাদের বিরোধিতা করিতে পারিবে না এবং কর্পোরেশন আপনাদের দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। অন্যথায় আপনারা অসুবিধার সম্মুখীন হইবেন।

কলিকাতা এমন একটি শহর যেখানে বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়। কর্পোরেশনের উচিত তাহাদের সকলের প্রতি সমান আচরণ করা। ১৯২৪ সাল হইতে কর্পোরেশনের নীতি ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের ও অনগ্রসর শ্রেণীর কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আপনারা যদি ১৯২৪ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে এই বিষয় সম্পর্কে সংখ্যাতত্ত্ব দেখেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আপনাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিবে।

আপনারা একটি ব্যাংক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের কোনো প্রকার সাহায্য করিতে পারিলে আমি নিশ্চয় তাহা করিব।

দেশবাসীর প্রতি

১৮ নভেম্বর ১৯৩৭ ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে প্রচারিত বিবৃতি।

আমি স্বল্পকালীন প্রবাস জীবন যাপনের জন্য আগামীকাল সকালে গভীর বেদনার্ত হৃদয়ে ইউরোপ যাত্রা করিব। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে আমাকে আক্ষরিক অর্থে নিজেকে এই বেদনার ও দুর্দশার পরিস্থিতি হইতে ছিন্ন করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে যে-সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে সেগুলির সম্মুখীন হইবার জন্য দৈহিক সামর্থ্য আমাকে যদি অর্জন করিতে হয়, তাহা হইলে আমি অনন্যোপায়। আমার কংগ্রেসের বন্ধুদের পীড়াপীড়িতেই আমি গত মাসে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা আসিবার

উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আমার ডালহৌসি বাসের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে জনসাধারণ বিশেষভাবে জানেন কী কারণে কলিকাতায় আমার অবস্থান দীর্ঘায়িত করিতে হয়, যাহার ফলে আজ অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের অপরিহার্য শ্রম সহ্য করিতে আমার শরীর সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। আগামীকাল এই গভীর আশা লইয়া আমি যাত্রা করিব যে, নববর্ষের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ সাত বৎসরের ব্যবধানের পর আমার স্বাভাবিক জীবন পুনরারম্ভের মতো দৈহিক সামর্থ্য ফিরিয়া পাইব।

গত মার্চে মুক্তির অব্যবহিত পর আমি আমার প্রথম বক্তব্যে কয়েকটি নীতির উল্লেখ করিয়াছিলাম যেগুলি আমার ভবিষ্যৎ জীবন ও কার্য নিয়ন্ত্রিত করিবে। আমি পুনরায় জোর দিয়া বলিতে চাই যে বাংলা যদি আবার আত্মস্থ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর অনুসারী হইতে হইবে। সর্বোপরি, তাহাকে হিংসার পদ্ধতি পরিত্যাগ ও নিন্দা করিতে হইবে। সুতরাং, যদি আজ গুপ্তগোষ্ঠী ও গোপন কার্যাবলী থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলিকেও চিরদিনের মতো বিলুপ্ত করিতে হইবে। আমি গভীরভাবে আশা ও বিশ্বাস করি যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম লইয়া অগ্রসর হইলে আমরা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করিয়া আমাদের সমাজের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিব। যে-সব মুসলমান ও তফশিলী সম্প্রদায়ের সদস্য এখনো কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া আছেন আমি তাঁহাদিগকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আবেদন জানাই। কংগ্রেস দখল করিয়া তাহাকে নিজেদের সংগঠনে পরিণত করা তাঁহাদের কাজ। তাঁহারা যদি তাহা করেন, তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে পিছনের সারিতে স্থান গ্রহণ করিব।

অহিংসার পরিমণ্ডল

বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের ও দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিব বন্দীদের মুক্তির জন্য মহাত্মাজী যে প্রয়াস করিতেছেন তাহার চূড়ান্ত ফল কী হইবে এই অবস্থায় তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা মহাত্মাজীকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানাইয়া যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি তাহার প্রতি আমি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমি জনসাধারণকে আস্থায় লইয়া বলিতে চাই যে, মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম যে অহিংসার দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলার আবহাওয়া ইতিপূর্বে এত অনুকূল আর কখনো হয় নাই। আমি গভীরভাবে

আশা ও বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে এই আবহাওয়া নষ্ট করার মতো কোনো কিছু বলা বা করা হইবে না। আমাদের এই অহিংসার পরিমণ্ডল অক্ষুণ্ণ রাখার সামর্থ্যের উপর বিনা বিচারে আটক বন্দীদের ও রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির জন্য যে প্রয়াস করা হইয়াছে এবং করা হইবে তাহার সাফল্য নির্ভর করিবে।

জনগণ-কর্তৃক রচিত সংবিধান

লণ্ডনে রয়টারের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বক্তব্য

আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ও জনসাধারণ-কর্তৃক রচিত একটি সংবিধান দাবি করি। বিরোধের জন্যই কেহ বিরোধ করিতে চায় না এবং যে আপস-রফায় আমাদের দাবিগুলি স্বীকৃত হইবে সে আপস-রফা নিঃসন্দেহে গৃহীত হইবে।

মন্ত্রীরা ভালোভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের সন্তুষ্ট করার মতো যথেষ্ট কৃতিত্ব তাঁহারা দেখান নাই। তাঁহাদের কাজের ফলের বিচার নির্বিশেষে তাঁহারা স্থায়ীভাবে সরকারী পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ ভাবা ভুল। সম্ভবত এক বৎসর পরে একটা হিসাব-নিকাশ করা হইবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশাবাদী নই। আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে ১৯৩০ সালের দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি হইবে না— কিন্তু সেরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সব-কিছুই নির্ভর করে ব্রিটিশ সরকারের উপর।

ভারত চায় নিজের সংবিধান নিজে রচনা করিতে এবং সরকার সে দাবি মানিয়া লইলে ভারত ও ব্রিটেন সর্বোত্তম বন্ধু রূপে কেন থাকিবে না তাহার কোনো কারণ নাই।

ভারতকে তাহার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা দিলে সে ব্রিটেনের সহিত সর্বাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কেন করিবে না তাহার কোনো হেতু নাই। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত প্রভুত্বের লেশ মাত্র থাকিবে ততদিন বিক্ষোভও থাকিবে।

ভারতের জনসাধারণ তাঁহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ না পাইলে নূতন চুক্তি কার্যকরী হইতে পারিবে না। ইহাকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে এবং ইহা যদি ভারতের স্বার্থানুকূল না হয় তাহা হইলে কংগ্রেস ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে।

ভারত যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় তাহার দাবি

ARB
KLM
ONINKLYKE LUCH
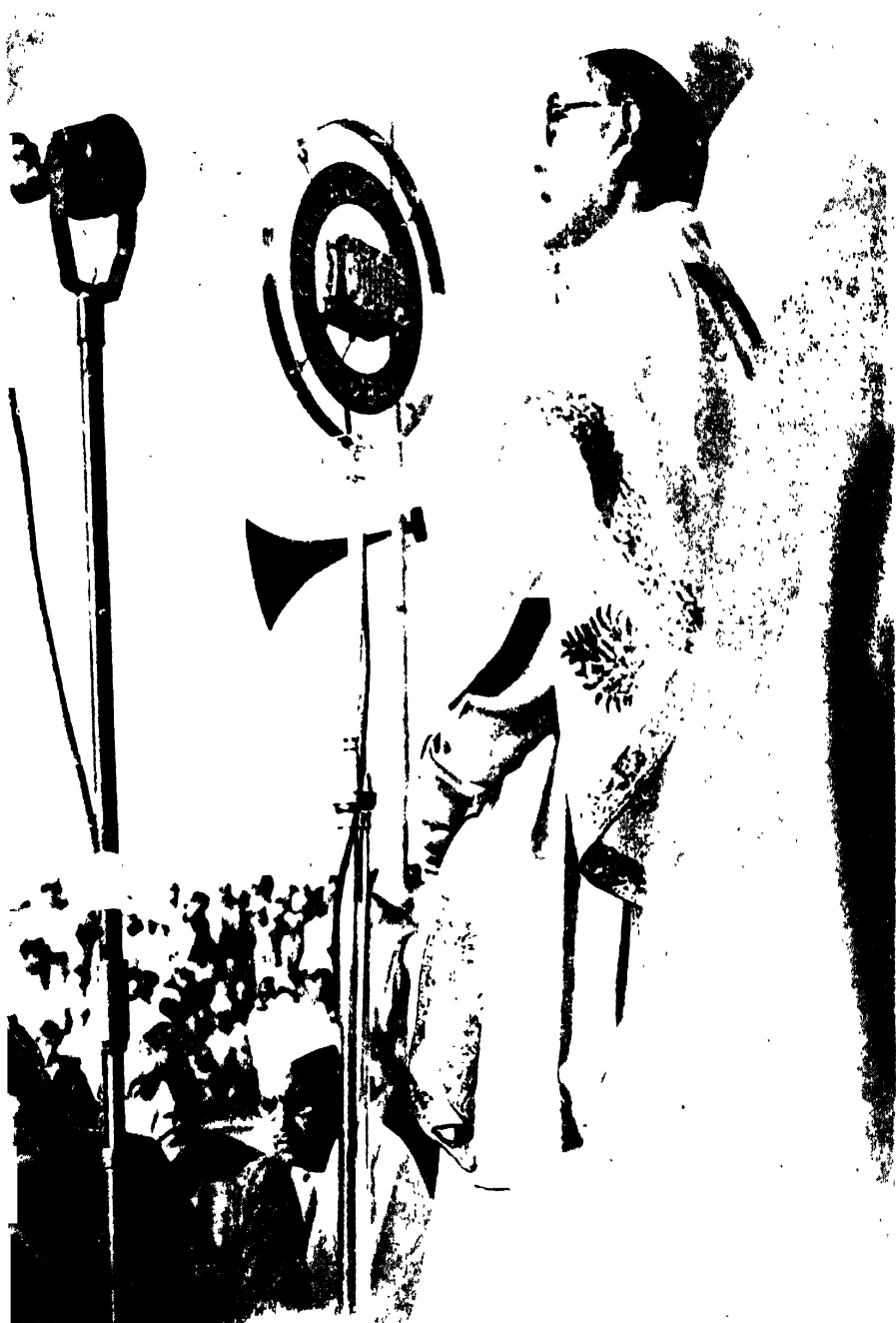
হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ভাষণদানরত। ১৯৩৮

অধিকতর সুবিবেচনা পাইত। কারণ ভারতের হাতে তখন প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় থাকিত। উদাহরণস্বরূপ জাঞ্জিবারের লবঙ্গশিল্পের ক্ষেত্রে ভারত অন্তত নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করিতে পারিত এবং তাহার ফলে কর্তৃপক্ষ অধিকতর যুক্তিবাদী হইয়া উঠিতেন।

ব্রিটিশ শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিক দল সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণের মোহভঙ্গ হইয়াছিল। ভারতের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া বলার কাজ চলা উচিত। অন্য কোনো কারণে না হইলেও ইহাতে ভারতের স্বার্থ-প্রচারের জন্য যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয় সেজন্যই ইহা করা উচিত। পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন হইতে দেওয়াই ভারতের রাজনৈতিক মর্যাদাহীনতার অন্যতম কারণ।

গত দুই কিংবা তিন শতাব্দী কালে ভারত যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়িত তাহা হইলে সে পাশ্চাত্য আক্রমণ প্রতিরোধে অধিকতর সক্ষম হইত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বহির্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষাব কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোথায় কী ঘটিতেছে তাহা জানা ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এবার আমি কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কৃতিত্বের কথা বলি এবং তাঁহারা কৃষি, কারাগার, শিক্ষা সংস্কার, জনস্বাস্থ্য ও মাদক-নিরোধের ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিই। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কর্মসূচী রূপায়ণে আর্থিক অসুবিধাগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩ জানুয়ারি ১৯৩৮

হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি

রয়টারের নিকট হইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী-কর্তৃক ঘোষিত হরিপুরায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনের সংবাদ পাইয়া পরিবেশিত বক্তব্য।

আমি কোনোভাবে এই বিরাট সম্মান পাইবার যোগ্য, ইহা ভাবিবার মতো ধৃষ্টতা আমার নাই। যে যুবশক্তি ভারতের জাতীয় সংগ্রামের দুরন্ত আঘাতের মুখোমুখি হইয়াছে, তাহাদের প্রতি সম্মানের স্বীকৃতিরূপেই আমি ইহাকে গ্রহণ করিয়াছি। আগামী অধিবেশনে কংগ্রেস কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে কিংবা তাহার পরেই বা কী হইবে তাহা লইয়া পূর্বাহ্নে জল্পনা-কল্পনা সংগত হইবে না ; কিন্তু ইহা সর্ব-

বাদীসম্মত যে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সকল শক্তিসমূহকে একটি ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং স্বাধীনতার যে সংগ্রাম এখনো তাহার লক্ষ্য হইতে দূরে রহিয়াছে, তাহা চালাইয়া যাইতে হইবে। ভারতকে যে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি পরিমাণে বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে— এ বিষয়েও সকলের মতৈক্য হইবে। আর যাহাই হউক, ভারতের সমস্যা মূলত বিশ্ব-সমস্যা। বিদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর কেবল ভারতের মুক্তিই নির্ভর করিবে না, বেদনার্ত মানবতার মুক্তিও নির্ভর করিবে। আমি আশা ও প্রার্থনা করি যে আমাদের দেশবাসীদের সহানুভূতি ও সমর্থনে আমি অতীতের তুলনায় আরো ভালভাবে মাতৃভূমির সেবা করিতে পারিব।

১৮ জানুয়ারি ১৯৩৮

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তিরোধান

করাচীতে অবতরণের পর প্রদত্ত বিবৃতি।

আমি করাচীতে অবতরণ করিবার পরেই ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের সম্রাট ড. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধানের দুঃখজনক সংবাদ পাইলাম। যদিও তিনি কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন, তিনি যে এত শীঘ্র আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন তাহা আমি কখনো ভাবি নাই। শেষবার যখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখন তাঁহাকে এত সুস্থ, সবল ও উৎসাহে ভরপুর দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার জীবনাবসান যে এত নিকটবর্তী তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। শরৎবাবু বাংলা সাহিত্যে যে আসন দখল করিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘদিন অপূর্ণ থাকিবে। বাংলার এমন কোনো গৃহ নাই যেখানে তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নন। নরনারী, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ। আমার আরো বিশ্বাস যে অনুবাদের মাধ্যমে তাঁহার রচনাবলী যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছেও তিনি বিশেষ জনপ্রিয়।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইলাম বলিয়া আমি শোক প্রকাশ করিতেছি না, আমি শোক প্রকাশ করিতেছি তিনি বাংলা কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ ছিলেন বলিয়া। অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ হইতে

তিনি এই প্রদেশে কংগ্রেসের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি বিশেষ করিয়া অনুভূত হইবে হাওড়া জেলায়, যেখানে তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সেবা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমার শোক আরো তীব্র এই কারণে যে, তাঁহার সহিত আমার গভীর সৌহার্দ্যের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমি যে ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হইলাম তাহা চিরদিনের মতো অপূরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই উপলক্ষে আমি বাংলার আর-একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করি। তিনি শিক্ষা প্রসারে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মহান শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ-সংস্কারক হিসাবে অধ্যক্ষ মৈত্রের জীবন আমাদের দেশবাসীদের নিকট স্থায়ী প্রেরণার উৎস হওয়া উচিত।

২০ জানুয়ারি ১৯৩৮

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ স্বাধীনতাদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।

আমরা সকলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য সমবেত হইয়াছি। এই দিনে আমাদের নূতন করিয়া ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্পের জন্য সেই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত, প্রতি বৎসর এই দিনটি পালন করা আবশ্যক। আমরা জানি যে আমরা এখনো স্বাধীন জাতি হইতে পারি নাই, আমরা জানি ভারত এখনো পরাধীন এবং এখনো আমাদিগকে দুর্গম পথে বিপজ্জনক অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে। ইহা সব কিছুই আমরা জানি এবং সেইজন্যই এই দিনে হাজারে হাজারে নরনারী একত্রিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প পুনর্গ্রহণ করা আবশ্যক। আপনাদের নিকট 'স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য' পাঠ করিবার আগে আমি বন্ধুগণের অনুরোধে এই বিরাট জন-সমাবেশে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। সে কথাগুলি হইল আমাদের আশার কথা— হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত বাণী।

ভারত এবং পৃথিবী

ভারতে পরাধীনতার মধ্যে বাস করিয়া আপনারা যখন আপনাদের বিভিন্নতা ও অনৈক্যের কথা ভাবেন এবং একই সংগে ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমারোহ ও শক্তির দিকে তাকান, তখন সাময়িকভাবে আপনাদের হৃদয় সম্ভবত এই হতাশা ও সন্দেহের মেঘে আচ্ছন্ন হয় যে, আপনাদের পক্ষে কী করিয়া এই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রাম করা সম্ভব হইবে। কিন্তু আপনারা আজ বিশ্বের আন্দোলনের দিকে তাকাইয়া দেখুন, বিদেশে সর্বত্র কী ঘটিতেছে না ঘটিতেছে এবং এমন-কি ভারতে কী ঘটিতেছে তাহাও দেখুন। ইহা করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যতটা শক্তিশালী মনে হয়, ততটা শক্তিশালী আজ সে নয় অথবা ভারতীয়রা নিজেদের যতটা অসহায় মনে করেন ততটা অসহায়ও তাঁহারা নন। ইহা আমার কল্পনা মাত্র নয়। যিনিই বাস্তব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিষয়টি বিচার করিয়া দেখিবেন তিনিই এ কথা বলিবেন।

সাম্রাজ্যগুলির ভাগ্য

পৃথিবীর ইতিহাস বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন দেখিয়াছে। বহু সাম্রাজ্য সৃষ্টি হইয়াছিল, নিজেদের প্রভাব ও শক্তি দূরে ও নিকটে বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহার পর ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে এইভাবে খুব প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে। আপনারা রোম, গ্রীস, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া-হাংগেরী ও জারের রাশিয়ার ভাগ্য দেখিয়াছেন। ঐ-সব সাম্রাজ্যের ভাগ্যে যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অমোঘ বিধান অন্যরূপ হইবে কিভাবে? ইহা হইতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাহার সম্প্রসারণের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং এখন তাহার অবক্ষয়ের অধ্যায় শুরু হইয়াছে। আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া আবার বলিতে চাই যে ইহা আমার কল্পনা মাত্র নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি বিচার করিয়া ইহা আমি বলিতেছি।

একটি নূতন সুযোগ

আজ আয়ার্ল্যান্ডে ব্রটিশ প্রভাব কিছু দেখা যায় কি? মিশরের দিকে তাকাইলে আমরা কী দেখি? মহাযুদ্ধের পর আমি যখন প্রথম ইংল্যান্ড গিয়াছিলাম তখন

ওই দেশ পরিদর্শনের সুযোগ আমার হইয়াছিল। তখন সেখানে আমি দেখিয়াছিলাম ব্রিটিশ, ইটালীয় ও ভারতীয় সৈন্যদের। কিন্তু এবার ইউরোপে যাইবার পথে আমি দেখিয়াছিলাম যে সেই পূর্বের মিশর আর নাই। আমি সেখানে বিমান বন্দরে নামিয়া কোনো শ্বেতাঙ্গকে দেখিতে পাই নাই। সেখানে যে-সব কর্মকর্তাদের আমি দেখিয়াছিলাম তাঁহারা সকলেই ছিলেন মিশরীয়। আর ইহা হইতে আমার বুঝিতে দেরি হয় নাই যে, মিশরে নূতন পরিবর্তন আসিয়াছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে মিশর 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' পাইয়াছে। এখনো তাহার পথে কতকগুলি বাধা আছে। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে, কুড়ি বৎসর আগের মিশর ও আজিকার মিশরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সাম্রাজ্যবাদের কুফল

আমাদের নিজেদের দেশ ভারতের অবস্থা আজ কি? ইহা সত্য যে ভারত আজও পরাধীন দেশ। আজ কংগ্রেস এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে ক্ষমতায় আসীন। আর আমরা দেখিতে পাই যে ১৯১৯ সালের ভারত ও আজিকার ভারতের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একটা সময় ছিল যখন স্বাধীন দেশগুলিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিকে ভয়ের দৃষ্টিতে তাকাইত। কিন্তু আজিকার অবস্থা কি? পাশ্চাত্যের দিকে এবং প্রাচ্যের দিকে তাকাইয়া এ কথা কি বলা যায় যে অতীতের মতো ব্রটিশ সাম্রাজ্য আজও জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আমি ১৯১৯ সালে ছাত্র হিসাবে ইংল্যান্ডে গিয়াছিলাম। এবার সেখানে যাইবার পর আমি পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সে পরিবর্তন খুব বড়ো না হইলেও অন্তত কিছু পরিবর্তন তো দেখা গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা আশাবাদী লক্ষণগুলির মধ্যে যেটি ইংল্যান্ডে আমার চোখে বেশি পড়িয়াছিল তাহা এই যে, সেখানকার তরুণতর বংশধররা সাম্রাজ্যবাদের কুফল দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বৃহত্তর বিশ্বের স্বার্থে যেমন নয়, তেমনই ব্রিটিশ জাতির নিজের স্বার্থেও ইহার কোনো ভূমিকা নাই।

অবক্ষয়ের লক্ষণ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিজের সম্প্রসারণের দিনগুলি দেখিয়াছে এবং এখন ইহা অবক্ষয়ের লক্ষণগুলির পরিচয় দিতেছে। জারের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু

রুশজাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন আছে। সেখানে তাহারা রাষ্ট্র পুনর্গঠন করিয়াছে এবং রাষ্ট্রকে ইউনিয়ন-অফ-রিপাব্লিকে পরিণত করিয়াছে। জারের আমলে সেখানকার যে বিভিন্ন জাতি-সমূহের উপর অত্যাচার করা হইত এখন তাহারা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। আজ ব্রিটেনের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষেরা মনে করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে কিছু পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। একশ্রেণীর ইংল্যান্ড-বাসী পূর্বে মনে করিতেন যে, ইংরেজরা ভারত ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন দুঃখজনক হইয়া উঠিবে এবং শুধু 'শ্বেত আমলাতন্ত্রের স্থলে বাদামী আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হইবে'। কিন্তু এখন ইংল্যান্ডে এরূপ কথা আমি কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। ইংল্যান্ডে এখন তাঁহারা পরিবর্তনের কথা জানেন। এবার আমি ইংল্যান্ডের জনসাধারণকে বলিয়াছিলাম যে, ভারত যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করে তাহা তাহাদের দেখা উচিত। আমি তাহাদের বলিয়াছিলাম যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ শুধু ভারতের স্বার্থই সিদ্ধি করিবে না, ব্রিটিশ জাতির স্বার্থও সিদ্ধি করিবে। লেনিন বলিয়াছেন যে, 'কতকগুলি জাতিকে দাসত্বে পরিণত করিবার ফলে ইংল্যান্ডে প্রতিক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে' এবং ইংল্যান্ড অন্যান্য জাতিকে শোষণ করা বন্ধ না করিলে সেখানে সমাজতন্ত্র আসিতে পারিবে না। ভারত এবং অন্যান্য দেশ স্বাধীনতা পাইলে তখন ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্র আসিবে। আমি এ কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে ইংরেজ জাতির সহিত ভারতের কোনো বিরোধ নাই— কিন্তু তাহাদের সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ভারতীয়রা মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে স্বাধীনতার জন্য অহিংস সংগ্রাম চালাইবার মন্ত্র শিখিয়াছে। ভারত যেদিন তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিবে, সেদিন 'পূর্ণ স্বরাজ' বা পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে, যেদিন ইংরাজদের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, সেইদিনই শুধু সে ইংরাজ জাতির সহিত সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে।

কর্মীদের প্রতি পরামর্শ

আমি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বাংলা সর্বদা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

বাংলা সেই স্থান দখল করিয়া থাকুক ইহাই আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছা। বাংলার পক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতিতে এই সংগ্রাম পরিচালনায় আমাদের ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। আজিকার নেতারা যদি দুর্বল ও অযোগ্য হন, তাহা হইলে তরুণতর

বংশধরেরা আরো বেশি উৎসাহ ও দৃঢ়সংকল্পে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। আমার কোনো সন্দেহ নাই যে ভারত স্বাধীন হইবে।

আজ ভারতীয় আন্দোলন যে গণ-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে— এ বিষয়ে কাহারো কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এখনো অনেক নরনারী কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া আছেন। বাংলার কংগ্রেস কর্মীগণকে আমি এ কথা উপলব্ধি করিতে বলি যে তাঁহাদের কর্তব্য হইল বহু সংখ্যায় নরনারীদের কংগ্রেসের মধ্যে আনা। যদি আমার মতো মানুষকে তাঁহারা এ কাজে বাধা স্বরূপ মনে করেন, তাহা হইলে সে বাধা অপসারণ করা উচিত। মুসলমানদের ও তফশিলী সম্প্রদায়ের সদস্যদের বহু সংখ্যায় কংগ্রেসের পতাকাতলে আনার সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। ইহা কঠিন কাজ হইলেও তাঁহাদের ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সেজন্য তাঁহাদের সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাঁহারা যদি ইহা করিতে পারেন, তাঁহারা যদি কংগ্রেসের পতাকাতলে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে 'পূর্ণ স্বরাজ' অর্জন খুবই সহজ হইবে। আমরা সকলে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইলে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদীরা আমাদের স্বাধীনতা দিতে ইতস্তত করিবে না। তাহারা দাক্ষিণ্য হিসাবে তাহা দিবে না, তাহারা নিজেদের স্বার্থে তাহা দিতে বাধ্য হইবে।

বিঠলভাই প্যাটেল

বিঠলনগরে জুনধাচকে বিঠলভাই প্যাটেলের সুবৃহৎ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন।

যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করিয়াছে তাহা এই যে যখন তিনি (বিঠলভাই) তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন তখনো ভারতের স্বাধীনতা ও কিভাবে তাহার কাজ ত্বরান্বিত করা যায়— ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোনো চিন্তা ছিল না।... বিঠলভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বাণী বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাঁহার স্বপ্ন বাঁচিয়া রহিয়াছে। আমরা তাঁহার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। সুতরাং, তিনি সারা জীবন সাহসিকতার সহিত যে কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন, আসুন, আমরা তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সংকল্প

গ্রহণ করি এবং আসুন, আমরা ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্ম ও প্রয়াস অব্যাহত রাখিবার সংকল্প গ্রহণ করি।

পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিতে আমন্ত্রিত হইয়া আমি বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছি। এই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহার জীবিতকালে তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য দাবি করিতে পারেন— এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসে। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল গঠনের পর তাঁহার সহিত আমার কয়েকবার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অন্তরঙ্গভাবে জানিবার সুযোগও আমি পাইয়াছিলাম। আপনাদের কাছে ইহা হয়তো অদ্ভুত মনে হইবে যে তাঁহার জীবনের শেষ ছয় মাস, যখন তিনি ইউরোপে ছিলেন, তখনই তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের যে-সব তথ্য সর্বজনবিদিত সেগুলি সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা করিয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না। ইউরোপে অতিবাহিত তাঁহার জীবনের অন্তিম মাসের বিবরণের মধ্যে আমি নিজেকে সীমিত রাখিব।

১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁহার কারাদণ্ডের পর কারাগারে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িলে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরে স্বাস্থ্যের উন্নতি বোধ করিলে তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবি প্রচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিনের জন্য ভ্রমণে যান। তিন মাসে ঝড়ের গতিতে ভ্রমণের সময় তিনি আমেরিকায় কম পক্ষে আশিটি সভায় ভাষণ দিয়াছিলেন।

স্পষ্টতই তাঁহার দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে এই পরিশ্রম অত্যধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং যখন তিনি ইংল্যান্ডে আসিয়া পেঁাছিয়াছিলেন তখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি ফিরিবার পথে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সহিত তাঁহার পরিচয় নূতনভাবে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ও কতিপয় আইরিশ বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি যে ভারতীয় ও আইরিশ স্বাধীনতা লীগ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কাজে উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে আয়ার্ল্যান্ড পরিদর্শন করিয়াছিলেন। লন্ডন হইতে তিনি ভিয়েনায় যান এবং সেখানে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞরা বিধান দেন যে তাঁহার গুরুতর হৃদ্‌রোগ হইয়াছে। তাঁহাকে এক স্বাস্থ্যনিবাস হইতে অন্য স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তর করা হয়। তিনি কিছুটা ভালো হইবামাত্র ভারত সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে

এবং ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতির জন্য জাতিসঙ্ঘের সংগঠনটির সহায়তা গ্রহণের পথ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ভিয়েনা হইতে জেনেভা পর্যন্ত দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি যখন জেনেভায় পৌঁছান তখন আবার গুরুতর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে নিকটস্থ একটি স্যানাটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাঁহাকে সেখানে সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থায় রাখা হয়। এক মাসের অধিককাল তাঁহার জীবন সুতায় ঝুলিতে থাকে বলা যায়। কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসিত যখন মনে হইত যে তিনি বিপদ কাটাইয়া উঠিতেছেন। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিবার মতো তাঁহার দৈহিক শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহার জীবনের এই সংকটকালে দিবা-রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দোদুল্যমান একজন মহান দেশপ্রেমিকের সঙ্গলাভের ইহা আমার জীবনের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। যখনই যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হইত তখনই তিনি ভারতের মুক্তির জন্য এবং বিশেষ করিয়া বৈদেশিক প্রচারকার্যের জন্য ভাবী কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা-ভাবনার উল্লেখ করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ সম্পর্কে আমার সামান্যতম ধারণাও ছিল না। শুধু যখন তিনি তাঁহার উইল আমাকে দেখাইয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি আমাকে তাঁহার চিন্তা-ভাবনা রূপায়ণের জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন একমাত্র তখনই আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ এবং আমার উপর তাঁহার আস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই স্নেহ ও আস্থায় আমি কতটা বিচলিত হইয়াছিলাম তাহা আমি আপনাদের বুঝাইতে পারিব না।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন।

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে জনজীবনের বৃদ্ধি ও স্বাধীনতার দাবি বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন সমস্যাবলী উদ্ভূত হইতেছে এবং নূতন বিরোধ দেখা দিতেছে। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেস তাহার নীতি নূতন করিয়া স্থির করিয়াছে। ভারতের অবশিষ্ট অংশের মতো দেশীয় রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেস একই রাজনৈতিক,

সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতীক, এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অখণ্ড ও অবিভাজ্য অংশ বলিয়া মনে করে। যে পূর্ণ স্বরাজ অথবা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেশীয় রাজ্যগুলিসহ সমগ্র ভারতের লক্ষ্য, ভারতের অখণ্ডতা ও ঐক্যের জন্য যেমন পরাধীনতার আমলে ইহা বজায় রাখা হইয়াছে তেমনই স্বাধীনতার আমলেও তাহা বজায় রাখিতে হইবে। যে ধরনের ফেডারেশন কংগ্রেসের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য, তাহাতে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবশিষ্ট অংশের মতো সমপরিমাণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া স্বাধীন ইউনিট রূপে অংশগ্রহণ করিবে। সুতরাং কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলিতে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সুনিশ্চিতি চায় এবং বহু দেশীয় রাজ্য বর্তমান অনগ্রসর অবস্থা, স্বাধীনতার চরম অভাব এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অবদমনের নিন্দা করে। কংগ্রেস মনে করে যে দেশীয় রাজ্যগুলিতে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করিবার অধিকার ও দাবি তাহার আছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে এই উদ্দেশ্যে অধিকতর কার্যকরভাবে কাজ করার মতো পরিস্থিতি কংগ্রেসের নাই। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকেরা কিংবা তাঁহাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে অগণিত বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের কাজ ব্যাহত করে। ইহার নাম ও মহান মর্যাদা দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের মনে যে আশা ও প্রতিশ্রুতির সৃষ্টি করে তাহা অবিলম্বে পরিপূরণের সুযোগ দেখা না যাওয়ায়, তাহার ফলে হতাশার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস-স্থাপিত স্থানীয় কমিটিগুলি কার্যকরভাবে দায়িত্ব-পালন করিতে পারিবে না কিংবা জাতীয় পতাকার অমর্যাদা কংগ্রেস সহ্য করিবে—ইহা কংগ্রেসের সম্মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আশা সঞ্চারিত হইলে তাহা রক্ষার ব্যবস্থা কিংবা কার্যকর সাহায্য দিতে কংগ্রেসের অসামর্থ্য, দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের মনে অসহায়তাবোধ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত করে।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে ও ভারতের অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন অবস্থার প্রাবল্য হেতু কংগ্রেসের সাধারণ নীতি প্রায়শই দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে অনুপযুক্ত হয় এবং ফলে দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিবারিত কিংবা ব্যাহত হইতে পারে। এই জাতীয় আন্দোলনগুলি দেশীয় রাজ্যের সাধারণের নিকট হইতে যদি শক্তি সংগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে স্বয়ং-নির্ভরতা সৃষ্টি করে ও সেই-সব স্থানের অবস্থার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া চলে এবং যদি বাহিরের সাহায্য ও সহায়তার উপর কিংবা কংগ্রেসের নামের

মর্যাদার উপর নির্ভর না করে তাহা হইলে ইহাদের আরো দ্রুত বৃদ্ধির ও বিস্তৃততর ভিত্তিতে গঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কংগ্রেস এই জাতীয় আন্দোলনকে স্বাগত জানায় ; কিন্তু সহজাত কারণে ও বর্তমান অবস্থায় স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের উপর অবশ্যই বর্তাইবে। শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে পরিচালিত এই ধরনের আন্দোলনে কংগ্রেসের সদিচ্ছা ও সমর্থন সর্বদাই প্রসারিত হইবে ; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেই সংগঠনের সাহায্য অপরিহার্যভাবে নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতির রূপ লইবে। ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসকর্মীদের অবশ্য নিজ নিজ দায়িত্বে আরো সহায়তা দানের স্বাধীনতা থাকিবে। এইভাবে কংগ্রেস সংগঠনকে না জড়াইয়া এবং বাহ্য কোনো কারণ দ্বারা ব্যাহত না হইয়া সংগ্রাম ব্যাপকতর হইতে পারে।

সুতরাং বর্তমানে কংগ্রেস এই নির্দেশ দেয় যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে যেন কোনো কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত না হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম যেন কংগ্রেসের নামে পরিচালিত না হয়। এই উদ্দেশ্যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বতন্ত্র সংগঠন আরম্ভ করিতে হইবে কিংবা যেখানে এরূপ সংগঠন পূর্ব হইতে রহিয়াছে তাহার কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণ অবশ্য কংগ্রেসের প্রাথমিক কিংবা নির্বাচিত সদস্য হইতে পারেন— তবে তাঁহারা যে কমিটির সদস্য হইবেন সে কমিটির অবস্থিতি অবশ্যই দেশীয় রাজ্যের বাহিরে হইবে। কংগ্রেস তাঁহাদের সহিত একত্ববোধ, তাঁহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ও সদাসতর্ক আগ্রহ এবং সহানুভূতি সম্বন্ধে দেশীয় রাজের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতে চায়। কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে তাঁহাদের মুক্তির দিন সুদূরে নয়।

বর্তমানে যে-কোনো দেশীয় রাজ্যে যে কংগ্রেস কমিটিগুলি কাজ করিতেছে সেগুলির প্রতিটি সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির বিচার-বিবেচনা করা উচিত এবং সেগুলি কাজ চালাইবে কিনা ও যদি চালায় তাহা হইলে এই প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কিভাবে কাজ চালাইবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া উচিত।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

অভিভাষণ : হরিপুরা অধিবেশন

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ হারপুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ।

আপনারা আমাকে আগামী বৎসরের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করিয়া যে সম্মান দেখাইয়াছেন আমি সে সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন। আমি কোনোপ্রকারে এরূপ মহান সম্মানলাভের যোগ্য এ কথা চিন্তা করার মতো উদ্ধত আমি নই। আমি ইহাকে আপনাদের উদারতার নিদর্শন এবং আমাদের দেশের যুবসমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের জাতীয় সংগ্রামে যুবসমাজের সম্মিলিত অবদান ব্যতীত আমরা আজ যেখানে আছি সেখানে থাকিতাম না। ভীতি এবং শিহরণবোধ লইয়া আমি যে মঞ্চে আরোহণ করিতেছি সে মঞ্চ ইতিপূর্বে আমাদের 'মাতৃভূমি'র সর্বাধিক খ্যাতি-সম্পন্ন পুত্র-কন্যাদের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। আমার অসংখ্য ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া আমি শুধু এই আশা ও প্রার্থনা করিতে পারি যে আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থনের সাহায্যে যে উচ্চপদ পূরণের জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন সেই উচ্চপদের প্রতি সামান্য পরিমাণেও আমি সুবিচার করিতে সমর্থ হইব।

সর্বপ্রথমে শ্রীমতী স্বরূপরানী নেহরু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ড. শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করিয়া আপনাদের অনুভূতিকে আমি কি মূর্ত করিতে পারি? শ্রীমতী স্বরূপরানী নেহরু আমাদের কাছে শুধু পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর যোগ্যা সহধর্মিণী এবং পণ্ডিত জওহর-লাল নেহরুর শ্রদ্ধেয়া জননী ছিলেন না, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে-পরিমাণ নির্যাতন ভোগ, ত্যাগ স্বীকার এবং সেবা করিয়াছেন যে-কোনো ব্যক্তি সেজন্য গর্ববোধ করিতে পারিতেন। সহকর্মী হিসাবে আমরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি এবং পণ্ডিত নেহরু ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমাদের হৃদয়ানুভূত সমবেদনা জানাই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান জগতে সর্বপ্রথম সম্মানিত আসন আনিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট ভারত সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকিবে। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আচার্য জগদীশ, শুধু বিজ্ঞানের জন্যই নহে, ভারতের জন্যও নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারত তাহা

জানে এবং সেজন্য কৃতজ্ঞ। আমরা লেডী বসুকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ড. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে ভারত তাহার সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদের অন্যতমকে হারাইয়াছে। বাংলায় বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার নাম ছিল প্রতিটি গৃহে পরিচিত এবং ভারতের সাহিত্যজগতেও তাহা কম পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু শরৎবাবু সাহিত্যিক হিসাবে মহান হইলেও তিনি সম্ভবত মহত্তর ছিলেন দেশপ্রেমিক হিসাবে। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা কংগ্রেস আজ নিঃসন্দেহে দীনতর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের অকৃত্রিম সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আরো অগ্রসর হইবার পূর্বে গত বৎসর ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর হইতে যাঁহারা দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি আমার মস্তক অবনত করা কর্তব্য মনে করি। আমি বিশেষ করিয়া তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিতে চাই যাঁহারা কারাগারে কিংবা অন্তরীণ অবস্থায় কিংবা অন্তরীণ অবস্থা হইতে মুক্তির পরেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। আমি বিশেষ করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র মুন্সীর নাম উল্লেখ করি। তিনি এই সেদিন অনশন ধর্মঘটের ফলে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমার অনুভূতি এখনো এত শোকদীর্ণ যে এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার সামর্থ্য আমার নাই। আমি শুধু আপনাদের এই প্রশ্নই করিতে চাই যে 'ডেনমার্ক রাজ্যে কিছু গলিত' অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে কিনা যাহার ফলে যতীন দাস, সর্দার মহাবীর সিং, রামকৃষ্ণ নমদাস, মোহিতমোহন মৈত্র, হরেন্দ্র মুন্সী এবং অন্যান্যদের মতো উজ্জ্বল ও প্রতিশ্রুতিশীল মানুষেরা বাঁচিয়া না থাকিয়া মৃত্যুবরণের আগ্রহ বোধ করেন।

মানুষের ইতিহাসের সমগ্র বিশাল দৃশ্য যদি আমরা এক নজরে দেখি তাহা হইলে প্রথমে যাহা আমাদের চোখে পড়ে তাহা হইল সাম্রাজ্যগুলির উত্থান ও পতন। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্যগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্প্রসারণের পদ্ধতির মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছিয়া ক্রমশ তুচ্ছতায় পর্যবসিত হইয়াছে ও সময় সময় বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালের রোমকসাম্রাজ্য ও আধুনিক যুগের তুরস্ক ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য এই বিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মৌর্য, গুপ্ত ও মোগলসাম্রাজ্য— ভারতের এই সাম্রাজ্যগুলিও এই বিধানের ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাসের এই-সকল বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেহ কি দুঃসাহসী হইয়া এ

কথা বলিতে পারেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভিন্ন ধরনের নিয়তি অপেক্ষা করিয়া আছে? সেই সাম্রাজ্য এখন ইতিহাসের এক সংকটপূর্ণ চৌমাথায় দাঁড়াইয়া আছে। হয় ইহাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যের পথে যাইতে হইবে নয়তো ইহা নিজেকে স্বাধীন জাতিগুলির একটি ফেডারেশনে পরিণত করিবে। এই দুইটির যে-কোনো পথ ইহার নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে। ১৯১৭ সালে জারের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে জন্ম নিয়াছিল ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক্স। এখনো রাশিয়ার ইতিহাস হইতে গ্রেট-ব্রিটেনের শিক্ষা গ্রহণের সময় আছে। সে কি তাহা করিবে?

রাজনীতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটা বর্ণসংকর বস্তু। ইহা স্বায়ত্ত-শাসনকারী দেশ, আংশিকভাবে স্বায়ত্ত-শাসনকারী দেশ ও স্বৈরতন্ত্রশাসিত উপনিবেশগুলির একটা অদ্ভুত সমাহার। সাংবিধানিক কৌশল ও মানবীয় উদ্ভাবন শক্তি এই সমাহারকে কিছু সময়ের জন্য চাড়া দিয়া রাখিতে পারে কিন্তু চিরদিনের মতো তাহা পারিবে না। যদি যথাসময়ে আভ্যন্তরীণ বৈষম্যগুলি দূর করা না হয় তাহা হইলে বাহিরের চাপ ছাড়াও নিজের ভারেই সাম্রাজ্যটি নিশ্চয় ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি একটি বলিষ্ঠ প্রয়াসে নিজেকে স্বাধীন জাতি-গুলির একটি ফেডারেশনে পরিণত করিতে পারিবে? এ প্রশ্নের জবাব ব্রিটিশ জনসাধারণই দিতে পারেন। একটা বিষয় অবশ্য সুনিশ্চিত। এই রূপান্তর সম্ভব হইবে একমাত্র ব্রিটিশ জনসাধারণ যদি নিজেদের বাসগৃহগুলিতে স্বাধীন হন— একমাত্র যদি গ্রেটব্রিটেন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গ্রেটব্রিটেনে ধন-তন্ত্রবাদী শাসক শ্রেণীর সহিত বিদেশে উপনিবেশগুলির অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। লেনিন যেমন বহুপূর্বেই বলিয়াছিলেন, 'গ্রেটব্রিটেনে প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে ও তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছে কয়েকটি দেশের দাসত্ব'। উপনিবেশ-গুলি ও বিদেশের নির্ভরশীল দেশগুলিকে শোষণ করার উপায় আছে বলিয়াই ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণী ও বুর্জোয়ারা মুখাতে টিকিয়া আছে। উল্লিখিত দেশ-গুলির মুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রেটব্রিটেনে ধনতন্ত্রবাদী শাসকশ্রেণীর মূলে আঘাত করিবে এবং সে দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পত্তন ত্বরান্বিত করিবে। সুতরাং ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে ঔপনিবেশিকতার অবসান ব্যতীত গ্রেটব্রিটেনে সমাজতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন সম্ভব নয় এবং আমরা যাহারা ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দাসত্বাধীন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি, প্রসঙ্গত ব্রিটিশ জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও সংগ্রাম করিতেছি।

ইহা একটি সুবিদিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে প্রতিটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়িয়া উঠে বিভেদনীতির দ্বারা শাসন পরিচালনার ফলে। কিন্তু পৃথিবীর আর-কোনো সাম্রাজ্য গ্রেটব্রিটেনের মতো সুনিপুণভাবে, এত সুসম্বদ্ধভাবে ও এত নিষ্ঠুরভাবে এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই নীতি অনুসারে, আইরিশ জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিবার পূর্বে, আলস্টারকে আয়ার্ল্যান্ডের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে প্যালেস্টিনীয়দের হাতে কোনো ক্ষমতা অর্পণের পূর্বে আরবগণ হইতে ইহুদীদের বিচ্ছিন্ন করা হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিভাগ প্রয়োজন। বিভাগের একই নীতি অন্য আকারে নূতন ভারতীয় সংবিধানে দেখা দিয়াছে। এখানে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন এক-একটি প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। আর ফেডারেশনের যে পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজাদের সহিত ব্রিটিশ ভারতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্রিত করার ব্যবস্থা আছে। ব্রিটিশ ভারতের বিরোধিতার জন্যই হউক কিংবা দেশীয় রাজাদের যোগদানে অসম্মতির দরুনই হউক, নূতন সংবিধান যদি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে আমার সন্দেহ নাই যে ব্রিটিশের উদ্ভাবনী শক্তি ভারত বিভাগ করার জন্য এবং সেই ভাবে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করার জন্য অন্য কোনো সাংবিধানিক কৌশল খুঁজিয়া বাহির করিবে। সুতরাং হোয়াইট হল হইতে ভারতের জন্য যে-কোনো সংবিধান বাহির হইয়া আসে তাহাকে সর্বাধিক যত্ন ও সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিভেদনীতির দ্বারা শাসনের যদিও স্পষ্ট সুবিধা আছে তবু ইহা শাসকশক্তির পক্ষে কোনোক্রমে অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। বস্তুত ইহা নূতন সমস্যা ও নূতন জটিলতা সৃষ্টি করে। মনে হয় যে গ্রেটব্রিটেন তাহার বিভেদনীতির দ্বারা শাসনের পদ্ধতিসঞ্জাত নিজের রাজনৈতিক দ্বৈতনীতির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ভারতে কাহাকে সন্তুষ্ট করিবে— হিন্দুকে, না মুসলমানকে? সে প্যালেস্টাইনে আরবকে, না ইহুদীকে আনুকূল্য প্রদর্শন করিবে— ইরাকে আরবকে, না কুর্দকে খুশি করিবে? মিশরে সে কি রাজা না ওয়াফদের— সে কাহার পক্ষাবলম্বন করিবে? সাম্রাজ্যের বাহিরেও এই দ্বৈতনীতি দেখা যায়। স্পেনের ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ফ্রাঙ্কো ও আইন-সম্মত সরকারের এতো বিকল্পের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত আর ইউরোপীয় রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও জার্মানী সম্বন্ধেও তাহাদের

অনুরূপ দ্বিধা রহিয়াছে। নানা মিশ্র উপাদানে গঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গড়নের প্রত্যক্ষ ফল হইল ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির পরস্পর-বিরোধিতা ও বৈষম্য। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে ইহুদীদের খুশি রাখিতে হয়, কারণ সে ইহুদীদের প্রবল আর্থিক-শক্তিকে অবজ্ঞা করিতে পারে না। অপর পক্ষে, ইন্ডিয়া অফিস ও পররাষ্ট্র দপ্তরকে নিকট প্রাচ্যে ও ভারতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের দরুন আরবদের মন জোগাইতে হয়। একমাত্র যে উপায়ে গ্রেট ব্রিটেন এই ধরনের পরস্পরবিরোধিতা ও বৈষম্যের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে তাহা হইল স্বাধীন জাতিগুলির ফেডারেশনে সাম্রাজ্যের রূপান্তর। সে তাহা করিতে পারিলে ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা সংযোজন করিবে। কিন্তু তাহাতে সে ব্যর্থ হইলে যে বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য ডোবে বলিয়া বলা হয় তাহার ক্রমিক ভাঙনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের শিক্ষা যেন ব্রিটিশ জনগণের উপর ব্যর্থ না হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বর্তমান মুহূর্তে কয়েকটি দিক হইতে চাপে ভুগিতেছে : সাম্রাজ্যের মধ্যে একেবারে পশ্চিমে আছে আয়ার্ল্যান্ড আর একেবারে পূর্বে আছে ভারত। মধ্যভাগে আছে সংলগ্ন মিশর ও ইরাক সহ প্যালেস্টাইন। সাম্রাজ্যের বাহিরে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর চাপ এবং দূর প্রাচ্যে জাপানের চাপ ; এই দুইটি দেশ সমর-প্রবণ, আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী। এই পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছে সোভিয়েট রাশিয়া যাহার অস্তিত্বই প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর মনে ভীতির সঞ্চার করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতদিন এই চাপ ও টানাপোড়েনের সম্মিলিত ফল সহ্য করিতে পারিবে ?

আজ ব্রিটেন নিজেকে আর 'সমুদ্রের অধিপতি' বলিয়া দাবি করিতে পারে না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে বিস্ময়কর অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল তাহা ছিল তাহার নৌশক্তির ফল। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য হিসাবে তাহার অবক্ষয় হইবে, বিশ্বের ইতিহাসে একটি নূতন উপাদানের আবির্ভাবের ফলে—তাহা বিমান-শক্তি। এই নূতন উপাদান, বিমান-শক্তির দরুনই, উদ্ধত ইটালী সাফল্যের সহিত ভূমধ্যসাগরে সর্বশক্তি সন্নিবেশকারী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মুখোমুখি হইতে পারিয়াছিল। ব্রিটেন স্থলে, জলে ও বিমানে ঊর্ধ্বতম সীমা পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জা করিতে পারে। যুদ্ধজাহাজগুলি বোমাবর্ষণের মধ্যে এখনো টিঁকিয়া থাকিতে পারে কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে বিমান-শক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বর্তমানে দূরত্ব মুছিয়া গিয়াছে এবং বিমান-বিধ্বংসী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সত্ত্বেও লন্ডন আজ ইউরোপের যে-কোনো কেন্দ্র হইতে

যে-কোনো বোমাবর্ষণকারী স্কোয়াড্রনের দয়ার উপর নির্ভরশীল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিমান-শক্তি আধুনিক যুদ্ধে বিপ্লব আনিয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতা ধ্বংস করিয়াছে এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্যকে রূঢ়ভাবে নাড়া দিয়াছে। একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কাদায় গড়া পায়ের ন্যায় মারাত্মক দুর্বলতা— ইতিপূর্বে যাহা ধরা পড়ে নাই— পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

বিশ্বশক্তিগুলির এই পারস্পরিক খেলার মধ্যে ভারত পূর্বেকার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। আমাদের এই বিশাল দেশটিতে লোক-সংখ্যা ৩৫ কোটি। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক হইতে আমাদের বিশালতা এ পর্যন্ত দুর্বলতার সূত্র হইয়াছিল। আমরা যদি শুধু ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারি এবং সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের শাসকদের মুখোমুখি হইতে পারি তাহা হইলে আজ ইহা শক্তির সূত্র হইয়া উঠিবে। ভারতীয় ঐক্যের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রথমেই যে কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা এই যে ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দেশ বিভাগ সম্পূর্ণ কৃত্রিম। ভারত এক এবং ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অভিন্ন। আমাদের লক্ষ্য হইল স্বাধীন ভারত এবং আমার অভিমত এই যে, একমাত্র এমন একটি ফেডারেল রিপাব্লিকের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জন করা যাইতে পারে যাহাতে প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় অংশীদার হইয়া উঠিবে। ভারতীয় ভারত বলিয়া পরিচিত দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজারা গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য যে আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন কংগ্রেস বার বার তাহার প্রতি সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে। ইহা হইতে পারে যে বর্তমানে আমাদের হাত এমন পূর্ণ যে দেশীয় রাজ্যগুলিতে আমাদের সহকর্মীদের জন্য আর বেশি কিছু করার উপায় নাই। কিন্তু এমন-কি আজও ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস কর্মীদের দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থ সক্রিয়ভাবে সমর্থনে এবং তাঁহাদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণে কোনো বাধা নাই। কংগ্রেসে আমার মতো অনেকে আছেন যাঁহারা দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের আন্দোলনে কংগ্রেসকে আরো সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিতে চান। আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করি যে নিকট ভবিষ্যতে কংগ্রেসের পক্ষে প্রাগ্রসর পদক্ষেপ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিতে আমাদের সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য তাঁহাদের প্রয়োজন।

ভারতীয় ঐক্যের কথা বলিতে পরবর্তী যে জিনিসটি আমাদের চোখে পড়ে

তাহা হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সমস্যা। কংগ্রেস মাঝে মাঝে এ বিষয়ে তাহার নীতি ঘোষণা করিয়াছে। এ বিষয়ে অক্টোবর ১৯৩৭-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহার কলিকাতা-অধিবেশনে সাম্প্রতিকতম প্রামাণ্য যে ঘোষণা করিয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

"ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেস গুরুত্বের সহিত এবং পুনঃ পুনঃ নিজের নীতি ঘোষণা করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে ইহাদের অধিকার রক্ষা করা এবং এই-সব সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক সম্ভব সুযোগ দান ও জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্ণতম পরিমাণে তাহাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল এমন এক স্বাধীন ও ঐক্যবন্ধ দেশ গড়িয়া তোলা, যেখানে কোনো শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠী কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কিংবা কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের সুবিধার্থে অপর কাহাকেও শোষণ করিতে না পারে এবং যেখানে জাতির সকল উপাদান সাধারণ কল্যাণের জন্য এবং ভারতের জনগণের অগ্রগতির জন্য পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে। সমবেত স্বাধীনতায় ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার এই লক্ষ্যের অর্থ ইহা নয় যে ভারতীয় জীবনের সমৃদ্ধ ধরনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অবদমিত হইবে। নিজের নিজের দক্ষতা ও প্রবণতা অনুসারে অব্যাহতভাবে উন্নতির জন্য ব্যক্তি ও প্রতিটি গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা ও সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ইহা রক্ষা করিতে হইবে।

"এ বিষয়ে সংগ্রামের নীতির অপব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে বলিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই নীতি পুনর্জ্ঞাপনের ইচ্ছা করে। কংগ্রেসের নিজের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—

১. ভারতের প্রতিটি নাগরিকের অবাধ অভিমত প্রকাশের, অবাধ সমিতি ও সমাবেশ গঠনের এবং আইন কিংবা নৈতিকতার বিরোধী নয় এরূপ উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ও বিনা অস্ত্রে সমবেত হইবার অধিকার আছে ;

২. জনজীবনের শৃংখলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রতিটি নাগরিক বিবেকের স্বাধীনতা এবং নিজের ধর্ম প্রচার ও আচরণের স্বাধীনতা ভোগ করিবেন ;

৩. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণমালা রক্ষিত হইবে ;

৪. ধর্ম, জাতি, বর্ণ কিংবা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক আইনের চক্ষে সমান ;

৫. ধর্ম, জাতি, বর্ণ কিংবা স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্নতার দরুন জনজীবনে কর্মনিয়োগে, কোনো পদ বা সম্মানের ব্যাপারে কিংবা কোনো ব্যবসায় বা বৃত্তির অনুসরণে কোনো নাগরিক কোনো অসামর্থ্যের সম্মুখীন হইবেন না ;

৬. রাষ্ট্র কিংবা স্থানীয় অর্থে সংরক্ষিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বে-সরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত কূপ, পুষ্করিণী, পথ, বিদ্যালয় ও জনসাধারণের বিচরণক্ষেত্র সম্বন্ধে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও কর্তব্য আছে :

৭. সকল ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রনিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে ;

৮. ভোটাধিকারের ভিত্তি হইবে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোট ;

৯. সারা ভারতে চলাফেরা করার এবং দেশের যে-কোনো অংশে থাকিবার ও বসবাস করিবার, সম্পত্তি অর্জনের ও যে-কোনো ব্যবসায় কিংবা বৃত্তি অনুসরণের স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিকের আছে এবং ভারতের সকল অংশে মামলা-মোকদ্দমা কিংবা আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা হইবে '

"মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের এই ধারাগুলি হইতে ইহা স্পষ্ট যে বিবেক, ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা চলিবে না এবং সংখ্যাসমতার ও সম্প্রদায় কর্তৃক আরোপিত কোনো প্রকার পরিবর্তনের সম্মুখীন না হইয়া নিজেদের ব্যক্তিগত আইন সংরক্ষণের অধিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আছে।

"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কংগ্রেসের মতামত বার বার কংগ্রেসের প্রস্তাব-গুলিতে পরিষ্কার করিয়া তোলা হইয়াছে এবং গত বৎসর প্রচারিত নির্বাচনী ইস্তাহারে ইহা চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছে। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরোধী এই কারণে যে ইহা জাতীয়তাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং ভারতীয় স্বাধীনতা, ভারতীয় ঐক্য ও উন্নয়নের পরিপন্থী। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কিংবা বাতিল করিতে হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট দলগুলির পারস্পরিক মতৈক্যে করিতে হইবে। পারস্পরিক যুক্তির দ্বারা এইরূপ পরিবর্তন আনার জন্য যে-কোনো সুযোগের সদ্‌ব্যবহারকে কংগ্রেস সর্বদা স্বাগত জানাইয়াছে এবং তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।

"ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে কংগ্রেস তাহাদের সহযোগিতার দ্বারা ও একটি সাধারণ উদ্যোগে এবং ভারতের স্বাধীনতা ও সমগ্র জনগণের উন্নয়নকল্পে একটি সাধারণ লক্ষ্যপূরণের জন্য তাহাদের সদিচ্ছার মাধ্যমে অগ্রসর হইতে চায়।"

এই সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য আমাদের নূতন উদ্যোগ গ্রহণের অনুকূলে সময় আসিয়াছে। আমার বিশ্বাস আমি যখন বলি যে জাতীয়তার মৌলিক নীতিগুলির সহিত সংগতিপূর্ণ ঐক্যমত সমাধানে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে আমরা আপ্রাণ প্রয়াস করিতে আগ্রহান্বিত তখন আমি সকল কংগ্রেসকর্মীর অনুভূতিকে ভাষা দিই। কোন্ পদ্ধতিতে এই সমাধান হওয়া উচিত তাহা বলিতে গেলে আমার পক্ষে খুঁটিনাটি আলোচনা করা আবশ্যক। অতীত সম্মেলনগুলিতেও আলোচনা প্রসংগে ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি হইয়াছে। আমি শুধু ইহাই যোগ করিতে চাই যে কেবল আমাদের সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের উপর জোর দিয়া আমরা সাম্প্রদায়িক বিভাগ ও বিভেদ দূর করিতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্মীয় বিষয়ে বাঁচিয়া থাকা ও বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সমঝোতার নীতি। যদিও যখনই আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রশ্ন চিন্তা করি তখন মুসলমানদের সমস্যাটি বড়ো হইয়া উঠে এবং যদিও আমরা এই সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য উদ্বিগ্ন, তবু এ কথা আমাকে বলিতে হইবে যে কংগ্রেস অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি, বিশেষ করিয়া যাহাদের সংখ্যা খুব বেশি সেই অনুন্নত শ্রেণীগুলির প্রতি ন্যায় বিচার করিতে সমান ইচ্ছুক। আমি ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে বলিতে চাই যে কংগ্রেসী কর্মসূচী রূপায়িত করা হইলে তাহাদের ভয়ের কিছু আছে কিনা তাহা তাদের নিরাসক্তভাবে বিবেচনা করা উচিত। কংগ্রেস সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রস্তুত। কংগ্রেস যদি কর্মসূচী রূপায়ণে সফল হয়, যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তেমনই ভারতীয় জনসাধারণের যে-কোনো শাখা উপকৃত হইবে। ইহা ছাড়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর জাতীয় পুনর্গঠন যদি সমাজতান্ত্রিক ধারায় হয় —তাহা যে হইবে সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই— তাহা হইলে সর্বহারাগণ বিত্তবানদের বিনিময়ে লাভবান হইবেন। অবশ্য ভারতীয় জনসাধারণকে সর্বহারাদের শ্রেণীতে ফেলিতে হয়। শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন থাকে যাহা সংখ্যালঘুদের পক্ষে উদ্বেগের সূত্র হইতে পারে অর্থাৎ ধর্ম এবং ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত সংস্কৃতির দিকটি। এই প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতি হইল বাঁচিয়া থাকা ও বাঁচিতে দেওয়া—বিবেক, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির জন্য সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে পরিপূর্ণ অনহস্তক্ষেপের নীতি। সুতরাং ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিলে মুসলমানদের ভয়ের কিছু নাই। পক্ষান্তরে, তাঁহাদের লাভ করার

মতো সবই আছে। তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীগুলির ধর্মীয় এবং সামাজিক অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে ইহা সুবিদিত যে ১৭ বৎসরে কংগ্রেস সেগুলি দূর করার জন্য চেষ্টার শেষ রাখে নাই এবং আমার কোনো সন্দেহ নাই যে এই অসুবিধাগুলি অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবার দিন আর দূরে নাই।

আমি এখন আগামী বৎসরগুলিতে জাতীয় সংগ্রামে কংগ্রেসের যে পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তাহা এবং ইহার ভূমিকা আলোচনা করিব। আমি পূর্বের তুলনায় আরো বেশি করিয়া বিশ্বাস করি যে এ পদ্ধতি হইবে সত্যাগ্রহ কিংবা এই শব্দটির ব্যাপকতম অর্থে আইন-অমান্য সহ অহিংস অসহযোগ। আমাদের এই পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলা ঠিক হইবে না। আমি যেভাবে বুঝি সত্যাগ্রহ শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মাত্র নয়— ইহা সক্রিয় প্রতিরোধও বটে যদিও সে সক্রিয়তা অবশ্যই অহিংস ধরনের হইবে। আমাদের দেশবাসীদের ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে সত্যাগ্রহ কিংবা অহিংস আন্দোলন আবার আরম্ভ করার প্রয়োজন হইতে পারে। প্রদেশগুলিতে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থারূপে শাসনভার গ্রহণ যেন আমাদিগকে ইহা মনে করিতে উদ্বুদ্ধ না করে যে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পুরাপুরি সাংবিধানিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। এরূপ পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে যে জোরপূর্বক ফেডারেশন প্রচলনের দৃঢ়সংকল্প বিরোধিতা আমাদিগকে আইন অমান্যের অপর একটি বড়ো আন্দোলনে জড়িত করিতে পারে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা দুইটি বিকল্পের একটি গ্রহণ করিতে পারি। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে পারি এবং ইত্যবসরে লক্ষ্যের দিকে যাইবার পথে যে শক্তি করায়ত্ত হয় তাহার ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করিতে পারি। অপর পক্ষে পূর্ণ স্বরাজ কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইতে চালাইতে আমরা আমাদের অবস্থা দৃঢ়-সংবদ্ধ করিয়া তোলার কাজও করিতে পারি। নীতিগতভাবে উভয় বিকল্প সমানভাবে গ্রহণযোগ্য এবং অনুমানমূলক বিবেচনার দ্বারা আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। কিন্তু আমাদের প্রতি পর্যায়ে খুব সযত্নে বিবেচনা করা উচিত যে এই দুইটির মধ্যে কোন্ বিকল্পটি আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে অধিকতর সহায়ক হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতির চূড়ান্ত পর্যায় হইবে ব্রিটিশদের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পর যখন ব্রিটিশ প্রভুত্বের কোনো চিহ্ন থাকিবে না তখন আমরা দুই পক্ষের স্বেচ্ছায় সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আমাদের ভাবী সম্পর্ক নির্ণয় করার অবস্থায় উপনীত হইব।

গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আমাদের ভাবী সম্পর্ক কী হইবে, কী হওয়া উচিত, এত শীঘ্র তাহা বলা সম্ভব নয়। তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিবে স্বয়ং ব্রিটিশ জনগণের মনোভাবের উপর। এ ব্যাপারে আমি বহুলাংশে প্রেসিডেন্ট ডি. ভ্যালেরার মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছি। আয়ারের প্রেসিডেন্টের মতো আমারও বলা উচিত যে ব্রিটিশ জনগণের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নাই। আমরা গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি এবং আমরা তাহার সহিত ভাবী সম্পর্ক স্থির করার পূর্ণতম স্বাধীনতা চাই। কিন্তু আমরা যদি একবার প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পাই তাহা হইলে ব্রিটিশ জনগণের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কেন আমাদের হইবে না, তাহার কোনো কারণ নাই।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের বহু কংগ্রেসসেবীর মনে স্পষ্ট ধারণার অভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমি জানি যে এমন বন্ধুরা আছেন যাঁহারা মনে করেন যে স্বাধীনতা পাইবার পর কংগ্রেসের লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় কংগ্রেস দলের লুপ্ত হইয়া যাওয়া উচিত। যে দল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিবে সেই দল যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সমগ্র কর্মসূচীও বাস্তবে রূপায়িত করিবে। একমাত্র যাঁহারা ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন তাঁহারাই এ কাজ যথোচিতভাবে করিতে পারেন। অন্য লোকেরা যে ক্ষমতা অর্জনের জন্য দায়ী নন তাঁহাদের যদি জোর করিয়া সে ক্ষমতার আসনে বসাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য শক্তি, আস্থা এবং আদর্শবাদের অভাব তাঁহাদের মধ্যে থাকিবে। অতি সংকীর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির কৃতিত্বের তারতম্যের জন্য ইহাই দায়ী।

না, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসদলের আত্মবিলুপ্তির কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পক্ষান্তরে, দলকে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে হইবে, প্রশাসনের দায়িত্ব লইতে হইবে এবং নিজস্ব পুনর্গঠনের কর্মসূচী রূপায়িত করিতে হইবে। একমাত্র তখনই ইহার ভূমিকা সম্পূর্ণ হইবে। ইহা যদি জোর করিয়া আত্মবিলুপ্তি ঘটায় তবে নৈরাজ্য নামিয়া আসিবে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের দিকে তাকাইলে আমরা দেখি যে একমাত্র সেই-সব দেশে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও অব্যাহত অগ্রগতি হইয়াছে যেখানে যে দল ক্ষমতা দখল করিয়াছিল সেই দলই পুনর্গঠনের কাজ হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। আমি জানি যে এই যুক্তি দেখানো হইবে যে এই অবস্থায় রাষ্ট্রের পিছনে একটি দলের অব্যাহত অবস্থিতি সেই রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্রী

রাষ্ট্রে পরিণত করিবে ; কিন্তু আমি এই অভিযোগ স্বীকার করিতে পারি না। রাষ্ট্র সম্ভবত স্বৈরতন্ত্রী হইবে যদি সেখানে রাশিয়া, জার্মানী ও ইটালীর মতো একটি মাত্র দল থাকে । কিন্তু অন্যান্য দল নিষিদ্ধ করার কোনো কারণ নাই । ইহা ছাড়া দলের থাকিবে নিজস্ব গণতান্ত্রিক ভিত্তি— উদাহরণস্বরূপ, নাৎসী পার্টি যেমন 'নেতৃ-নীতি'র ভিত্তিতে গঠিত তেমন নয়। একাধিক দলের অস্তিত্ব এবং কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রকে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার হাত হইতে বাঁচাইবে। উপরন্তু, দলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি, উপর হইতে নেতাদের যাহাতে জনগণের উপর চাপাইয়া না দেওয়া হয় কিন্তু তাঁহারা যাহাতে নীচ হইতে নির্বাচিত হন, তাহা সুনিশ্চিত করে।

যদিও পুনর্গঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা দেওয়া এখন কালোপযোগী নয়, যে-সব নীতি অনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ সামাজিক পুনর্গঠন হওয়া উচিত তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা বিচার-বিবেচনা করিতে পারি। আমার মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ সম্পর্কিত এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কিত আমাদের প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলির কার্যকর সমাধান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই করা যাইতে পারে। আমাদের ভাবী জাতীয় সরকারকে একেবারে সর্বপ্রথম যে কাজটি করিতে হইবে তাহা হইল পুনর্গঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন। এই পরিকল্পনার দুইটি অংশ থাকিবে— একটি অব্যবহিত কর্মসূচী এবং আর-একটি দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মসূচী। প্রথম অংশের কর্মসূচী রচনায় যে-সব অব্যবহিত লক্ষ্য সম্মুখে রাখিতে হইবে সেগুলি হইবে ত্রিবিধ : প্রথমত, দেশকে স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা ; দ্বিতীয়ত, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তৃতীয়ত, স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের অবকাশ দেওয়া। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লক্ষ্য পরস্পর-বিরোধী মনে হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। জাতি হিসাবে আমাদের যাহা-কিছু রাজনৈতিক মেধা কিংবা প্রতিভা আছে তাহা এই দুইটি লক্ষ্যের সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা ভারতকে যাহাতে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ধরিয়া রাখিতে পারি সেজন্য দেশকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রদেশগুলিকে সাংস্কৃতিক ও সরকারী কার্যে বহুল পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দিয়া আমাদের শান্ত রাখিতে হইবে। বিদেশী প্রভুত্বের বোঝা যখন অপসারিত হইবে তখন আমাদের জনগণকে একত্রিত রাখার জন্য

বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন হইবে, কেননা বৈদেশিক শাসন কিছু পরিমাণে আমাদের মনোবল নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগকে অসংগঠিত করিয়াছে। জাতীয় ঐক্য সম্পাদনের জন্য আমাদের জাতীয় ভাষা ও একটি সাধারণ লিপির উন্নয়ন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বিমান, টেলিফোন, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের নিকট আনিতে হইবে এবং একটি সাধারণ শিক্ষানীতির মাধ্যমে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে একটা সাধারণ মনোবৃত্তি আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে বিভিন্নতা কৃত্রিম। সর্বাধিক স্বাভাবিক জাতীয় ভাষা হইবে এই দুইটির একটা সংমিশ্রণ, যে ভাষায় দেশের কতকগুলি বড়ো অংশের অধিবাসী প্রাত্যহিক জীবনে কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং এই সাধারণ ভাষা হয় নাগরী কিংবা উর্দু লিপিতে লেখা যাইতে পারে। আমি জানি ভারতে এমন দৃঢ় অভিমতের মানুষ আছেন যাঁহারা এই দুইটির একটিকে একেবারে বাদ দিয়া অপরটি গ্রহণের পক্ষপাতী। আমাদের অবশ্য কোনোটি বাদ দেওয়ার নীতি হওয়া উচিত নয়। আমাদের এই দুইট লিপির যে-কোনোটি ব্যবহারের পূর্ণতম স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। একই সংগে আমার এই রকম চিন্তার প্রবণতা আছে যে বিশ্বের অবশিষ্টাংশের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে এরূপ একটি লিপি গ্রহণ চূড়ান্ত ও সর্বোত্তম সমাধান হইবে। হয়তো আমার কিছু দেশবাসী যখন রোমান লিপি গ্রহণের কথা শুনিবেন তখন তাঁহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিবেন; কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে এই সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি-কোণ হইতে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা যদি তাহা করি আমরা সংগে সংগে বুঝিব যে লিপির মধ্যে কিছু ধর্মীয় পবিত্রতা নাই। আজ আমরা যেমন জানি নাগরী লিপি বিবর্তনের কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতের অধিকাংশ বড়ো প্রদেশের নিজস্ব লিপি আছে এবং আছে উর্দু লিপি যাহা ভারতে উর্দুভাষী লোকেরা বহুলাংশে ব্যবহার করেন ও পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মতো প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ব্যবহার করেন। এই ধরনের বৈচিত্র্য থাকায় সমগ্র ভারতের জন্য একই লিপি মনোনয়ন সর্বপ্রকার বিদ্বেষমুক্ত মনে সম্পূর্ণ-রূপে বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ ভিত্তিতে করা উচিত। আমি স্বীকার করি যে একটা সময় ছিল যখন আমি মনে করিতাম যে বিদেশী লিপি গ্রহণ জাতীয়তা-বিরোধী হইবে। কিন্তু ১৯৩৪ সালে আমার তুরস্ক পরিদর্শন আমার মত পরিবর্তনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আমি তখন সর্বপ্রথম বুঝিয়াছিলাম পৃথিবীর বাকী অংশের

সহিত একই লিপি থাকা কত সুবিধাজনক। আমাদের জনসাধারণের কথা যদি ধরি তাঁহাদের শতকরা ৯০ জনের বেশি যেহেতু নিরক্ষর এবং কোনো লিপির সহিতই পরিচিত নন, তাঁহাদের শিক্ষার সময় যে লিপিই চালু করি-না-কেন তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসিয়া যাইবে না। উপরন্তু রোমান লিপি তাঁহাদিগকে একটি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার সুবিধা দিবে। অবিলম্বে রোমান লিপি গ্রহণ আমাদের দেশে কত অপ্রিয় হইবে আমি তাহা জানি। তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞতম সমাধান কী হইবে তাহা বিবেচনা করার জন্য আমার দেশবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করিব।

স্বাধীন ভারতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর ক্ষেত্রে প্রথম যে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন তাহা আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। ভারত জনসংখ্যার ভারে প্রপীড়িত কিনা আমি এই তাত্ত্বিক প্রশ্নে যাইতে চাই না। আমি শুধু বলিতে চাই যে যেখানে দারিদ্র্য, অনশন ও ব্যাধি দেশের বুকে বিচরণ করিতেছে সেখানে এক দশকে আমাদের জনসংখ্যার ৩ কোটি বৃদ্ধি সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নাই। জনসংখ্যা যদি সম্প্রতিক অতীতের মতো লাফে লাফে বাড়িয়া যায় তাহা হইলে আমাদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে পর্যন্ত না আমরা বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য, পরিধেয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি সে পর্যন্ত আমাদের জনসংখ্যা সংকুচিত করা বাঞ্ছনীয় হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য যে-সব পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এই পর্যায়ে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই— তবে আমি বলিব যে এই সমস্যার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের দেশ হইতে দারিদ্র্য নির্মূল করা যাইবে তাহাই হইবে আমাদের প্রধান সমস্যা। তাহার জন্য প্রয়োজন হইবে জমিদারি প্রথা অবসান সহ আমাদের ভূমি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার। কৃষি-ঋণের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য সহজ-ঋণের সংস্থান করিতে হইবে। উৎপাদক ও ব্যবহারক উভয়ের উপকারের জন্য সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইবে। ভূমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির উন্নয়নই যথেষ্ট হইবে না। রাষ্ট্রের মালিকানায় ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য হইবে। যে পুরাতন শিল্পপদ্ধতি বিদেশের ব্যাপক উৎপাদন ও স্বদেশে বৈদেশিক শাসনের ফলে ভাঙিয়া পড়িয়াছে

তাহার পরিবর্তে নূতন শিল্পপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক কারখানাগুলির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও স্বদেশী কোনো কোনো শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিধির উৎপাদন উৎসাহিত করা উচিত তাহা পরিকল্পনা কমিশনকে সযত্নে বিবেচনা করিতে হইবে এবং সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। আমরা যতই আধুনিক শিল্পায়ন অপছন্দ করি এবং তাহার সমবেত কুফলগুলির যতই নিন্দা করি, আমরা আর ইচ্ছা করিলেও শিল্প-পূর্ব যুগে ফিরিয়া যাইতে পারি না। সুতরাং আমাদের নিজেদিগকে শিল্প-রূপায়ণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া উচিত এবং ইহার কুফল যত কম হয় সে-জন্য উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। একই সঙ্গে যেখানে কারখানার অবশ্যম্ভাবী প্রতিযোগিতার মুখে বাঁচিয়া থাকার সম্ভাবনা আছে সেখানে কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। ভারতবর্ষের মতো দেশে কুটির-শিল্পগুলির, বিশেষ করিয়া কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাতে সুতাকাটা ও হস্ত-চালিত তাঁতশিল্পের মতো শিল্পগুলির প্রচুর অবকাশ থাকিবে।

সব শেষে বিবৃত হইলেও যাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাহা এই যে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও ভোগের উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে ক্রমশ সামাজিকীকরণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ কিংবা বহির্দেশীয় ঋণের দ্বারা কিংবা মুদ্রা-স্ফীতির দ্বারা ইহার জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে।

কংগ্রেস দল এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এখন সংবিধানের প্রাদেশিক অংশের বিরোধিতা কিংবা তাহাতে বাধাদান সম্ভব হইবে না। ইহার ফলে একমাত্র যাহা করা যাইতে পারে তাহা হইল কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও দৃঢ় সংবদ্ধ করা। আমি তাঁহাদের একজন যাঁহারা ক্ষমতা গ্রহণের অনুকূলে ছিলেন না তাহার কারণ অবশ্য ইহা নয় যে ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনো অন্যায় ছিল, ইহাও নয় যে এই নীতি হইতে কোনো ভালো ফল পাওয়া যাইবে না; তবে এ ক্ষেত্রে আশংকা করা হইয়াছিল যে ক্ষমতা গ্রহণের কুফল সুফল অপেক্ষা ওজনে অধিক ভারী হইবে। আজ আমি এইমাত্র আশা করিতে পারি যে আমার আশংকা যেন ভিত্তিহীন হয়।

আমাদের মন্ত্রীরা পদাধিকারী থাকা অবস্থায় আমরা কিভাবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও সংহত করিয়া তুলিতে পারি? প্রথম যাহা করিবার তাহা হইল আমলাতন্ত্রের গঠন ও চরিত্র পরিবর্তন করা। ইহা না করা হইলে কংগ্রেস দলকে

অনুশোচনা করিতে হইতে পারে। প্রতিটি দেশে মন্ত্রীরা আসেন এবং যান, কিন্তু স্থায়ী চাকুরিয়াদের লৌহ-কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাকে যদি গঠন ও চরিত্রের দিক হইতে পরিবর্তিত না করা হয়, তাহা হইলে সরকারী দল ও তাহার মন্ত্রীসভা নিজেদের নীতিগুলি কার্যে পরিণত করিতে সম্ভবত ব্যর্থ হইবেন। যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের ক্ষেত্রে ইহা ঘটিয়াছিল এবং হয়তো গ্রেট ব্রিটেন ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে শ্রমিক দলের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছিল। প্রতিটি দেশে স্থায়ী চাকুরিয়ারাই প্রকৃতপক্ষে শাসন-কার্য চালান। ভারতে ব্রিটিশরাই তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উচ্চতর পদগুলিতে তাঁহারা বহুলাংশে ব্রিটিশ। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয়ও নয় কিংবা জাতীয়ও নয় এবং স্থায়ী চাকুরিয়ারা দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবে জাতীয় হইয়া না উঠা পর্যন্ত জাতীয় নীতি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। অবশ্য একটা অসুবিধা এই হইবে যে স্থায়ী চাকুরিয়াদের মধ্যে উর্ধ্বতন পদাধিকারীগণ সনদের আওতায় সরাসরি ভারত-সচিবের অধীনস্থ হওয়ায় এবং প্রাদেশিক সরকারের অধীনে না হওয়ায় তাঁহাদের কাঠামো পরিবর্তন সহজ হইবে না।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতাসীন থাকার সময় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদক নিবারণ, কারা-সংস্কার, সেচ, শিল্প, ভূমি-সংস্কার, শ্রমিক-কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুনর্গঠন পরিকল্পনা চালু করা। এ বিষয়ে যতটা সম্ভব সারা ভারতের জন্য একই নীতি গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত। দুইটি পদ্ধতির কোনো-একটির দ্বারা এই সমতা আনা যাইতে পারে। শ্রমমন্ত্রীরা যেমন ১৯৩৭ অক্টোবরে কলিকাতায় একত্রিত হইয়াছিলেন তেমনিভাবে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ একত্রিত হইতে পারেন এবং একই ধরনের কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে পারেন। ইহা ছাড়া যে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক, সেই কমিটি নিজের বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরামর্শের আলোকে কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলির বিভিন্ন বিভাগকে নির্দেশ দিয়া সাহায্যের হাত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। ইহার অর্থ হইবে এই যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী সরকারের আওতায় পড়ে এরূপ সমস্যাগুলির সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পরিচিত হওয়া উচিত। তাঁহাদের অবশ্য প্রশাসনের খুঁটিনাটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, যাহা প্রয়োজন তাহা এই যে তাঁহারা যাহাতে মোটামুটি নীতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকা উচিত। এই সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইতিপূর্বে যাহা করে নাই তদপেক্ষা অনেক বেশি

করিতে পারেন এবং তাহা যদি না করেন তাহা হইলে এই সংস্থা কিভাবে বিভিন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবে তাহা আমি জানি না।

এই পর্যায়ে আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূমিকা সম্বন্ধে আরো কিছু বলিতে চাই। আমার বিচারে এই কমিটি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জাতীয়-বাহিনীর পরিচালক মস্তিষ্ক মাত্র নয়। ইহা স্বাধীন ভারতের ছায়া-মন্ত্রীসভাও বটে এবং সেইভাবে ইহার কাজ করা উচিত। ইহা আমার নিজের আবিষ্কার নয়। অন্যান্য দেশের এই ধরনের যে-সব সংস্থা তাহাদের জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে তাহাদের জন্যও এই ভূমিকা নির্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বাধীন ভারতের চিন্তা করেন, যাঁহারা আমাদের স্বল্প-মেয়াদী জীবনকালে এই দেশে জাতীয় সরকারের উদ্ভব কল্পনা করেন, আমি তাঁহাদের একজন। তদনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি নিজেকে স্বাধীন ভারতে ছায়া-মন্ত্রীসভারূপে মনে করিবে এবং সেইভাবে কাজ করিবে—এ দাবি করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার প্রজাতন্ত্রী সরকার যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিলেন এবং পলায়নপর ছিলেন তখন তাঁহারা ইহাই করিয়াছিলেন। আর মিশরে ক্ষমতায় বসিবার পূর্বে ওয়াফদ দলের কার্যনির্বাহকরাও ইহাই করিয়াছিলেন। সুতরাং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সংগে সংগে ক্ষমতা দখলে আসিলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে রাজনৈতিক যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

কংগ্রেসী সরকারগুলির যথোচিত কার্য পরিচালনার প্রশ্নটি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইল কিভাবে সংবিধানের ফেডারেশন-সম্পর্কিত অংশের বিরোধিতা করা যায়, সেই অব্যবহিত সমস্যাটি। প্রস্তাবিত ফেডারেশন পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব ১৯৩৮-এর ৪ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। বিষয়-নির্বাচনী কমিটি ইহা বিবেচনা করার পর এই কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—

"কংগ্রেস নূতন সংবিধান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে ভারতের যে সংবিধান জনগণ কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে তাহার ভিত্তি হইবে স্বাধীনতা এবং এরূপ সংবিধান কোনো বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতীত জনগণের নিজেদের দ্বারা গণপরিষদের মাধ্যমে রচিত হইতে পারে। এই প্রত্যাখ্যানের নীতিতে অটুট থাকিয়া কংগ্রেস অবশ্য জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তিশালী

করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন অনুমোদন করিয়াছে। প্রস্তাবিত ফেডারেশন সম্পর্কে এ ধরনের কোনো বিবেচনা প্রযোজ্য নয়, এমন-কি, সাময়িকভাবে কিংবা কোনো সময়সীমার জন্যও নয় এবং এই ফেডারেশন জোর করিয়া চাপানো হইলে ভারতের গুরুতর ক্ষতি হইবে এবং ইহাতে যে-সব বন্ধন তাহাকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অধীন করিয়া রাখিয়াছে সেগুলি আরো দৃঢ় হইবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি ফেডারেশন পরিকল্পনার দায়িত্ব-ক্ষেত্রের বহির্ভূত।

"কংগ্রেস ফেডারেশনের ধারণার বিরোধী নয়, কিন্তু দায়িত্বের প্রশ্ন বাদ দিলেও প্রকৃত ফেডারেশন গঠিত হইবে এমন সব স্বাধীন একক লইয়া যেগুলি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের দ্বারা কমবেশি সমপরিমাণে প্রতিনিধিত্ব ভোগ করিবে। ফেডারেশনে অংশগ্রহণকারী ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা সংগঠনে, দায়িত্বশীল সরকার গঠনে, ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারে এবং ফেডারেশনের আইন-সভায় নির্বাচনের পদ্ধতিতে প্রদেশগুলির সমপর্যায়ে আসিতে হইবে। অন্যথায় বর্তমানে পরিকল্পিত ফেডারেশন ভারতীয় ঐক্য গঠনের পরিবর্তে বিভেদপ্রবণতাকে উৎসাহিত করিবে এবং অংগ-রাজ্যগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিরোধে জড়াইয়া ফেলিবে।

"সুতরাং কংগ্রেস, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার নিন্দা পুনর্জ্ঞাপন করে এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে, সাধারণভাবে জনগণকে প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রীসভাগুলিকে ইহার প্রবর্তন প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আহবান জানায়।

"যদি জনগণের ঘোষিত ইচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া ইহা চাপানোর চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সর্বপ্রকারে এরূপ প্রয়াস প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রীসভাগুলিকে সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

"এইরূপ কোনো বিপদ দেখা দিলে এ বিষয়ে যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে তাহা স্থির করার ভার ও নির্দেশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হইল।"

প্রস্তাবিত ফেডারেশন সম্বন্ধে আমাদের আপসহীন বিরোধিতার অনুকূলে আরো কিছু যুক্তি আমি যোগ করিতে চাই। এই পরিকল্পনার সর্বাধিক আপত্তি-জনক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হইল নূতন সংবিধানে বর্ণিত ব্যবসায়িক ও অর্থ-নৈতিক রক্ষাকবচগুলি। জনগণ শুধু যে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে

ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবেন তাহাই নয়, ব্যয়ের অধিকাংশও থাকিবে সম্পূর্ণভাবে জনিয়ন্ত্রণের বাহিরে। ১৯৩৭-৩৮-এর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অনুসারে মোট ৭৭.৯০ কোটি টাকা (৫৮.৪২ মিলিয়ন পাউন্ড) ব্যয়ের মধ্যে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৪৪.৬১ কোটি টাকা (৩৩.৪৬ মিলিয়ন পাউন্ড) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের মোট ব্যয়ের মোটামুটি ৫৭ ভাগ। দেখা যায় যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে সংরক্ষিত অংশ গভর্নর-জেনারেল নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহার আওতায় পড়িবে ফেডারেল ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটির মতো সংস্থা ইতিপূর্বে সৃষ্টি করা হইয়াছে কিংবা হইবে এবং ইহারা ফেডারেল আইন-সভার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্যরূপে কাজ করিবে। বর্তমানে রেলওয়ের কর্মনীতি নির্দেশ করার ও প্রভাবিত করার যে ক্ষমতা আইন-সভার আছে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইবে এবং দেশের যে মুদ্রা ও বিনিময়নীতির গভীর প্রভাব তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর আছে তাহা নির্ণয়ে তাহার অধিকার থাকিবে না। ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীনে বৈদেশিক বিষয় সংরক্ষিত বিষয় রূপে গণ্য হইবে বলিয়া বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ইহা ভারতীয় আইন-সভার স্বাধীনতা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করিবে এবং কার্যত রাজস্বঘটিত স্বায়ত্তশাসন সংকুচিত করিবে। এখন যেমন ভারত সরকার ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য-চুক্তি ভারতীয় আইন-সভায় পেশ করার দায় অস্বীকার করেন, তেমনই ফেডারেল সরকার অনুমোদনের জন্য বাণিজ্য-চুক্তিগুলি আইন-সভায় পেশ করিতে কোনোপ্রকার সাংবিধানিক দায়বদ্ধ থাকিবেন না। যদি এরূপ ব্যবস্থা না করা হয় যে ভারতীয় আইন-সভা কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের পক্ষে কোনো বাণিজ্য-চুক্তি কেহ স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তথাকথিত রাজস্বঘটিত স্বায়ত্তশাসনের নজির অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। এই প্রসঙ্গে আমি এ কথা বলিতে চাই যে অতীতে ভারতের যে-সব দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল যেমন জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, ইটালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— সেই-সব দেশের সহিত ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি হওয়া উচিত— ইহা আমার নিশ্চিত অভিমত। কিন্তু নূতন সংবিধান অনুসারে এইরূপে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে ফেডারেল সরকারকে বাধ্য করার মতো কোনো ক্ষমতা ফেডারেল আইন-সভার থাকিবে না।

আইনে যে-সব অন্যায় ও অসংগত ব্যবসায়িক রক্ষাকবচ আছে, সেগুলির ফলে ভারতের জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা

অবলম্বন অসম্ভব হইয়া উঠিবে—ইহা বিশেষ করিয়া সত্য হইবে সেই-সব ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে, যেগুলি ব্রিটিশ ব্যবসায়িক কিংবা শিল্পগত স্বার্থের বিরোধিতা করিতে পারে কিংবা করে। আইনে নির্ধারিত বৈষম্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি যাহাতে যথাযথ পালিত হয় তাহা দেখার বিশেষ দায়িত্ব ছাড়াও গভর্নর-জেনারেলের কর্তব্য হইবে ভারতে আমদানী করা ব্রিটিশ পণ্য যাহাতে কোনোপ্রকার বৈষম্যমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় না পড়ে তাহার প্রতিবিধান করা। এই-সব কড়া ও ব্যাপক ব্যবস্থাগুলির সযত্ন পর্যবেক্ষণ হইতে দেখা যাইবে যে গভর্নর-জেনারেল আইন-সভায় কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাধা দিতে কিংবা নিষিদ্ধ করিতে পারেন না এরূপ কোনো ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারত অবলম্বন করিতে পারিবে না। এই দেশের নাগরিকদের সংগে সমান শর্তে বিদেশীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দান অবশ্য রীতিমতো অস্বাভাবিক এবং ভারতের স্বার্থে তাহার নাগরিকগণ ও অনাগরিকগণের মধ্যে বিভিন্নতা করার অধিকার সহ একটি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতি উদ্ভাবন ও গ্রহণ করার শক্তি হইতে যদি ভারতকে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে প্রকৃত স্বরাজ আসিতে পারে না। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে লিখিত এবং "দৈত্য ও বামন" নামে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ একটি প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টাস্পষ্টি ঘোষণা করিয়াছিলেন : "ভারতীয় স্বার্থ এবং ইংরাজ কিংবা ইউরোপীয় স্বার্থের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করিতে বলার অর্থ হইল ভারতীয় ক্রীতদাসত্ব চিরস্থায়ী করা। দৈত্য ও বামনের মধ্যে সমান অধিকারের অর্থ কি ?" এমন-কি বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন-সভা ভারতীয় উপকূলবর্তী বাণিজ্য ভারতীয় মালিকানাধীন ও ভারতীয় পরিচালিত জাহাজগুলির জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখার মতো যে সামান্য ক্ষমতা উপভোগ করে তথাকথিত সংশোধিত সংবিধান দ্বারা তাহাও কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজী শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যাহা প্রতিরক্ষামূলক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যক ; কিন্তু এমন-কি কয়েকটি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিসহ এই মূল শিল্প-উন্নয়নের জন্য স্বীকৃত ও বৈধ পদ্ধতিগুলি ভারতের পক্ষে এখন হইতে অসম্ভব করিয়া তোলা হইবে। "পারস্পরিক লেনদেন" ও "অংশীদারদের" অজুহাতে আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর এরূপ সীমা আরোপকে যুক্তিসংগত বলিয়া প্রতিপন্ন করার অর্থ হইল আক্ষরিক অর্থে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া। যখনই ভারতীয় স্বার্থে

প্রয়োজন তখনই নাগরিক ও অনাগরিকদের মধ্যে বিভিন্নতা কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির অধিকার ভাবী ভারতীয় সংসদের হাতে অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত এবং আমরা কোনো কারণে এই অধিকার বিসর্জন দিতে পারি না। আমি এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আইরিশ উদাহরণ দিতে চাই। ১৯৩৫ সালের আইরিশ জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব আইনে নির্বাচনী পদ্ধতি, জনজীবনে প্রবেশ, বাণিজ্য জাহাজের আইন, বিমান সম্পর্কে স্পষ্ট আইরিশ নাগরিকত্বের ব্যবস্থা আছে এবং ইহা ছাড়াও আইরিশ জাতীয়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা আছে যেমন আইরিশ শিল্পে সহায়তা দানের জন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আইরিশ নাগরিকত্ব ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হইবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং আয়ার (কিংবা আয়ারল্যান্ড) রাষ্ট্রে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব সমান অধিকার দাবি করিতে পারে না এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব সেখানে স্বীকৃত নয়। আমার মনে হয় যে ভারতকেও অনুরূপভাবে নিজস্ব জাতীয়তার উন্নয়ন করিতে হইবে এবং নিজস্ব নাগরিকতাও গড়িয়া তুলিতে হইবে।

রাজস্বঘটিত স্বায়ত্তশাসন ও ব্যবসায়িক রক্ষাকবচ আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে ভারতের জন্য সক্রিয় বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিতে পারি। ব্রিটিশ শিল্পের অব্যবহিত কিংবা সাময়িক কিছু উপকার করিবার উদ্দেশ্যে প্রায়ই যেরূপে করা হয় সেইরূপে গোঁজামিলের পদ্ধতিতে কিংবা খণ্ডিতভাবে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যকে না দেখিয়া ইহাকে ব্যাপক পদ্ধতিতে দেখা উচিত যাহাতে এক দিকে তাহার রপ্তানী বাণিজ্য এবং অপর দিকে তাহার বৈদেশিক দায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রকৃতি এমন যে ইংলণ্ডের সহিত তাহার কোনো বিধিনিষেধমূলক চুক্তি থাকিবে না। এই-সব বিধিনিষেধ সাম্রাজ্য-বহির্ভূত যে-সব দেশ কতকগুলি বিষয়ে তাহার শ্রেষ্ঠ ক্রেতা তাহাদের সহিত ব্যবসায় ব্যাহত করে কিংবা অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের দরকষাকষির শক্তি হ্রাস করে। ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য-চুক্তির দীর্ঘায়িত আলোচনা এখনো চলিতেছে আর সেইসঙ্গে অটোয়া-চুক্তির বিজ্ঞপ্তি-কাল অবসানের পর এবং এই চুক্তির অবসান ঘটাইবার জন্য আইন-সভার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ইহা এখনো চালু আছে এবং ব্রিটিশ ইস্পাত ও বস্ত্রের উপর ভিন্ন রকমের শুল্কসহ উক্ত অটোয়া-চুক্তি ব্রিটিশ শিল্পগুলির জন্য বর্তমান সুযোগ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইংলণ্ড

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির মঞ্চে সুভাষচন্দ্র

Kurseong
২১/১০/২৭

প্রতিলিপি : গোপাললাল সান্যালকে লিখিত পত্র

ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি অসম চরিত্রের হইতে বাধ্য, কেননা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সম্পর্ক ইংলন্ডের অনুকূলে বেশি পরিমাণে পাল্লা ভারী করিবে। এ বিষয়েও সংশয় নাই যে ব্রিটিশ প্রাধিকারমূলক পদ্ধতির মূল হইল রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য-চুক্তির আড়ালে অভারতীয় কায়েমী স্বার্থকে এই দেশে শিকড় গাড়িবার কিংবা দানা বাঁধিবার সুযোগ দিবার আগে ইহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য আলোচনাকে যেখানে সম্ভব অন্যান্য দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না এবং ভারতীয় আইন-সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ কোনো বাণিজ্য-চুক্তি ভারত সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে না।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইবে যে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির ক্ষমতা ও প্রস্তাবিত ফেডারেল মন্ত্রীসভার ক্ষমতার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নাই। ইহা ছাড়া, ফেডারেল আইন-সভার গঠন কিছু পরিমাণে প্রতি-ক্রিয়াশীল। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা মোট ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২৪ ভাগ। তৎসত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণকে নয়, দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকগণকে ফেডারেল আইন-সভার নিম্নতন সভায় শতকরা ৩৩ ভাগ আসন ও উর্ধ্বতন সভায় শতকরা ৪০ ভাগ আসন দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় আমার অভিমত অনুসারে কোনো সময়ে ফেডারেশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ফেডারেশন চাপানো প্রতিরোধে আমাদের সাফল্যের উপর নির্ভর করিবে আমাদের অব্যবহিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে— কেবলমাত্র সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নয়, আমাদের ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে চরম অস্ত্র আছে সেই গণ আইন-অমান্য আন্দোলনের আশ্রয় আমাদের লইতে হইতে পারে। এই বিষয়ে বিশেষ সংশয় থাকিতে পারে না যে ভবিষ্যতে এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হইলে তাহা শুধু ব্রিটিশ-ভারতে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ইহা দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িবে।

অদূর ভবিষ্যতে কার্যকর সংগ্রাম করিতে গেলে আমাদের স্বগৃহে শৃঙ্খলা স্থাপন করা আবশ্যক। গত কয়েক বৎসর আমাদের জনগণের মধ্যে জাগরণ এরূপ বেশি হইয়াছে যে আমাদের দলীয় সংগঠনের ক্ষেত্রেও নূতন সমস্যার

উদ্ভব হইয়াছে। আজকাল জনসভায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাবেশ একটি সাধারণ ব্যাপার। কখনো কখনো দেখা যায় যে এই-সব সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথোচিত সংগঠন আমাদের নয়। এই-সব অস্থায়ী সমাবেশ ছাড়াও এই বিরাট গণশক্তির উৎসাহ সুসংহত করার এবং উপযুক্ত পথে তাহা চালিত করার বৃহত্তর সমস্যা আছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আছে কি? জাতীয় সেবামূলক কর্তব্য সাধনের জন্য আমাদের কোনো অফিসারবাহিনী আছে কি? আমাদের আগামী দিনের নেতাদের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল কর্মীদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে কি? এই-সব প্রশ্নের উত্তর এত সুপরিজ্ঞাত যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। একটি আধুনিক রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা আমরা এখনো করি নাই, কিন্তু তাহা করিবার সময় আসিয়াছে। শিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার-বৃন্দসমৃদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তদূর্ধ্বে আমরা যাহাতে ভবিষ্যতে উন্নততর নেতা সৃষ্টি করিতে পারি সেজন্য আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক দেওয়া হয় এবং স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলিতে ইহা তো একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ। আমাদের কর্মীদের প্রতি— যাঁহারা আমাদের সংগ্রামে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন— অবিমিশ্র শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের দলে আরো বেশি প্রতিভার স্ফুরণের অবকাশ আছে। অংশত প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের কংগ্রেসে ভর্তি করিয়া এবং অংশত যাঁহারা ইতিমধ্যে, আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন তাঁহাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া আমরা এই ত্রুটি সংশোধন করিতে পারি। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন কিভাবে ইউরোপীয় দেশগুলি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। যদিও আমাদের আদর্শ এবং প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সেই-সব দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে আমাদের কর্মীদের জন্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ অত্যাবশ্যক। ইহা ছাড়া নাৎসীদের মতো শ্রম-সেবাবাহিনী সযত্ন পরীক্ষার পর এবং যথোচিত সংশোধন সহ ইহা ভারতের পক্ষে উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

আমাদের দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বলবৎ করার প্রশ্নটি আলোচনা করার সময় আমাদের এমন একটি সমস্যা বিবেচনা করিতে হইবে যাহা আমাদের অনেকের কাছে উদ্বেগ ও জটিলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি ট্রেড ইউনিয়ন

কংগ্রেস ও কিষাণসভাগুলির মতো সংগঠন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত তাহাদের সম্পর্কের উল্লেখ করিতেছি। এই প্রশ্নে দুইটি বিরোধী চিন্তা-ধারা আছে— যাঁহারা কংগ্রেসের বহির্ভূত যে-কোনো সংগঠনের নিন্দা করেন তাঁহারা এবং যাঁহারা এরূপ সংগঠনের পক্ষপাতী তাঁহারা। আমার নিজের অভিমত এই যে আমরা এই-সব সংগঠনকে অবজ্ঞা করিয়া কিংবা নিন্দা করিয়া তাহাদের অবলুপ্তি ঘটাইতে পারি না। ইহারা বাস্তব ঘটনারূপে বিদ্যমান আর ইহারা যখন উদ্ভূত হইয়াছে এবং বিলুপ্তির কোনো লক্ষণ যখন দেখাইতেছে না, তখন ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে ইহাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য দেশেও অনুরূপ সংগঠন দেখা যায়। আমার আশঙ্কা এই যে আমরা পছন্দ করি কিংবা না করি ইহাদের অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। একমাত্র প্রশ্ন হইল কংগ্রেস ইহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিবে। যে জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য গণ-সংগ্রামের সংগঠন স্পষ্টতই এই-সব সংগঠন কখনোই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা গ্রহণ করিবে না। সুতরাং ইহাদের উচিত কংগ্রেসী আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া এবং কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা। ইহা সুনিশ্চিত করার জন্য বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক-সংগঠনগুলিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি মনে করি যে নিজেদিগকে বিরোধ কিংবা নীতি-বৈষম্যে না জড়াইয়া ইহা সহজে করা চলে। যদি পূর্বোদ্ধৃত দুই ধরনের সংগঠন প্রাথমিকভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি লইয়া কাজ করে এবং যাঁহারা তাঁহাদের দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন তাঁহাদের সকলের জন্য কংগ্রেসকে সাধারণ মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করে তবে কংগ্রেস ও ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সহজ হইয়া উঠিতে পারে।

এবার আমাদের আসিতে হয় কংগ্রেসের সহিত শ্রমিক ও কৃষকগণের সংগঠন-গুলির সামগ্রিক সংযুক্তির বহুবিতর্কিত প্রশ্নটিতে। আমি এই অভিমত পোষণ করি যে এমন একদিন আসিবে যখন সকল প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এই সংযুক্তিকরণের অনুমোদন দিতে হইবে। অবশ্য এই সংযুক্তির অনুমোদন কিভাবে হইতে পারে এবং কংগ্রেস এ ব্যাপারে যতদূর যাইতে পারে তাহা লইয়া মতভেদ থাকিবে ও এই প্রকারের সংযুক্তিতে সম্মত হইবার পূর্বে এই ধরনের

সংগঠনের প্রকৃতি ও স্থায়িত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। রাশিয়ায় শ্রমিক, কিষাণ ও সৈন্যদের সোভিয়েটগুলির যুক্ত ফ্রন্ট অক্টোবর বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছিল, কিন্তু পক্ষান্তরে গ্রেট ব্রিটেনে আমরা দেখি যে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদলের জাতীয় কার্যনির্বাহকের উপর নরমপন্থী প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষে যদি সংযুক্তিকরণ অনুমোদিত হয় তাহা হইলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিসাণ সভাগুলির মতো সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের উপর কী ধরনের প্রভাব-বিস্তার করিবে তাহা আমাদিগকে সযত্নে বিবেচনা করিতে হইবে এবং আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে তাহাদের অব্যবহিত অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট না থাকিলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণ সভাগুলির বৈপ্লবিক প্রকৃতি থাকিবে না। যাহা হউক, সামগ্রিক সংযুক্তির প্রশ্ন সম্পূর্ণ বাদ দিলেও জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা থাকা উচিত এবং শেষোক্ত সংগঠনগুলি পূর্বোক্ত সংগঠনের নীতি ও পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করিলে এই উদ্দেশ্য পূরণ সহজ হইয়া উঠিবে।

কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মতো দল গঠনের প্রশ্নটি লইয়া যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের পক্ষ লইয়া কোনো কথা বলিতেছি না এবং আমি ইহার সদস্য নই। তৎসত্ত্বেও আমাকে বলিতে হয় যে, আমি ইহার আদর্শগুলি ও কর্মনীতির সহিত প্রথম হইতেই একমত। প্রথমত বামপন্থীদের একটি দলে সংহত হইয়া উঠা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, যদি ইহা প্রকৃতির দিক হইতে সমাজতান্ত্রিক হয় তবেই একটি বামপন্থী ব্লকের অস্তিত্বের কারণ থাকিতে পারে। এমন বন্ধুরা আছেন যাঁহারা এইরূপ ব্লককে দল নাম দেওয়ায় আপত্তি করেন, কিন্তু আমার মনে হয় ইহাকে ব্লকই বলুন আর গোষ্ঠীই বলুন, লীগই বলুন কিংবা দলই বলুন তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধানের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটি বামপন্থী ব্লকের সমাজ-তান্ত্রিক কর্মসূচী থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ইহাকে গোষ্ঠী, লীগ কিংবা দল বলা যাইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কিংবা একই ধরনের অন্য কোনো দলের ভূমিকা হওয়া উচিত একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর। সমাজতন্ত্র আমাদের পক্ষে অব্যবহিত কোনো সমস্যা নয়; তবু দেশ যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবে তখন তাহাকে সমাজতন্ত্রের জন্য তৈয়ারি করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচার প্রয়োজন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী-দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও তাহার ধারক বলিয়া তাহার মতো দলই একমাত্র এই প্রচার চালাইতে পারে।

একটি সমস্যা আছে যাহাতে আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া গভীর, ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছি এবং যে সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখিতে চাই। আমি ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রশ্নটির কথা এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের কথা বলিতেছি। আমি এই কাজটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আগামী বৎসরগুলিতে আন্তর্জাতিক ঘটনার বিবর্তন ভারতে আমাদের আন্দোলনের আনুকূল্য করিবে। কিন্তু প্রতি পর্যায়ে আমাদের বিশ্ব-পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং কিভাবে ইহার সুযোগ লইতে হইবে তাহা আমাদের জানা উচিত। মিশরের শিক্ষা আমাদের সম্মুখে উদাহরণ-স্বরূপ রহিয়াছে। মিশর একটি গুলিও না ছুঁড়িয়া গ্রেট ব্রিটেনের সহিত মৈত্রী-চুক্তি অর্জন করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ সে ভূমধ্যসাগর এলাকায় ইঙ্গ-ইটালীয় উত্তেজনার সুযোগ কী করিয়া নিতে হয় তাহা জানিত।

আমাদের বৈদেশিক নীতি প্রসঙ্গে আমার যে প্রথম প্রস্তাব তাহা এই যে অন্য কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিংবা তাহার রাষ্ট্রের রূপ দ্বারা আমাদের প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আমরা প্রতিটি দেশেই এমন নরনারী পাইব, যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁহাদের নিজস্ব রাজ-নৈতিক মতামত যাহাই হউক-না-কেন। এ ব্যাপারে সোভিয়েট কূটনীতি হইতে আমাদের কিছু শেখা উচিত। যদিও সোভিয়েট রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র তবু তাহার কূটনীতিবিদ্‌গণ অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রী করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং যে-কোনো স্থান হইতে আগত সহানুভূতি কিংবা সমর্থন প্রত্যাখ্যান করেন নাই। সুতরাং প্রতিটি দেশে এমন একদল নরনারী পাইবার লক্ষ্য আমাদের থাকা উচিত যাঁহারা ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। এইরূপ এক-একটি মূল কেন্দ্র গড়িতে হইলে বৈদেশিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার, ভারত-কর্তৃক প্রস্তুত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচার এবং শিল্পপ্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচার সহায়ক হইবে। উদাহরণস্বরূপ. চীনারা তাঁহাদের শিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইউরোপে নিজেদিগকে খুব বেশি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। সর্বোপরি প্রয়োজন ব্যক্তিগত যোগাযোগের। এইরূপ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য দেশে ভারতকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা কঠিন হইবে। আমরা ভারতে থাকিয়া যদি বিদেশস্থ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখি তাহা হইলে তাঁহারাও এই কাজে সহায়তা করিতে পারেন। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রছাত্রী এবং দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হওয়া উচিত। ভারতে প্রস্তুত সাংস্কৃতিক ও

শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র যদি আমরা বাহিরে পাঠাইতে পারি তাহা হইলে ভারতের সংস্কৃতি প্রচারিত হইবে এবং বিদেশের জনগণ সেগুলির রস গ্রহণ করিবেন। এই ধরনের চলচ্চিত্র অন্যান্য দেশে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে ও ভারতীয় অধিবাসীদের কাছে খুবই উপকারী হইবে। বর্তমানে তাঁহারাই তো আমাদের বেসরকারী রাষ্ট্রদূতের মতো।

আমি প্রচার কথাটা পছন্দ করি না— ইহার চার দিকে একটা মিথ্যার আবরণ আছে। কিন্তু আমি এ কথা বলিতে চাই যে বিশ্বের দরবারে ভারত ও তাহার সংস্কৃতিকে পরিচিত করানো আমাদের উচিত। আমি ইহা বলি এই কারণে যে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি দেশে ইহা অভ্যর্থিত হইবে— তাহা আমি জানি। আমরা যদি এই কাজে অগ্রসর হই তাহা হইলে আমরা বিভিন্ন দেশে আমাদের ভবিষ্যৎ দূতাবাসগুলির ভিত্তি স্থাপন করার প্রস্তুতির কাজ করিব। আমাদের গ্রেট-ব্রিটেনকেও অবহেলা করা উচিত নয়। এমন-কি, সে-দেশেও নরনারীদের একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী গোষ্ঠী আছেন যাঁহারা ভারতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিসম্পন্ন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতের জন্য আগ্রহ ও সহানুভূতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে শুধু গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

এই কাজ কার্যকরভাবে চালাইবার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উচিত ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর, কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্বস্ত প্রতিনিধি থাকা উচিত। ইহা দুঃখের বিষয় যে আমরা এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছি যদিও সেই-সব স্থানে ভারত সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক সংযোগ উন্নয়নের এই কাজে কংগ্রেসের সাহায্য পাওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কর্মরত ভারতের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির নিকট হইতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্মরত ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের নিকট হইতে। ইহা ছাড়া, ভারতীয়দের প্রতিটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস কিংবা সম্মেলনে যোগ দেওয়া উচিত। এই ধরনের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ ভারতের পক্ষে খুবই উপকারী এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ধরনের প্রচারকার্য।

আন্তর্জাতিক সংযোগের কথা বলার সময় কাহারো কাহারো মনে যে ভ্রান্ত ধারণা থাকিতে পারে তাহা আমার দূর করা উচিত। আন্তর্জাতিক সংযোগ উন্নয়নের অর্থ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা নয়। এই ধরনের ষড়যন্ত্র করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নাই এবং আমাদের কাজের সব পদ্ধতি হইবে

খোলাখুলি। সারা বিশ্বে ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রচার করা হয় তাহার মর্ম এই যে ভারত একটি অসভ্য দেশ এবং ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আসে যে আমাদিগকে সভ্য করার জন্য ব্রিটিশদের প্রয়োজন আছে। উত্তর হিসাবে আমরা কী এবং আমাদের সংস্কৃতি কিরূপ তাহা গোটা বিশ্বকে আমাদের জানাইতে হইবে। তাহা যদি আমরা করিতে পারি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এত বেগবান হইয়া উঠিবে যে বিশ্ব-অভিমতের দরবারে আমাদের দাবি অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দেশবাসীরা এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে— উল্লেখযোগ্যভাবে জাঞ্জিবার, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিংহলে যে-সব অসুবিধা এ পরীক্ষার সম্মুখীন সেই-সব সমস্যার উল্লেখ করিতে আমার ভুল হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস সর্বদাই তাঁহাদের বিষয়ে তীব্রতম আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাইবে। আমরা যদি তাঁহাদের জন্য আরো বেশি কিছু না করিয়া থাকিতে পারি, তবে তাহার কারণ এই যে আমরা স্বদেশে এখনো দাস। স্বাধীনভারত বিশ্বরাজনীতিতে স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী একটি উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে এবং বিদেশে নিজের লোকদের স্বার্থের প্রতি নজর রাখিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে অর্থাৎ পারস্য, আফগানিস্তান, নেপাল, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়রাজ্যগুলি, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার বাঞ্ছনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে চাই। তাহারা যদি আমাদের সম্বন্ধে আরো বেশি জানে এবং আমরা যদি তাহাদের সম্বন্ধে আরো বেশি জানি তাহাতে উভয় পক্ষের মঙ্গল হইবে। আমাদের যুগযুগব্যাপী সংযোগের পটভূমিকায় ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সহিত আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি আন্তরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হওয়া উচিত।

বন্ধুগণ, আমার পূর্বে যেরূপ অভিপ্রায় ছিল সে তুলনায় আপনাদের আরো বেশি সময় লইয়াছি বলিয়া আমি দুঃখিত; তবে আমি এখন আমার ভাষণের সমাপ্তির দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। দিনের জ্বলন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনার বিষয়ের প্রতি আমার উচিত আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাহা হইল বিচারাধীন বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন। সাম্প্রতিক অনশন ধর্মঘটগুলি এই প্রশ্নটিকে সম্মুখভাগে আনিয়াছে এবং ইহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্য মানবিক দিক হইতে যাহা-কিছু করা সম্ভব তাহা করা উচিত— এ কথা যখন

আমি বলি তখন আমি অন্তত সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের অনুভূতিকে ভাষা দেই বলিয়া আমার বিশ্বাস। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইহাদের কয়েকটির কাজকর্ম যে জনগণের প্রত্যাশানুযায়ী হয় নাই তাহা উল্লেখ করা ভালো। তাঁহারা যত শীঘ্র জনদাবি পূরণ করেন ততই কংগ্রেসের পক্ষে মঙ্গল এবং ততই মঙ্গল সেই-সব মানুষের পক্ষে যাঁহারা অকংগ্রেস মন্ত্রী-সভা-শাসিত প্রদেশগুলিতে যন্ত্রণায় ভুগিতেছেন। আমার পক্ষে এই বিষয়টি আর বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়টি সম্বন্ধে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির কৃতিত্বে জনগণের কোনো অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

কেবলমাত্র কারাগারবাসী ও অন্তরীণ বিচারাধীন বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃখের কাহিনী আছে, এমন নয়। যাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন এখনো তাঁহাদের ভাগ্যেও কম দুঃখ জোটে না। তাঁহারা অনেক সময় ভগ্নস্বাস্থ্যে যক্ষ্মার মতো মারাত্মক ব্যাধির শিকার হইয়া ঘরে ফেরেন। তাঁহারা নিদারুণ অনশনের সম্মুখীন হন এবং তাঁহারা তাঁহাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনের হাসির দ্বারা নয়, অশ্রুর দ্বারা অভ্যর্থিত হন। যাঁহারা জীবনের সর্বস্ব দিয়া দেশ-সেবা করিয়াছিলেন এবং পরিবর্তে দারিদ্র্য ও দুঃখ ছাড়া কিছু পান নাই তাঁহাদের প্রতি কি আমাদের কোনো কর্তব্য নাই? সুতরাং যাঁহারা নিজেদের দেশকে ভালোবাসিবার অপরাধে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি, আসুন আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জানাই এবং তাঁহাদের দুঃখমোচনকল্পে আমরা সকলে সাধ্যমতো দান করি।

বন্ধুগণ, আর-একটি কথা বলিলে আমার বক্তব্য শেষ হইবে। আজ আমরা গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার বিভেদ আছে এবং তাহা অবজ্ঞা করা নিরর্থক হইবে। বাহিরে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ, যাহার সম্মুখীন হইতে আমরা দলবদ্ধ। এই সংকটের মধ্যে আমরা কী করিব? এ কথা কি আমার বলার প্রয়োজন আছে যে আমাদের পথ আচ্ছন্নকারী সকল ঝঞ্ঝার মধ্যে আমাদের অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং আমাদের শাসকরা যে-কৌশলই প্রয়োগ করুন তাহাতে অচঞ্চল থাকিতে হইবে? কংগ্রেস আজ গণ-সংগ্রামের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ইহার দক্ষিণ-পন্থী ব্লক ও বামপন্থী ব্লক থাকিতে পারে কিন্তু ভারতের মুক্তির জন্য প্রয়াসী সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনের পক্ষে ইহা একটি সাধারণ মঞ্চ। সুতরাং

আসুন, আমরা গোটা দেশকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা-তলে সমবেত করি। আমি বিশেষ করিয়া দেশের বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির কাছে এই আবেদন করিব যে তাঁহারা উদারতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভিত্তিতে কংগ্রেসের গণতন্ত্রীকরণ ও পুনঃসংগঠনের জন্য সকল শক্তি ও সম্পদের সমাবেশ করুন ; এই আবেদন করিতে যাইয়া আমি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মনোভাবের দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছি। ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ কর্মনীতি আমার কাছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে আমি আপনাদের অনুভূতিকে এই বলিয়া ভাষা দিতে চাই যে, মহাত্মা গান্ধী আগামী আরো বহু বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের জাতির জন্য বাঁচিয়া থাকুন— সমগ্র ভারত আন্তরিকভাবে এই আশা ও প্রার্থনা করে। ভারত তাঁহাকে হারাইতে পারে না এবং এই সংকটকালে তো কিছুতেই নয়। আমাদের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন। আমাদের আন্দোলনকে তিক্ততা ও ঘৃণামুক্ত রাখার জন্য তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন। মানবতার স্বার্থে তাঁহাকে আমাদের আরো বেশি করিয়া প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও এবং এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মূল ভিত্তি বিশেষ। সুতরাং আমরা শুধু ভারতের স্বার্থেই সংগ্রাম করিতেছি না, আমাদের এ সংগ্রাম মানবতার স্বার্থে। ভারতের মুক্তির অর্থ মানবতার পরিত্রাণ।

চাই আত্মত্যাগী কর্মী

১৫ এপ্রিল ১৯৩৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের জন্য কর্মসূচী উপস্থাপন।

ভারতের জাতীয় দাবি লইয়া চাপ সৃষ্টি করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে ভারত সম্মিলিত কণ্ঠে দাবিগুলি লইয়া চাপ সৃষ্টি করিলে তাহার পক্ষে বিরোধিতা করিবার সাহস হইবে না। কিন্তু ভারতের সমবেত কণ্ঠে দাবি উত্থাপন অপরিহার্য। আর এই পথ অনুসরণের জন্য ভারতে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন অনিবার্য কর্তব্য।

ইহা অনুতাপের বিষয় যে এই প্রদেশে জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের যে পরিমাণ প্রভাব থাকা উচিত তাহা নাই। ইহা সত্য যে জাতীয় স্বার্থে বাংলা সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে সে তাহার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ অনুযায়ী সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। ইহা যেমন সত্য যে তাহার ভাগ্যে যে পরিমাণ নির্যাতন জুটিয়াছে তাহা ইহার একটি কারণ, তেমনই ইহাও সত্য যে বাংলায় নেতা ও খাঁটি কর্মীরা অভাব না থাকিলেও কংগ্রেসের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সমবেতভাবে উদ্যোগ করা হয় নাই। আগামী বৎসর বাংলায় কংগ্রেসের কর্মসূচীতে নূতন উদ্যমের ও নূতন প্রাণ সঞ্চারের এবং এ পর্যন্ত যাহারা কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া আছে তাহাদিগকে কংগ্রেসের আওতায় আনার জন্য দৃঢ়সংকল্প প্রয়াস আমাদের মহত্তম কর্তব্য হওয়া উচিত। আমাদিগকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং কী কারণে তাহারা কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পল্লী হইতে পল্লীতে গ্রাম হইতে গ্রামে কংগ্রেসের বাণী প্রচার কংগ্রেস কর্মীদের জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলগুলিতে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যের তাৎপর্য তাঁহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো কর্তব্য। কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোনো সংশয় বা বিভ্রান্তি থাকিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টাও করা উচিত। কৃষকদের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিতে হইবে যে কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠন যাহার মাধ্যমে তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মসূচী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে এবং তাঁহাদের মনে এ বোধের সঞ্চার করিতে হইবে যে কংগ্রেসের লক্ষ্য যে স্বরাজ, সে স্বরাজ ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্য। যে মুসলমান ও তফসীলী সম্প্রদায়ের সদস্যরা এপর্যন্ত বহু সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেন নাই তাঁহাদের নিকট কংগ্রেসকর্মীদের উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে যে নিজেদের স্বার্থেই কংগ্রেসের পতাকা-তলে সমবেত হইয়া একই মঞ্চে তাঁহাদেরই ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ানো উচিত, কারণ একমাত্র কংগ্রেসের যোগাযোগেই তাঁহারা স্বাধীনতা লাভের ও নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা করিতে পারেন। ইহাও তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে কংগ্রেসে হিন্দুরা কিংবা জমিদারেরা প্রভুত্ব করেন ইহা একটি ভুল ধারণা। তফসীলী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে নিজেদের স্বার্থে কংগ্রেসে যোগদান করা তাঁহাদের উচিত ইহা বুঝানো ছাড়াও তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্যতার অন্যায় দূর করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে বাংলায় এমন স্থান রহিয়াছে যেখানে তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর মানুষেরা তথাকথিত উন্নততর শ্রেণীর মানুষদের নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইয়া থাকেন তাহা আর যাহাই হউক মানবিক নয়। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অভিশাপ নির্মূল করিবার জন্য চরম প্রয়াস করিতে হইবে। আর তাঁহারা যদি সাফল্যের সঙ্গে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা তফসীলী সম্প্রদায়ের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদানের অন্যতম প্রধান অন্তরায় অপসারণে সক্ষম হইবেন।

এক কথায়, বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা এমনভাবে কাজ করিবেন যাহাতে বাংলার কংগ্রেস এই মহান প্রদেশে বসবাসকারী সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি রূপে সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিভূ হইয়া উঠে।

আগামী বৎসরের জন্য যে কর্মসূচী আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহা রূপায়িত করিতে হইলে যেমন চাই একদল শিক্ষণপ্রাপ্ত, শৃঙ্খলা-পরায়ণ ও আত্মত্যাগী কর্মী, তেমনই চাই তাঁহারা যাহাতে জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন সেই ব্যবস্থা। আমি সমস্যার এই দিকটির উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই যে প্রতিটি সভ্যদেশে সমগ্র জাতিই, জাতীয় কর্মীদের জীবিকা সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতিস্তরের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন— লোকবল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের সংগ্রাম

সম্পূর্ণরূপে এবং মূলত অহিংস সংগ্রাম। ভারতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র হইল কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ইহাকে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যসাধনে নিয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের জাতীয় কাজের জন্য প্রয়োজন— লোকবল ও অর্থ। অতএব. একদিকে যেমন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও শৃংখলাবদ্ধ পদ্ধতিতে কাজের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত অহিংস কর্মীদের একটি বাহিনী সৃষ্টি করা আমাদের কর্তব্য, তেমনই অপর দিকে জনসাধারণেরও একটি কর্তব্য রহিয়াছে। কংগ্রেসের কাজের জন্য ও কংগ্রেসকর্মীদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যয়িত হইবে এরূপ ধন-ভান্ডার তাহাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। এমন-কি, জনসভাগুলিতেও অর্থসংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে মুক্তিপ্রাপ্ত বিনা বিচারে বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যার কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আমরা এ পর্যন্ত তাঁহাদের জন্য যাহা করিয়াছি তাহা পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইতে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। আমার প্রস্তাব এই যে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা যাহাতে জীবনে পুনর্বাসনের সুযোগ পান, সেই উদ্দেশ্যে সহায়তা দানের জন্য ব্যাপকভাবে অর্থসংগ্রহের সংঘবদ্ধ প্রয়াস করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়াদি আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মূলধন সরবরাহ করা যাইতে পারে। ইহাতে সাফল্য অর্জন করিলে আমরা কংগ্রেসের জন্য বহু-সংখ্যক কর্মী পাইতে পারি।

রাজবন্দীদের মুক্তি প্রসংগে আমি বলিতে পারি যে তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র মুক্তি পান তাহা দেখা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। রাজবন্দীদের মুক্তির স্বার্থে আমরা যেন সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে এমন আচরণ না করি যাহাতে রাজবন্দীদের মুক্তি বিলম্বিত করার কোনো অজুহাত দিবার অবকাশ ব্রিটিশ সরকারের থাকে। এই প্রসংগে আমি বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিবৃতির প্রতিবাদ করিতে চাই। তিনি এই বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে বহুসংখ্যায় রাজবন্দীদের মুক্তির পর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং বাংলায় এখনো গুপ্ত সংগঠনগুলির অস্তিত্ব রহিয়াছে। এখন ইহা সাধারণভাবে জানা যায় যে, এমন-কি, পুলিস বিভাগের গোপনীয় রিপোর্টেও বলা হইয়াছে যে বাংলার যুবসমাজকে হিংসার আনুগত্য হইতে ফিরাইয়া আনা গিয়াছে এবং তাঁহাদের মনোযোগ বর্তমানে গণ-আন্দোলনের প্রতি একাগ্র। রাজবন্দীদের মুক্তির বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ হইতে যে যুক্তি দেখানো হয় অতঃপর তাহার পিছনে শক্তি থাকে কোথায়? কিন্তু সরকার যাহাতে বিনা বিচারে বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি বিলম্বিত করিতে কোনো

রকম অজুহাত খুঁজিয়া না পান তাহা নিশ্চিত করার জন্য আমি জনসাধারণকে অনুরোধ জানাই।

বাংলায় কংগ্রেসের সদস্যপদ সম্বন্ধে আমি একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। একমাত্র যাঁহারা 'খাঁটি' কংগ্রেসসেবী এবং যাঁহারা আন্তরিকতার সহিত কংগ্রেসী আদর্শ অনুসরণ করিতে চান তাঁহাদেরই শুধু কংগ্রেস-সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা উচিত।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রসঙ্গে আমি চাই যে কলিকাতার করদাতা-গণ এই সংস্থায় তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রকৃত কংগ্রেসসেবীদের বাছাই করিবেন। আমি কলিকাতার কংগ্রেসসেবীদের ওয়ার্ড কংগ্রেসগুলি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি এবং এ-বিষয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা দানের জন্য কলিকাতার নাগরিকদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জনগণের সম্মুখে আমার উপস্থাপিত কর্মসূচী কার্যে রূপায়িত করিতে পারিলে তাঁহারা একবৎসরের মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবেন। এই প্রসংগে বাংলার নারী-সমাজ কংগ্রেস আন্দোলনে যে মহান ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আরো বৃহত্তর সংখ্যায় কংগ্রেসের পতাকাতলে তাঁহারা সমবেত হউন— এই আবেদন জানাইতেছি।

আমার সাম্প্রতিক মেদিনীপুর সফর প্রসংগে আমি ওই জেলার জনগণ যে শৃংখলাবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি। আমি আশা করি যে বাংলার সর্বত্র কংগ্রেসসেবীরা অনুরূপভাবে শৃংখলাবোধের মূল্য উপলব্ধি করিতে শিখিবেন।

আমি আশাবাদী এবং বাংলার সম্মুখে যে মহান ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষমাণ সে-বিষয়ে আমার সংশয় নাই। যে কর্মসূচীর রূপরেখা উপস্থাপিত করিয়াছি তাহা যদি আমরা কার্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সত্ত্বেও বাংলার আইন-সভার পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসসেবীরা যে খুব বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হইবেন— সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

সকল প্রকার বিধিসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ফেডারেশনের বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। যদি ভারতের অনিচ্ছুক জনসাধারণের উপর ইহা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একটি সংকট ডাকিয়া আনিবেন, যাহার সম্মুখীন হইবার জন্য কংগ্রেস

সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে এবং যাহার সকল দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপর বর্তাইবে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে মন্ত্রীসভার পদত্যাগের ফলে সংকটের উদ্ভব হইয়াছে। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীরা সর্বদা এই প্রকার ঘটনার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন এবং তাঁহারা কোনো প্রকারেই কংগ্রেসের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা হেয় হইতে দিবেন না। গভর্নরের নিয়োগ লইয়া উড়িষ্যায়ও এই ধরনের সংকট সৃষ্টি হইতে পারে।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে কংগ্রেসের সংগ্রামের অবসান হয় নাই এবং ভারতের জনসাধারণকে যে-কোনো জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বন্দেমাতরম্

১০ এপ্রিল ১৯৩৮ স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ।

মানপত্রে আমার সম্বন্ধে এত কিছু সুন্দর কথা বলা হইয়াছে তাহার যোগ্য হইলে নিজেকে আমার অতিমানব মনে করিতে হয়। আমি কী তাহা আমি নিজে জানি। আমি ইহাও জানি যে এই ধরনের উপলক্ষে বাঙালী যুবসমাজ উদারতার কতটা শিখরে আরোহণ করিতে পারেন। সুতরাং, এই উপলক্ষে আপনারা যে ভাষার আতিশয্য ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ত্রুটি আমি ধরিব না। আপনারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রতি আমি গুরুত্ব দিব না। ইহার মধ্যে যে সুগভীর ও প্রকৃত প্রীতি নিহিত রহিয়াছে তাহাই আমি নিষ্কাশিত করিয়া লইব। আপনারা আমাকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন সেজন্য আমি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আপনাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি নিজের ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন এবং ভালোবাসার যে গভীর অনুভূতি এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে আপনাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা আমি জানি। আপনারা যে সংগ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন তাহা হয়তো আপনাদের গভীরতর উৎসাহ বর্ধন করিয়াছে।

যখন আমি আপনাদের সকলের মতো ছাত্র ছিলাম এই হলে পা দিতেই সেই-সব আনন্দের দিনে আমার চিন্তা ফিরিয়া গিয়াছিল। আমাদের বহু অভিজ্ঞতা আমার মনে বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঝলসাইয়া উঠে এবং আমি নিজেকে প্রশ্ন করি,

সময় কি বিকল হইয়া গিয়াছে, যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে আপনাদের এতটা বেগ পাইতে হইয়াছে। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে যখন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমাকে এই কলেজের আতিথ্য চাহিতে হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে আমাকে এই আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কিন্তু ১৯৩৮ সালে এই আতিথ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

ইহা আমার কাছে বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে আপনাদিগকে কিছু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই বাধার অবসান ঘটিয়াছে এবং আপনারা জয়ী হইয়াছেন ইহাতে আমি এখন কেবল-মাত্র আমার সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু ইহাতে আপনারা অকারণ উল্লসিত হইবেন না। আপনারা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা আপনাদের অন্তর্নিহিত অধিকার মাত্র— তাহা অপেক্ষা বেশি-কিছুও নয়, কিছু কমও নয়। আপনারা ভালোভাবে অবগত আছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছাত্রসমাজই একান্তভাবে রাজনীতি পরিচালনা করেন। কোনো কোনো উপলক্ষে তাঁহারা অতিথি হিসাবে বিখ্যাত জননেতাদের আহ্বান করেন, যাহাতে প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গীর মতামত ব্যক্ত হইতে পারে এবং যাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে সেজন্য তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার অভিমতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান। আমি আশা করি যে আপনারা যে বিষয়ে জয়লাভ করিয়াছেন সে বিষয়ে চিরদিনের মতো আপনাদের জয় হইয়াছে এবং অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ সংগ্রাম করিবার উপলক্ষ আর দেখা দিবে না।

একজন তরুণ মুসলমান ছাত্রের মুখ হইতে উচ্চারিত কয়েকটি মন্তব্য শুনিয়া আমি খুবই সুখী হইয়াছি। তাঁহার মন্তব্য শোনা মাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন আমি ছাত্র ছিলাম এবং একটি ধর্মঘটে অংশ গ্রহণের সুযোগ হইয়াছিল, সেই পুরাতন দিনগুলিতে আমার মন চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময় কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের মনোবল নষ্ট করার জন্য এবং তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমার খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে যে সেই সময় মৌলবী সাহেবরা মুসলমান ছাত্রদের ধর্মঘটে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৌলবী সাহেবদের সকল বাক্‌পটু আবেদন মুসলমান ছাত্রদের মনে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং ধর্মঘট সফল হইয়াছিল।

সেই-সকল দিন হইতে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ মাথা চাড়া দিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। যাঁহারা বিশ্বাস করেন

যে দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস প্রকাশ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতা তাহার শেষ ধাপে পেঁৗছিয়াছে, আমি তাঁহাদের অন্যতম। বাস্তবিকই ইহা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শেষ সংগ্রাম করিতেছে। নব পর্যায়ের যে আন্দোলন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে— যে আন্দোলন শুধু ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিরই প্রতীক নয়, অর্থনৈতিক মুক্তিরও প্রতীক— তাহা দ্রুতগতিতে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাইতেছে। যাঁহারা এক সময় ইহার প্রভাবাধীন ছিলেন তাঁহারা এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যাঁহারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছেন তাঁহাদের সহিত নিজেদের ভাগ্য যুক্ত করিতে হইবে। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ভাঙিয়া ফেলিতেছে এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিমূলে ধ্বংস করিতেছে। এইজন্যই আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে আজ যাহা ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যাহা ঘটিতে পারে তাহা সত্ত্বেও আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নাই যে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা তাহার শেষ ধাপে আসিয়া পেঁছাইয়াছে। কোনো তরুণ কিংবা কোনো তরুণী— তিনি হিন্দু, খৃস্টান, মুসলমান কিংবা পার্শী যে-কোনো ধর্মেরই হউন— তাঁহার এ কথা উপলব্ধি না করিয়া উপায় নাই যে ভারতের প্রকৃত মুক্তি— যাহার অর্থ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার মুক্তি— আমাদের দেশের কোটি কোটি মূক ও নির্যাতিত মানুষের জন্য কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনিবে। এই নূতন আন্দোলনের যদি অগ্রগতি হয়— যাহা হইতে বাধ্য— তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে এক দশক অতীত হইবার পূর্বেই আমরা জাতীয় ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আমি বিশ্বাস করি যে এই নূতন আন্দোলন যে আমাদের খৃস্টান বন্ধুদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করিতেছে ইহা যুগের একটি সুলক্ষণ। আমরা খৃস্টান কিংবা হিন্দু কিংবা মুসলমান যাহাই হই-না-কেন, আমরা সকলেই ভারতীয় এবং আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ অভিন্ন। নূতন আন্দোলন খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিতেছে— ইহা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক ও উৎসাহজনক। বেশি দিন পূর্বে নয়, রোমে 'প্রোপাগান্ডা কলেজে' পাঠরত আমাদের বহুসংখ্যক স্বদেশবাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী। আমি দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে সর্বাধুনিক খবর রাখিতেন। ভারতে যাহা-কিছু ঘটিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহাদের গভীর

আগ্রহ ছিল। সেই সময় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কয়েকজন স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের সহিত রোমান ক্যাথলিক মতাদর্শ ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করি এবং ক্ষোভের সহিত বলি যে আমাদের জনসাধারণের নিকট ক্যাথলিক ধর্ম এমনভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে আমাদের আত্মার উপরও জাতীয়তাবিরোধী প্রভাব সৃষ্টি হইয়াছে।

আমি এ কথা বলিতে পারিয়া আনন্দিত যে এই অধ্যায় এখন শেষ হইয়াছে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে আমি যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের অধিবাসী ছিলাম সে সময় বহুসংখ্যক বাঙালী খৃস্টান আমার সহবন্দী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলন উপলক্ষে ধৃত বহুসংখ্যক খৃস্টানকে কারাগারে দেখিতে পাওয়া ছিল সম্পূর্ণরূপে নূতন একটি ঘটনা।

আপনাদের কিছু উপদেশ দিতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। আমি উপদেশ দিবার চিন্তা কখনো পছন্দ করি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের নিকট বলিতে পারি, দিবার মতো ইহাই আমার আছে। আমি বিশ্বাস করি ভারতে আমাদের দুঃসাহসিকতার মনোভাব একান্তভাবে প্রয়োজন। যুগ-যুগব্যাপী দাসত্বের ফলে আমরা গতানুগতিক পথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনে পড়ে, আমি যখন স্কুলে পড়িতাম তখন আমার একটি অভিমত এই ছিল যে, আমি গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিব না। এ বিষয়ে আমার মন নিঃসন্দেহ ছিল। আমি মনে করি যে দুঃসাহসিকতার জীবন যাপনে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। কী ধরনের দঃসাহসিকতা চাই তাহা আমাদের নিজেদেরই বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু দুঃসাহসিকতার ধরন যাহাই হউক-না-কেন, যাঁহারা দুঃসাহসিকতা ভালোবাসেন ও তাহার জন্য জীবনপণ করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে। যাঁহারা মাউন্ট এভারেস্টে অভিযান পরিচালনার প্রয়াস করিয়াছেন তাঁহাদের আমি মহান পুরুষ বলিয়া মনে করি কারণ তাঁহাদের মধ্যে যাহা মহান তাহা দুঃসাহসিকতার প্রতি আকর্ষণ এবং অজানার হাতছানির প্রতি তাঁহাদের প্রলোভন। এই দুঃসাহসিকতার মনোবৃত্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো জাতি কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে কিংবা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এরূপ উদাহরণ আপনারা খুঁজিয়া পাইবেন না। এক মুহূর্তের জন্য ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। একদল দুঃসাহসী লোক সমুদ্রের বিপদ তুচ্ছ করিয়া অজানা দেশ জয়ের জন্য ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হইল দুঃসাহসিকতার মনোবৃত্তি। একটা

সময় ছিল যখন ভারতীয়দের মধ্যেও এই দুঃসাহসিকতার মনোবৃত্তি ছিল, যখন তাঁহারাও সমুদ্রের বিপদ তুচ্ছ করিতেন এবং পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিতেন। আমাদের ইতিহাসের তাহা এক গৌরবময় অধ্যায়। ভারতের সংস্কৃতি সমগ্র সভ্য জগতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর মানুষ আমরা, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কৃতিত্বে বিস্ময় অনুভব করি। আপনারা যদি নিজেদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চান, ভারতকে যদি আপনারা স্বাধীন ও সুখী দেশ করিতে চান তাহা হইলে আপনাদিগকে মনস্তাত্ত্বিক মূলে প্রবেশ করিতে হইবে। আপনাদিগকে দুঃসাহসিকতার মানস লালন করিতে হইবে, যে মানস সকল প্রকার আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। কোন্ ধরনের দুঃসাহসিকতা আপনার পছন্দ তাহা আপনাদের নিজেদেরই বাছিয়া ঠিক করিতে হইবে। আপনারা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে একপ্রকার দুঃসাহসিকতা বলিতে পারেন, সংস্কৃতি চর্চাও অপর এক ধরনের দুঃসাহসিকতা এবং রাজনৈতিক জীবনও দুঃসাহসিক মানসের আর-এক রূপ। এই দুঃসাহসিকতার মননা ছাড়া কোনো প্রগতি সম্ভব নয়। ইউরোপ ও এশিয়ার যে-সকল দেশ অপর দেশ হইতে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে তাহাদের দিকে দেখুন এবং তাহাদের প্রগতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করুন। আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ইহার একটি অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, এই দুঃসাহসিক মানসিকতার অস্তিত্ব। আমরা যদি দুঃসাহসিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে অনতিবিলম্বে দাস-মনোভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা আমাদিগকে স্বাধীন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব আনিয়া দিবে। আমার জীবনে ইহাই সর্বাধিক মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা। আমি আজ আপনাদের যাহা বলিতেছি, আপনারা যদি বিশ বৎসর পরে নিজেদের প্রশ্ন করেন যে আপনাদের প্রগতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কী ছিল, তাহা হইলে আপনারাও একই উত্তর দিবেন।

আরো একটা বিষয় আছে। যখনই আপনারা সমাজ কিংবা দেশ কিংবা বিশ্বের সহিত নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা ভাবেন তখন সর্বদা নিজেদের স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষ রূপে ভাবিবার চেষ্টা করিবেন। একমাত্র তখনই আপনারা যে-কোনো সমস্যার সম্মুখীন হউন-না-কেন তাহা সাধনের প্রকৃত উপায় খুঁজিয়া পাইবেন। ভারত স্বাধীন হইবে— এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। প্রশ্ন হইল শুধু সময়ের। আপনি যদি পৃথিবী ও ভারতের দিকে বাস্তববাদী রাজনীতিকের দৃষ্টিতে কিংবা ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তাকান, আপনি ইহা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন না।

হরিপুরায় আমার সভাপতির ভাষণে আমি সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলাম যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও খণ্ড-বিখণ্ড হইতে চলিয়াছে। একমাত্র যে পদ্ধতিতে তাহা এড়ানো যাইতে পারে তাহা এই সাম্রাজ্যকে স্বাধীন দেশসমূহের ফেডারেশনে পরিণত করা।

আমি অপর একটি বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই। সন্দেহ নাই যে এই দৈহিক কাঠামো লইয়া আমরা জীবন-সংগ্রামের বোঝাপড়া করিতে পারিব না। প্রতিদিন জীবন-সংগ্রাম কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। আমাদের সকল প্রকার নৈতিক ও বুদ্ধিগত শক্তি লইয়াও কিছু পরিমাণ দৈহিক শক্তি ব্যতীত আমরা সাফল্য অর্জন করিতে পারিব না। সুতরাং বাংলার ছাত্রসমাজের সম্মুখে একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইল দৈহিক শক্তির উন্নয়ন। পাঞ্জাবের ছাত্রদের কাছে এই উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাংলার ছাত্রদের কাছে এবং আরো বিশেষভাবে মেয়েদের কাছে এই উপদেশের প্রয়োজন আছে।

আরো একটি বিষয় আছে। তাহা আমাদের দৃঢ়তার অভাব। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যে-পরিমাণ সম্ভাবনা আছে তাহাতে আমরা কৃতিত্বের যে-কোনো শিখরে উঠিতে পারি। আমাদের প্রয়োজন হইল কিছু পরিমাণে দৃঢ়তা। যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত জীবনে কঠোর পরিশ্রমের মূল্যই খুঁটির কাজ করে। দীর্ঘস্থায়ী দাসত্বের ফলে যে-সব মানসতাত্ত্বিক ত্রুটি দেখা দেয়, দৃঢ়তার অভাব তাহার অন্যতম। আপনারা যদি জনসাধারণের মধ্যে এই গুণ সঞ্চারিত করিতে পারেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাঁহারা বর্তমান বুদ্ধিগত সম্পদ কিংবা কৃতিত্ব লইয়া আজিকার তুলনায় একশো গুণ বেশি উন্নততর হইয়াছেন।

আমি পরীক্ষিত ও অননুতপ্ত আশাবাদী বলিয়া আমার দেশের যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজের উপর আমার সর্বাধিক আস্থা না থাকিয়া পারে না। তাঁহারাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক। আমি আপনাদের সামূহিক প্রয়াসের উপর মনঃসংযোগ করিতে বলিব। আপনাদের গোষ্ঠী-প্রবণতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে দুনিয়ায় স্থান পাইতে চাহিলে আমাদের সকল সম্পদ ও সকল কৃতিত্ব একত্রিত করিতে হইবে। মনে করিবেন না যে স্বাধীনতা পাইলে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান আপনা হইতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জন তীব্রতর একটি সংগ্রামের আরম্ভ বিশেষ হইবে— তাহা নূতন ভারত গড়িয়া তোলার সংগ্রাম। আপনাদিগকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

নূতন প্রাণের স্পন্দন

সুর্মা উপত্যকা সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবৃতি।

যে সুন্দরী সুর্মা উপত্যকা দূরবর্তী শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমাকে সর্বদাই মুগ্ধ করিয়াছে। ইহার নীচু নীচু পাহাড়গুলি, আঁকিয়া-বাঁকিয়া যাওয়া নদীগুলি এবং হাস্যোজ্জ্বল ক্ষেত্রগলি অনন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ। এই কারণেই অতীতে আমি বহুবার শ্রীহট্ট পরিদর্শন করিয়াছি— তবে এবার আসিয়াছি শান্তি-দৌত্যে। আমার সকল সহকর্মীদের ধন্যবাদ যে তাহাদের সহযোগিতার ফলে সে দৌত্য সফল হইয়াছে। আমরা এখন দেশের এই অংশে কংগ্রেস-কর্মসূচীর বলিষ্ঠ রূপায়ণ প্রত্যাশা করিতে পারি।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার নজরে পড়িয়াছে জনসাধারণের মধ্যে নূতন ধরনের স্পন্দন। তাঁহাদের আত্মায় সাড়া জাগিয়াছে এবং তাঁহাদের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি নূতন আশার ঝলমল দ্যুতি। প্রতি স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বহুসংখ্যক মুসলমান যোগ দিয়াছেন এবং গভীর মনোনিবেশে কংগ্রেসের আহবান শুনিয়াছেন।

যে-সব ধনী ব্যক্তি নেতৃত্বের ভান করেন তাঁহাদের মনোভাব যাহাই হউক-না-কেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই যে মুসলমান কৃষক-সমাজ কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে আরো নিকটে আনার জন্য প্রয়োজন স্থানীয় কংগ্রেস সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট বলিষ্ঠতর আবেদন ও আরো ব্যাপক অভিযান এবং কৃষক-সমাজের অভিযোগগুলির উদার সমর্থন।

আজ আমার স্মরণে আসিতেছে ১৯৩১ সালে, যখন আমি আমাদের কর্মীদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ মিটাইবার জন্য শ্রীহট্ট পরিদর্শন করিয়াছিলাম। আমার কয়েকজন সহকর্মীকে ধন্যবাদ, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের মনোবৃত্তির ফলেই আমি তখন আমার শান্তিদৌত্যে সফল হইয়াছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আমার মনে আশার সঞ্চার করে যে বর্তমান মীমাংসা স্থায়ী হইবে। আমি সুর্মা উপত্যকার সকল অংশে যে উদ্দীপনা দেখিয়াছি তাহাতে আমার মনে প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে ইতিমধ্যে এই মীমাংসায় জাদুর মতো ফল দেখা গিয়াছে।

শ্রীহট্টে এবং কাছাড়ে আমি দেখিতেছি যে কৃষক-সমাজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছেন। সুতরাং যেখানেই তাঁহাদের বৈধ অভিযোগ

আছে, সেখানেই তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করা কংগ্রেস সংগঠনগুলির অবশ্য-কর্তব্য।

আমি আশা ও বিশ্বাস করি যে বাংলার কংগ্রেস-কর্মীরা গত কয়েক বৎসরে যে ভুল করিয়াছেন সুর্মা উপত্যকার কংগ্রেস-কর্মীরা সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন না এবং অন্যান্য সংগঠন অগ্রসর হইয়া শ্রমজর্জর ও দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্যোগী হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন না। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে কৃষক-সমাজই আমাদের মেরুদণ্ড এবং তাহারা না থাকিলে গণসংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের অস্তিত্বও থাকিবে না।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কৃষকদের সংগঠনগুলির প্রতি আমরা বৈরী মনোভাব গ্রহণ করিব। পক্ষান্তরে যেখানে এই ধরনের সংগঠন ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা যদি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতি অনুসারে কাজ করে, সেখানে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমাদের কাজ করা উচিত।

সুর্মা উপত্যকায় একটি কর্মক্ষেত্র এ পর্যন্ত কংগ্রেস সংগঠনগুলি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। চা-বাগানের শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নতিবিধানই সেই কর্মক্ষেত্র। তাঁহাদের জন্য এবং তাঁহাদের মধ্যে কাজ করার পথে যে-সকল অসুবিধা রহিয়াছে আমি সে সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের দুঃসহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমি সুর্মা উপত্যকার কয়েকটি স্থানে এই মর্মে বিবরণ শুনিতে পাইয়াছি যে লোকাল বোর্ডের টাকায় সংরক্ষিত পথ যেখানে চা-বাগানের মধ্য দিয়া কিংবা নিকট দিয়া যায় সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চা-বাগানের মালিকরা সেই পথ দিয়া জনসাধারণকে অবাধ চলাচলের অধিকার দেন না। আমাদের জাতীয় জীবনে আসাম-উপত্যকা সহ সুর্মা উপত্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। এই দুইটি উপত্যকা লইয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রবেশদ্বার গঠিত। ইহা অত্যাবশ্যক যে ভারতের অন্যান্য প্রবেশদ্বারের মতো এই প্রবেশদ্বারের উপরও কংগ্রেসের পতাকা উড়িবে। এই দুইটি উপত্যকায় আমাদের বন্ধুগণ ইহা স্মরণ রাখিয়া প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

২৮ এপ্রিল ১৯৩৮

মেদিনীপুর পরিদর্শন

এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট প্রেরিত বক্তব্য।

বাংলাদেশে এমন কোনো স্থান যদি থাকিয়া থাকে যাহা ১৯২১ সাল হইতে একনাগাড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারের কুনজরে রহিয়াছে, তবে তাহা মেদিনীপুর। এই জেলাই প্রথম ট্যাক্স-বন্ধের পদ্ধতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহার ফলে মেদিনীপুরের কংগ্রেস-কর্মীরা সরকারকে ১৯১৯-এর গ্রাম স্বায়ত্ত-শাসন আইন প্রত্যাহারে বাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মেদিনীপুর কংগ্রেসের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হইয়া রহিয়াছে। ১৯৩৩ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় এবং তাহার পরে মেদিনীপুরকে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার করিয়া তোলা হইয়াছিল এবং কয়েকটি দুঃখজনক সন্ত্রাসবাদী ঘটনার দরুন ইহা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহাকে কার্যত সামরিক আইন বলা চলে, কয়েক বৎসর ধরিয়া জেলাটি তাহার অধীনে ছিল। ভারতের অন্যান্য অংশে অনুরূপ সংগঠনগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার দীর্ঘদিন পরেও মেদিনীপুরে কংগ্রেস সংগঠনগুলির উপর তাহা চালু ছিল।

নিষেধাজ্ঞার সাম্প্রতিক প্রত্যাহারের পর আমি ওই জেলার কংগ্রেস সংগঠন-গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। আমার সহ-কর্মীগণ আমাকে একেবারে রাজকীয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য ব্যাপক আয়োজন করিয়াছিলেন। মহকুমা শহর তমলুক, কাঁথি ও ঘাটালে আমার যাত্রাপথে বিজয়-অভিযানের মতো— অগণিত সুসজ্জিত তোরণের মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং পথে পথে ছয় বৎসর পরে কংগ্রেসের বাণী শুনিবার জন্য হাজারে হাজারে গ্রামবাসী সমবেত হইয়াছিলেন। এইভাবে সভার পর সভায় এবং পরে বেলাশেষে একটি সুবিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়া ও তৎপরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে আমার দৈহিক শক্তি নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু যখন গ্রামবাসীদের উচ্ছ্বসিত উৎসাহে আমার মেরুমজ্জা পর্যন্ত আনন্দে শিহরিত হইয়া উঠিল তখন সেই গুরুতর ক্লান্তির অস্তিত্ব আর ছিল না। স্বাধীনতার সংগীতে এবং সত্য ও পথনির্দেশ লাভের ব্যগ্রতায় জনসাধারণের যে আত্মা অনুরণিত ছিল, তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা প্রকৃতই

একটা অবিস্মরণীয় উদ্দীপনা হইয়া উঠিয়াছিল। মেদিনীপুরের অভিজ্ঞতা আমার সত্তাকে অস্তিত্বের একটা ঊর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত করিয়াছিল।

কিন্তু মেদিনীপুর যেমন তাহার নবোদ্গত উৎসাহের দ্বারা আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তেমনই সে আমাকে বর্তমান পরিস্থিতির কুৎসিত দিকগুলির সহিত পরিচিতও করাইয়াছিল— যে কুৎসিত দিকগুলির কথা এখনো বহির্জগৎ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। আমি সেখানে জানিয়াছিলাম যে এখনো মেদিনীপুর শহর ও কাঁথি শহরে ১৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের তরুণদের আগমন ও নির্গমনের ব্যাপারে থানায় বিবরণ দাখিল করিতে হয়। মেদিনীপুর শহরে ১৪ হইতে ৩০ বৎসর তরুণদের পুলিসের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কতকগুলি জনপথ দিয়া চলাচল করিতে দেওয়া হয় না। তৃতীয়ত, সরকারের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ছাত্ররা বাড়ি হইতে তিন মাইলের অধিক দূরবর্তী কোনো বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না। সরকার এই অবমাননাকর আদেশগুলির প্রথমটি সবেমাত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া আমি অবশ্য আনন্দিত।

আমার ঘাটাল যাইবার পথে শালবনীতে ছাত্ররা যাহাতে বাহিরে আসিয়া আমার জনসভায় যোগ দিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাদিগকে তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাঁটাতার-ঘেরা প্রবেশ-দ্বারের পিছনে জটলাবদ্ধ ছাত্রদের খোঁয়াড়ে আটকানো ভেড়ার দলের মতো দেখাইতেছিল এবং তাহাদিগকে দাস-সন্তানের দল বলিয়া মনে হইতেছিল। ইহা ছাড়া, অত্যুৎসাহী পুলিস অফিসাররা এখনো কোনো কোনো স্থানে সক্রিয়। সর্বাধিক বেদনাদায়ক যে-সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছিলাম তাহার একটি ভগবানপুরের নিকটবর্তী ঘটনা; সেখানে আইন-অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে সরকারী গুলিবর্ষণে বিকলাঙ্গ শিকারদের আমার সম্মুখে আনা হইয়াছিল। সেই সময় গুলিতে সরাসরি নিহত কিছু ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

অন্যান্য জেলার মতো মেদিনীপুরে কৃষক-সমাজের মধ্যে নূতন চেতনার সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েকটি স্থানে সথানীয় কৃষকদের অভিযোগ-সংবলিত মানপত্র আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। ওই জেলায় আমার সহকর্মীদের প্রতি আমার স্বার্থহীন উপদেশ ছিল যে কৃষকদের বৈধ অভিযোগগুলির প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের সাহসের সহিত কৃষকদের পাশে দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহারা যদি সময়মতো ইহা করেন তাহা হইলে কৃষকদের উপকারই শুধু হইবে না, কংগ্রেস কৃষক-সমাজের নেতৃত্বও করিতে

পারিবে এবং স্বতন্ত্র কোনো কিষাণ-আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে না। আর এই কর্তব্য পালনে কংগ্রেস ব্যর্থ হইলে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কহীন একটি কিষাণ-আন্দোলনের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। মেদিনীপুরের মতো যে-সব জেলায় কংগ্রেসের বিপুল গণ-আবেদন রহিয়াছে সেখানে কংগ্রেস যদি কৃষক-সমাজের স্বার্থে সংগ্রাম করে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কোনো কিষাণ-আন্দোলনের প্রয়োজন থাকিবে না। অন্যান্য জেলায় যেখানে স্বতন্ত্র কিষাণ-সংগঠন ইতিপূর্বে গঠিত হইয়াছে কিংবা নিপীড়িত জনসাধারণের নিকট পেঁছিবার মাধ্যমরূপে গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে, সেই-সব জেলা হইতে মেদিনীপুরের পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের।

মেদিনীপুর আমাদের যে শিক্ষা দেয় তাহা এই যে, একবার জনসাধারণের আত্মা জাগ্রত হইলে কোনোপ্রকার নির্যাতন কিংবা নিপীড়নই তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে পারে না। সামরিক আইনের সমতুল বহু বৎসরব্যাপী নির্যাতন আমলা-তন্ত্রের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল যে, মেদিনীপুরের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসরের নির্বাচন অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। আর এখন এই জেলা সফর করিয়া আমার মনে সন্দেহ নাই যে, যদি পরবর্তী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় এবং যখনই তাহা হোক-না-কেন, ওই জেলা তাহার অতীত রেকর্ডও ছাপাইয়া যাইবে এবং ওই আন্দোলন অধিকতর সাফল্য দেখাইবে।

৪ জুন ১৯৩৮

স্বরাজ সাম্প্রদায়িক-রাজ নয়

১৪ জুন ১৯৩৮ কুমিল্লার মহেশ প্রাঙ্গণে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আমি যে-কংগ্রেসের একজন দীন সেবক সেই কংগ্রেসের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের স্মারকরূপে, আমাকে প্রদত্ত অদ্যকার এই চমৎকার সংবর্ধনাকে গ্রহণ করিতেছি। ছয় বৎসর পূর্বে এই স্থানটি আমার পরিদর্শনের পর হইতে দেশ তীব্র নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছে। কখনো হতাশা আমাদের গ্রাস করিয়া বসে এবং মনে হয় যেন আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্রগতি হইতেছে না। কিন্তু আপনারা যদি নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করিতে চান, তাহা হইলে আপনাদিগকে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের দিকে নজর দিতে হইবে। যদিও নির্যাতনের একটা ঢেউ আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং হতাশার কালো ছায়া জাতির উপর নামিয়া আসিয়াছিল, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে আমরা স্বাধীনতার পথে বিপুলভাবে অগ্রসর হইয়াছি। ভারতীয়দের মনে নূতন আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারত তাহার জন্মগত অধিকার— স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আজ ব্রিটিশ-ভারতের বৃহত্তর অংশে কংগ্রেস সরকার কর্মরত। যাঁহারা সরকারের হাতে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন তাঁহারা আজ সরকারী পদে সমাসীন। হরিপুরা হইতে ফিরিবার পথে বোম্বাইতে পৌঁছানোর পর মন্ত্রীগণ ও পুলিস বাহিনী আমাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩২ সালে আমি বোম্বাই পুলিসের নিকট হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার পাইয়াছিলাম যখন বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমার সঙ্গী হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে পুলিস কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আদেশ মানিয়া চলে। কী উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই না ঘটিয়াছে! বড়োলাট কি দাবি করিতে পারেন যে তিনি সাতটি প্রদেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন?

আমরা বাংলার মন্ত্রীদের মুখে "সিংহ" ও "ব্যাঘ্রের" কথা শুনি। তাঁহারা কটূক্তি করিতে পারেন। আমরা সে বিদ্যায় পারদর্শী হই নাই। যাহারা সবল তাহারা অন্যের সম্বন্ধে কটূক্তি করে না। কংগ্রেস যদি গত ৫০ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন না পরিচালনা করিত, তাহা হইলে মিঃ ফজলুল হক ও খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন আজ নিজেদের মন্ত্রী হিসাবে দেখিতে পাইতেন কি? বলা হইয়া থাকে যে বাংলায় মুসলমান মন্ত্রীসভা বলিয়া কংগ্রেস সেই মন্ত্রীসভাকে

উৎখাত করিতে চায়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বাংলার মন্ত্রীসভাকে চ্যালেঞ্জ জানাইতেছি এবং আশা করি যে তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা এগারো জন মুসলমান মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করুন। তাঁহারা যদি যোগ্য ও দেশপ্রেমিক ভদ্রলোক হন, তবে কংগ্রেস তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবে না। যে বিষয়ে আপত্তি তাহা হইল এই যে মন্ত্রীসভায় যোগ্যতা ও দেশ-প্রেমের অভাব। আমি আরো অগ্রসর হইয়া বলিব যে, যদি এগারো জন অযোগ্য হিন্দুকেও মন্ত্রী করা হয় তাহা হইলেও কংগ্রেসের বিরোধিতা কিছুমাত্র কমিবে না। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে না। এ ধরনের মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনগণকে আর কতকাল ধোঁকা দেওয়া যাইবে? আপনারা কিছু লোককে চিরদিন বোকা বানাইয়া রাখিতে পারেন, সকল লোককে কিছুকালের জন্য বোকা বানাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্ত সকল লোককে চিরদিন বোকা বানাইয়া রাখিতে পারেন না।

সর্বব্যাপক নগ্নতায় সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাতে হতাশ হই না। ইহার পিছনে যে চরিত্র ও কারণগুলি আছে তাহা আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহারা মুসলমানগণকে কংগ্রেসের বাণী শুনিতে বারণ করেন কেন? বস্তুত স্বাধীনতার বাণী যদি মুসলমান জনগণকে কংগ্রেসের দিকে টানিয়া লয় তাঁহারা সেইজন্য উদ্বিগ্ন। তাঁহারা নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে এ কথা জানেন সে অবস্থায় তাঁহাদের নেতৃত্ব হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে। বাংলার মুসলমান জনগণ আজ স্বাধীনতার বাণী শুনিবার জন্য অধীর। নির্যাতিত, অজ্ঞ দরিদ্ররাও আজ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। শ্রমসিক্ত জনসাধারণ যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তাহার কোনোটির সমাধান করিতে পারিবে কি? কি ভাবে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হইবে সে সম্বন্ধে আর কোনো সংগঠন কোনো পথ-নির্দেশ করিয়াছে কি?

কিন্তু কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে দাসত্বের অবসানই এই অভিযোগগুলি প্রতিকারের উপায়। পরাধীনতার শৃংখল যতদিন থাকিবে ততদিন এই অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি নাই। স্বরাজ কোনো সম্প্রদায়বিশেষের জন্য নয়। স্বরাজের অর্থ হইল হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সরকার পরিচালনা। যতদিন পর্যন্ত না আমরা শাসকদের পদ অধিকার করি, ততদিন এই সকল গুরুতর সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হইবে না।

ইহাই কংগ্রেসের জবাব। অন্যেরা স্পষ্ট করিয়া বলুন তাঁহারা স্বাধীনতা চান কিনা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহারা অতীতে কী করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেই বা কী করিবেন? হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া "হিন্দুরাজ"-এর ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী জনসাধারণের, কৃষক ও শ্রমিকদের স্বরাজ সর্বাধিক প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে স্বাধীনতা অর্জন করিতেই হইবে। যাঁহারা সংগ্রাম করেন তাঁহাদের হাতেই ক্ষমতা আসিবে। সংগ্রামে যোগদানকারী সমগ্র জাতি বিজয়ের ফল ভোগ করিবে। একটা সার্বজনীন ভিত্তিতে স্বাধীনতার সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা আজ স্বাধীনতা-সংগ্রামের এমন একটা স্তরে পেঁছিয়াছি যেখান হইতে পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন ওঠে না। আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া যাইতেই হইবে। একমাত্র নিজের শক্তির উপর একটা জাতির শক্তি নির্ভর করে না। ইহা আংশিকভাবে শত্রুর তুলনামূলক শক্তির উপর নির্ভর করে। শত্রুর দুর্বলতা দিয়া আমাদের শক্তির পরিমাপ হইবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অদ্যকার অবস্থা কি? দশ বৎসর আগে ব্রিটিশ রাজ যাহা ছিল তাহা হইতে আজিকার ব্রিটিশ রাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল নৌশক্তির উপর; কিন্তু আধুনিক কালে নৌশক্তি তাহার চরম গুরুত্ব হারাইয়াছে। বর্তমানে সামরিক অভিযানে বিমান বাহিনীর শক্তি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্যই ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল নীরব দর্শক। আমরা যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও অবস্থার দিকে তাকাই তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে আমরা যে অসহায় নই এ কথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভালো করিয়া বুঝিয়াছে। আসুন আমরা দূর প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাই। চীনের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। চীনের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলি চুক্তির দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাহারা সে প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছে কেন? ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। তাহারা কি প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখিয়াছে? অস্ট্রিয়া আজ জার্মানীর কবলে। মিশর এবং আয়ার্ল্যান্ড বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, কেননা তাহাদের সম্মিলিত দাবির পশ্চাতে সমগ্র জাতির সমর্থন ছিল। কংগ্রেস আজ সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। ব্রিটিশদের মনোভাবেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। তাঁহারাও বুঝিয়াছেন যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসিয়াছে এবং ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র বিকল্প হইল কংগ্রেস শাসন। আমাদের

স্বাধীনতার দাবিতে বাধা দিবার মতো কোনো শক্তি পৃথিবীতে নাই। সাম্প্রদায়িকতা তাহার শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এইজন্যই সাম্প্রদায়িক নেতারা জনসাধারণকে কংগ্রেসে যোগদান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

কংগ্রেসের হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবে। কংগ্রেসকে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈধ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং তাহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কোনোরূপে কংগ্রেস জাতীয়তার ভিত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। কংগ্রেসের পশ্চাতে জনসাধারণের অনুমোদন রহিয়াছে। সেইজন্য কংগ্রেস সংখ্যালঘু সমস্যা লইয়া মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিতে দ্বিধা করে না। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কংগ্রেসের মর্যাদা এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। উহা একটি স্পষ্ট লাভ। কংগ্রেস ন্যায়বিচার ও সত্যের ভিত্তিতে স্থির রহিয়াছে বলিয়া আপস-আলোচনা ব্যর্থ হইলেও কংগ্রেসের মর্যাদা তাহাতে আদৌ ক্ষুণ্ণ হইবে না। এ কথা সত্য যে আমরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাই নাই ; কিন্তু ইহাও অবিসংবাদিত সত্য যে স্বাধীনতা আসিতেছে। একমাত্র প্রশ্ন হইল তাহা রক্ষার জন্য আমরা কিভাবে নিজেদিগকে প্রস্তুত রাখিব। অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে। চীনারা এবং স্পেনীয়রা তাঁহাদের গণতান্ত্রিক সরকারকে স্থিতিশীল করিতে পারে নাই বলিয়া আজ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। রাশিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল বলিয়া স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করিয়াছে।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসের শক্তি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে— অর্থ কিংবা পদমর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, ও উড়িষ্যার মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। আমি জানি না এ ক্ষেত্রে বাংলার মন্ত্রীসভা নিজেদের সম্বন্ধে কী বলিতে পারেন। শুনা যায় যে তাঁহারা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল অনুমোদনের জন্য ভিক্ষুকের মতো ইংল্যান্ডের দ্বারস্থ হইবেন। কংগ্রেস যখন অনুভব করিবে যে মন্ত্রীসভাগুলি ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে না এবং গঠনমূলক কার্য-সূচীকে আর রূপায়িত করা যাইতেছে না, তখন কংগ্রেস সিদ্ধান্ত লইবে যে মন্ত্রী-সভাগুলির প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের উচিত আরো বেশি গণ-সংযোগ করা। ব্যাপক প্রচারের দ্বারা অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করিতে হইবে। তফশিলী সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কংগ্রেসের প্রভাবের মধ্যে আনিতে হইবে। কোনোপ্রকার চুক্তি কিংবা সাময়িক আপস-রফার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের যদি এই

প্রত্যয় জন্মে যে ভারতের স্বাধীনতা হইবে জনগণের স্বাধীনতা, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কংগ্রেসে যোগ দিতেন। মুসলিম লীগের সহিত চুক্তি হউক আর নাই হউক, কংগ্রেসের কর্মসূচী পরিষ্কার। ইহা জাতীয়তার ভিত্তিতে রচিত। প্রত্যেকেরই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের অধিকার আছে। হিন্দুরা যদি আজ কংগ্রেসে সংখ্যাধিক হইয়া থাকেন তাহার জন্য দায়ী সেই-সব মুসলমান যাঁহারা মুসলমান জনসাধারণের কংগ্রেসে যোগদানের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। মুসলমানরা অগ্রসর হইয়া আসুন এবং স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করুন। আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ ত্যাগ করিতে এবং তাঁহাদের হাতে সে দায়িত্ব তুলিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

কিষাণ সভা ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা উচিত নয়। কিষাণদের স্বতন্ত্র সংগঠন থাকিতে পারে— তবে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী তাহা পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ সংগঠন যদি কংগ্রেস-বিরোধী হয়, তবে কংগ্রেস তাহার সহিত অসহযোগিতা করিবে এবং নিজের কর্মীদিগকে উহার সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার আহ্বান জানাইবে। কৃষকদের অভিযোগগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা কংগ্রেসের মৌলিক কর্তব্য। জনসাধারণ কংগ্রেসের পশ্চাতে আছে বলিয়া কংগ্রেস তাহাদের অভিযোগের প্রতিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

আমি যতটা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে কিছু সংখ্যক কিষাণ কর্মীর ভ্রান্ত মনোভাব এ অবস্থার জন্য দায়ী। তাঁহারা কংগ্রেস সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ করেন। কিছু সংখ্যক কিষাণ কর্মীর ভাষণ ও বক্তৃতা হইতে মনে হয় তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইবার চেষ্টা করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এমন কিছু কর্মী আছেন যাঁহারা কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। আমি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিতে চাই যে কংগ্রেস আর এ ধরনের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব সহ্য করিবে না। ইহা স্পষ্ট ঘোষণা করিতে চাই যে কোনো কিষাণ কর্মীর পক্ষে কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার কোনোপ্রকার প্রয়াস উপেক্ষিত হইবে না।

যে সমাজতন্ত্র সমস্ত অন্যায়ের প্রতিষেধক তাহার ভিত্তিতে সমাজের নূতন সৌধ গড়িয়া উঠিবে ; কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়।

জাতীয় স্বাধীনতা নাগালের মধ্যে

১৭ জুন ১৯৩৮ ময়মনসিংহ টাউন হল মাঠে প্রদত্ত ভাষণ।

আমি যে সংগঠনের প্রতিনিধি এই বিরাট অভ্যর্থনা অবশ্যই তাহার উদ্দেশ্যে আয়োজিত। আমি ময়মনসিংহে সাত বৎসর আগে আসিয়াছিলাম এবং আজ যে উৎসাহ দেখা গিয়াছে তাহা আমি প্রত্যাশা করি নাই।

ইহা কখনো কখনো বলা হয় যে বাংলা রাজনৈতিক আন্দোলনে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা অংশত সত্য হইতে পারে, কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আন্দোলনের পর নিঃসন্দেহে উৎসাহে সাময়িক ভাটা পড়িয়াছিল। ইহাতে সরকার মনে করিয়াছিলেন যে কংগ্রেস আর মাথা তুলিতে পারিবে না। লর্ড উইলিংডন সেই ভ্রান্তি লইয়া ভারতের তীর ছাড়িয়াছিলেন। নির্যাতন মাত্র কিছুদিনের জন্য জনগণের ভাষা ও কর্মতৎপরতা চাপা দিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু ইহা কখনোই সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে পারে না। বিগত নির্বাচনের ফলাফল সরকারের চোখ খুলিয়া দিয়াছে এবং রাজনৈতিক সমাধানরূপে নির্যাতনের ব্যর্থতা প্রমাণিত করিয়াছে। নির্বাচনের তারিখ হইতে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া আস্থার সহিত বলা যায় যে জাতীয় আন্দোলন ক্রমশ শক্তি সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতা এখন নাগালের মধ্যে আসিয়াছে। যুবশক্তি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে পাগলামি মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা আর স্বাধীনতার বাস্তবতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র বিকল্প আজ কংগ্রেস সংগঠন।

সরকারী ও বেসরকারী স্থানীয় ব্রিটিশরা কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের পর ইহা বুঝিতেছেন। একটি নৈতিক লাভ হইয়াছে এই যে ভীরু ও দুর্বল মানুষ, যাঁহারা স্বাধীনতার নাম শুনিয়াই ভয় পাইতেন, তাঁহারা এখন উপলব্ধি করিতেছেন যে স্বাধীনতা কংগ্রেসের নাগালের মধ্যে আসিয়াছে। আত্মবিশ্বাস সমন্বিত এই নৈতিক লাভ একটি পরাধীন জাতির পক্ষে বড়ো সম্পদ। দাসত্ব নিঃসন্দেহে লজ্জার বিষয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বেশি লজ্জার বিষয় সেই দাসত্ব মানিয়া থাকা। শীঘ্র স্বাধীনতা অর্জন করা যাইবে এই অনুভূতি স্বাধীনতার অগ্রগতি সাধন করে। কংগ্রেস-কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় সাধারণ জনগণের মধ্যে এই অনুভূতি সঞ্চার করা গিয়াছে। বড়োলাট কিংবা ছোটোলাটেরা এখন আর দাবি

করিতে পারেন না যে তাঁহারা সাতটি কংগ্রেসী প্রদেশকে শাসন করিতেছেন। একমাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সে দাবি করিতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আমাদের আন্দোলনের পক্ষে। পাঁচ বৎসর আগের ব্রিটিশ শক্তি আজ আর তত দৃঢ় নয়। যে মূলগত শক্তি, অর্থাৎ নৌশক্তি, ইংল্যান্ডকে প্রভুত্বের ও সম্প্রসারণের ক্ষমতা দিয়াছিল তাহা এখন হ্রাস পাইয়াছে। রাজনীতির জগতে বিমান-শক্তির আকারে আর-একটি শক্তি পুরাতন নৌ-শক্তিকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের সময় ইংল্যান্ড কিছুটা অগ্রসর হইয়া কেন পিছু হটিয়াছিল এইখানে তাহার ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অন্যান্য কারণও, যেমন নূতন রাষ্ট্র স্থাপন এবং ইটালী, জার্মানী, জাপান প্রভৃতির মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

এই একই কারণের মধ্যেই চীন-সম্পর্কিত নয়টি শক্তির চুক্তি সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের অসংগতিপূর্ণ আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আজ বিশ্বরাজনীতিতে তাহার সকল কাজের মধ্যে ইংল্যান্ডের ক্ষমতা ও আস্থাহানির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেস যে-শক্তির বিরোধে রত রহিয়াছে সে-শক্তির বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এজন্য সাধারণকে বিশ্বরাজনীতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ইংল্যান্ডের শক্তিহানি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে একটি পরোক্ষ লাভ। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ লইয়া মিশর ও আয়ার্ল্যান্ড ইংল্যান্ডের সম্মুখে তাহাদের সম্মিলিত জাতীয় দাবি তুলিয়া ধরিয়াছে এবং ইংল্যান্ড তাহার বিরোধিতা করিতে পারে নাই। ইংল্যান্ডের পক্ষে তখন বড়ো সমস্যা সাম্রাজ্যের সংহতিসাধন নয়, তাহার সর্বাপেক্ষা বড়ো সমস্যা এখন আত্মরক্ষা— যেমন এক সময় রোমের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল যখন স্বদেশে আত্মরক্ষার জন্য ইংল্যান্ড হইতে তাহার সৈন্য-দল অপসারণ করিতে হইয়াছিল। রাজনীতিতে দাক্ষিণ্যের কোনো স্থান নাই। শক্তিই বড়ো কথা এবং তাহা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কংগ্রেস গণসংযোগের একটি কর্মসূচী রচনা করিয়াছে। কংগ্রেসের মূলনীতি নিজেকে দেশের বিশাল জন-সমাজের সহিত একাত্ম করিয়া তোলা এবং উপযোগী দিন-যাপন জীবন তাঁহাদের জন্য রচনা করা। তাহাই স্বরাজ।

একটি জাতির অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন, জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচী এবং যতদিন একটি জাতি বৈদেশিক প্রভুত্বের অধীনে থাকে তত-দিন এ কাজ করা সম্ভব নয়। ভারতের সম্পদের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইংল্যান্ড

ভারতে আসিয়াছিল, কিন্তু আজ বৈদেশিক প্রভুত্বের দরুন ভারত পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ। বৈদেশিক চটকলগুলির ডিভিডেন্ডের সহিত চটকল শ্রমিক ও উৎপাদকদের মজুরীর তুলনার মধ্যে ইহার একটি উদাহরণ পাওয়া যাইবে। অন্যান্য দেশে যেরূপ ঘটে এখানেও জাতীয় সরকার থাকিলে নিশ্চয়ই পাটের দাম এবং এমন-কি ধানের দাম নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরিস্থিতির উন্নতি করা যাইত।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের দায়িত্ব সর্বদাই একটি দলের উপর পড়ে। চীনে ইহা পড়িয়াছিল কমিন্টানের্র উপর, মিশরে ওয়াফ্দের উপর, আয়ার্ল্যান্ডে সিন্-ফিন্ দলের উপর এবং রাশিয়ায় কম্যুনিস্টদের উপর। ভারতে এই দায়িত্ব পড়িয়াছে কংগ্রেসের উপর। কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠন যাহাতে জাতি, বর্ণ কিংবা ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষ যোগ দিতে পারে। যাঁহারা অন্তরে স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদার ধারণা পোষণ করেন তাঁহাদের পক্ষে কংগ্রেসে আসা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নাই।

বলা হয় যে কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন। মুসলমানরা যদি বহু সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ না দেন তাহা হইলে ত্রুটি তো তাঁহাদেরই। মুসলমানরা ইচ্ছা করিলে ময়মনসিংহ জেলা-কংগ্রেসে একাধিপত্য করিতে পারেন—এমন-কি বাংলার কংগ্রেস কমিটিতেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। যে-কোনো মুসলমান নেতা যদি তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা প্রদর্শন করিতে পারেন তবে তাঁহার হাতে বাংলার নেতৃত্ব তুলিয়া দিতে আমি সম্মত। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হইবার জন্য আমি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাই। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নিশ্চয়ই স্বচ্ছ চিন্তা ও শুভ অভিপ্রায়সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা গভীর বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসিবেন যে একমাত্র কংগ্রেসই হতভাগ্য জনসাধারণের ভাগ্য পরিচালনা করিতেছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাংলার মন্ত্রীসভার সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ সযত্ন পরীক্ষায় টিঁকিবে না। কংগ্রেস এই কারণে বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরোধী যে তাঁহারা জনস্বার্থে কাজ করেন না। যাহারা জনস্বার্থে কাজ করিবেন না এমন এগারো জন হিন্দু মন্ত্রীর হাতে দেশকে ছাড়িয়া না দিয়া, কংগ্রেস বরং স্বেচ্ছায় মুসলমান-দের মধ্য হইতে উপযুক্ত এগারো জনকে মন্ত্রীর পদে বসাইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার অন্যতম কর্মসূচীতে স্থান পাইয়াছে। এ-বিষয়ে আমি আয়ার্ল্যান্ড ও মিশরের উদাহরণ উল্লেখ করিতে পারি। যে বাংলা মন্ত্রীসভা নিজেদের জনপ্রিয় বলেন তাঁহারা

কি তাহা করিয়াছেন ? বাংলা মন্ত্রীসভা জনপ্রিয়তার প্রতিটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছেন। বর্তমান বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন অবিলম্বে কার্যকরী করা যায় শুধু যদি মন্ত্রীসভা বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মন্ত্রীসভার মতো শক্তির পরিচয় দেন। কিন্তু সঠিক পথ গ্রহণের পরিবর্তে বাংলার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে তিনি তদ্বিরের জন্য ইংল্যান্ড যাইবেন। যে-কেহ বুঝিতে পারেন যে গবর্নর বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন না। ইহার জন্য দায়ী মন্ত্রীসভার দুর্বল মনোভাব এবং এই দায়িত্ব এড়ানোর জন্যই কংগ্রেস ইহার বিরোধী।

সমাজতন্ত্রী, কিষাণ ও যুব দলের মতো বিভিন্ন সংগঠন আমাকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে ভারতের সমস্যাগুলি অন্যান্য জাতির সমস্যাগুলি হইতে ভিন্ন ধরনের, কারণ ভারত পরাধীন জাতি এবং সেইজন্য ভারতীয়দের মধ্যে বহু দোষ দেখা দিয়াছে। এগুলি দূর করিতে হইবে এবং চরিত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, কর্মে ও চিন্তায় শৃংখলা রক্ষা করিতে হইবে। কেবল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিমত হিসাবে মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে দেশে চালু করা যাইতে পারে না। বর্তমানে প্রত্যেকের কর্তব্য হইল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা।

আমাকে প্রদত্ত পৌরসভার অভিনন্দনে যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে আত্মত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক হইতে বাংলায় প্রগতি হইতেছে না, ইহা আমি স্বীকার করি। আমি বিশ্বাস করি যে ইহা বাঙালীদের অতিমাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফল। ইহার সংশোধন প্রয়োজন, কারণ চরিত্রের এই উপাদান সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে ও কার্যে অগ্রগতি ব্যাহত করে। বাঙালীরা যদি একবার সঙ্ঘবদ্ধ কার্যের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহে জাতির পুরোভাগে দাঁড়াইতে পারিবেন।

সর্বশেষে আমি জনগণকে বৃহত্তর উৎসাহ ও বলিষ্ঠতা লইয়া ভাবী জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানাই।

পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ

আসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট প্রদত্ত পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের বর্ণনা।

আমি মুসলমান জনসাধারণের নিকট হইতে আশাতীত সাড়া পাইয়াছিলাম এবং আমি এই বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি যে মাদ্রাজের জাস্টিসদের ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অব্রাহ্মণদের মতো বাংলার মুসলমানরাও সকলেই শীঘ্র কংগ্রেসে যোগ দিবেন।

আমি বাংলার যে অংশ সদ্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি সে অংশে মুসলমান অধিবাসীদের অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির পর হইতে কংগ্রেস মুসলমান জনসাধারণের উপর নিজের প্রভাব বহুলাংশে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রাদেশিক আইন-সভার বিগত নির্বাচনে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় আমি যখন যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম তখন আমার সফর কিরূপ হইবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু আমার জন্য একটা মধুর বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল। এগারো দিনে আমি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলাগুলির মধ্য দিয়া সফর করিয়াছিলাম। এই ভ্রমণ-সূচী এমন ভাবে তৈয়ারি করা হইয়াছিল যাহাতে আমি দূর মফঃস্বলেও যাইতে পারি এবং স্থানীয় সহকর্মীগণ আমাকে দিয়া যথাসম্ভব কাজ করাইয়া লইয়াছিলেন—এমন-কি কোনো কোনো দিন তাঁহারা কয়েকটি সভায় আমার বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছিলেন। শহরগুলিতে এই-সব সভায় ও শোভাযাত্রায় যোগদানকারীদের একটা বড়ো শতাংশ ছিলেন মুসলমান এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রোতৃমণ্ডলী প্রায়শই ছিলেন পুরাপুরি মুসলমান। আমি অতীতে সারা বাংলায় ব্যাপক ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এবারের মতো ইতিপূর্বে কখনো জনসাধারণের এরূপ প্রাচুর্যপূর্ণ উদ্দীপনা দেখি নাই। সাধারণের অনুমান অনুসারে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে সমবেত জনতা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

আমার ভ্রমণ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির সর্বত্র মুসলমান নাগরিকগণকে আমার সফর বয়কট করার ও হরতাল পরিচালনার অনুরোধ করিয়া ব্যাপক-ভাবে প্রচারপত্র বিলি করা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলায় গোপনে এই-সব কাজ করা হইয়াছিল, কিন্তু নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় এরূপ প্রচার ছিল খোলাখুলি এবং সরব। কিন্তু জনসাধারণের প্রবল আবেগপূর্ণ উদ্দীপনার পট-ভূমিকায় এইরূপ কার্যকলাপের উদ্যোক্তাদের হাস্যকর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

কয়েকটি কৃষ্ণ পতাকা ও কিছু অর্বাচীন বালকের চীৎকার, তাঁহার সহিত হরতাল পালন যুক্ত হইলেও তাহা কোনো আঁচড় না কাটায় স্থানীয় মুসলিম লীগ পন্থীদের সম্বন্ধে কোনো অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় নাই। আমি সেদিন বলিয়াছি যে ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে মুসলমান জনসাধারণকে আমাদের অনুষ্ঠান হইতে দূরে রাখার ব্যর্থতায়, লীগপন্থীর এবং সম্পূর্ণরূপে বিচার-বুদ্ধি হারাইয়া ইঁট ও পাথর ছোঁড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মতো অন্যত্রও লীগপন্থীরা যখনই আমাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন তখনই আমাদের সভা ও শোভাযাত্রায় অধিক সংখ্যক মুসলমানেরা যোগ দিয়াছেন। আমি মুসলমান জনসাধারণের নিকট হইতে যে সাড়া পাইয়াছিলাম তাহা আমার কল্পনারও অতীত এবং আমি এই বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি যে মাদ্রাজের জাস্টিসদের ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অব্রাহ্মণদের মতো বাংলার মুসলমানরা সকলেই শীঘ্র কংগ্রেসে যোগ দিবেন।

বিচারাধীন বন্দী ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিতে বিলম্ব হওয়ায় ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়াছে এবং অবিলম্বে ইহা নিরসন করা প্রয়োজন। বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ঐক্য আলোচনা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছিলাম যদিও তাহার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে সংশয় ছিল।

আমি দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছিলাম যে নির্যাতনের কতকগুলি পদ্ধতি এখনো কার্যকর আছে। চট্টগ্রামে, কঠোরভাবে না হইলেও, যুবকদের জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা এখনো বলবৎ আছে। এই অঞ্চলেব অধিকাংশ স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 'হাউস সিস্টেম' নামে পরিচিত ব্যবস্থার অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে যাহার ফলে বিদ্যালয়ের এক-একজন শিক্ষার্থীকে পুলিস অফিসারের মতো বিদ্যালয়ের বাহিরের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক বালকের উপর নজর রাখিতে হইবে। এই পদ্ধতি আত্মবিধ্বংসী।

আমি আরো অভিযোগ পাইয়াছিলাম যে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস কিংবা কংগ্রেসীদের মালিকানাধীন যে-সব গৃহ কিংবা আশ্রম পুলিস দখল করিয়া লইয়াছিল সেগুলি এখনো ভূতপূর্ব মালিকদের ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঢাকা জেলার বাহেরক ও মালিকান্দা আশ্রম। ওই ঢাকা জেলারই গালিমপুর আশ্রম ও কংগ্রেস অফিস এবং পটিয়ার কংগ্রেস অফিস। আমি মনে করি যে সরকার-কর্তৃক এই-সব সম্পত্তি প্রকৃত কর্তৃপক্ষকে প্রত্যর্পণের সময় আসিয়াছে।

যে হাজার হাজার যুবকের সাক্ষাৎ আমি পাইয়াছিলাম তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার কংগ্রেসে যোগদানের এবং অহিংসা-সহ কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি মানিয়া লইয়া কাজ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নাতীত এবং তাঁহারা যে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিতেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

অভ্যর্থনাগুলি এত স্বতঃস্ফূর্ত ও চমৎকার হইয়াছিল যে এগুলির তুলনা করা দুঃসাধ্য। তৎসত্ত্বেও অত্যুক্তি না করিয়া আমি বলিতে পারি যে ময়মনসিংহ সকল রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

২২ জুন ১৯৩৮

শুষ্ক ফলের ব্যবসা

'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর সহিত সাক্ষাৎকার।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে শুষ্ক ফলের ব্যবসায় লইয়া আফগানিস্তান ও ভারতের বিরোধ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি সন্তুষ্টি বিধান করিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। জাঞ্জিবারে ভারতীয়দের সাফল্যের পরে পরেই এই বিজয় আসিয়াছে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে কিছুদিন পূর্বে আফগান সরকার শুষ্ক ফলের রপ্তানী বাণিজ্য হাতে লইবার জন্য একটি কোম্পানি গঠন করিয়াছিলেন এবং আফগানিস্তান ও ভারতের এই কোম্পানির প্রতিনিধিরা ছিলেন। ইহার ফলে যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আফগানিস্তানে ও ভারতে পুরুষানুক্রমে দুইটি দেশের মধ্যে শুষ্ক ফলের ব্যবসায় চালাইয়া জীবিকার্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সকলেই কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আফগান সরকারের এই একচেটিয়া ব্যবস্থার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বয়কটের পথ অবলম্বন করেন এবং সমর্থনের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানান। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদিগকে পূর্ণ সমর্থন দিয়াছিলেন এবং ইহার অল্পদিন পরেই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে আফগানিস্তানে একটি সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ আসিয়াছিল। যখন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদল যাত্রা করিতে উদ্যত সেই সময় তারযোগে সংবাদ আসিয়াছিল যে আফগান সরকার এক-

চেটিয়া ব্যবসায় ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

এই অবস্থায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এমন-কি কাবুলে না গিয়াই সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিজয়ী হইয়াছেন। যাঁহারা এই ভারতীয় দাবি সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অভিনন্দন লাভের যোগ্য। ইহা এখন স্পষ্ট যে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে ভারতের প্রভাব বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে অনুভূত হইতেছে এবং আমরা দেশের অভ্যন্তরে যত বেশি ঐক্য ও শক্তি অর্জন করিতে পারিব বিদেশেও আমরা তত বেশি শক্তির অধিকারী হইব।

২৩ জুন ১৯৩৮

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে "অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস"-এর সহিত সাক্ষাৎকার।

আমি এখনো কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই এবং তাঁহারা আমাকে কী বলিবেন সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নাই। কর্পোরেশনের সভায় ২১ জুন আমি যেমন বলিয়াছিলাম সেই অনুযায়ী আমার বক্তব্য পরিষ্কার। আমাদের কর্তব্য শুধু ন্যায়বিচার করাই নয়, জনসাধারণও যেন বুঝিতে পারেন যে ন্যায়বিচার করা হইতেছে। ইহা যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে শিক্ষাধিকারিক শ্রীশৈলেন ঘোষের প্রতি সুবিচার করা হইয়াছে, তাহা হইলেও ন্যায়বিচার যে করা হইয়াছে জনসাধারণকে ইহা এখনো কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বুঝাইতে হইবে যে ন্যায় বিচার করা হইয়াছে। যদি কর্পোরেশনের ২০জন কাউন্সিলার ও স্যার পি. সি রায়, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ খ্যাতিমান ও দায়িত্বশীল নাগরিকগণ দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে শ্রীশৈলেন ঘোষের প্রতি অন্যায় ও অসংগত আচরণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে কর্পোরেশনের অবশ্যকর্তব্য হইল সমগ্র বিষয়টির পুনর্বিবেচনায় সম্মতি দেওয়া। কেহ আলোচনা বন্ধ করতে চাহিলে তাহাকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হইবে যে দিনের আলোয় প্রকাশিত হওয়া উচিত এরূপ ঘটনাকে তিনি ধামাচাপা দিতে চান। আমি পূর্বেও

কর্পোরেশনে বলিয়াছি প্রত্যেককে বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ দিবার পর কর্পোরেশনের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রাখার পক্ষে তো কোনো বাধা নাই।

আমার কর্পোরেশনের অধিকাংশ সদস্য এরূপ একগুঁয়ে এবং যুক্তিবাদবিহীন হইবেন এ কথা পূর্বেই মনে করিবার কোনো কারণ নাই। যদি শ্রীশৈলেন ঘোষের বিরুদ্ধে কর্মদক্ষতার ও কুশলতার অভাব একমাত্র অভিযোগ হয় তাহা হইলে আমার আশঙ্কা এই যে তাঁহার সহিত কর্পোরেশনের আরো কয়েকজন অফিসারকে পদচ্যুত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি শ্রীঘোষের অপরাধ, কর্মদক্ষতা ও কুশলতার অভাব অপেক্ষা অধিক গুরুতর হয় তাহা হইলে তাঁহার সমর্থনে কাহারো কনিষ্ঠ অঙ্গুলিও উত্থাপন করা উচিত নয়। দুঃখের বিষয় যদি কর্পোরেশনের অধিকাংশ সদস্য বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমাকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা গুরুতর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। যদি কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাহাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তবে কংগ্রেসকে অবশ্যই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।

কর্পোরেশন হইতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কেন :

আমি একমাত্র শিক্ষাধিকারিকের প্রশ্নে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এইরূপ মনে করা একটা বড়ো ভুল হইবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি এমন পর্যায়ে ছিল না, যাহা কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এক সময় আমি এরূপও ভাবিয়াছিলাম যে কংগ্রেস দলকে কর্পোরেশন হইতে প্রত্যাহার করার আদেশ দেওয়া হউক— এই পরামর্শ লইয়া আমি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্মুখীন হইব। কিন্তু আমি এই রকম পন্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিতেছি এবং নিরাশার মধ্যেও আশা করিতেছি যে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে মহত্তর বোধের পরিচয় দিতে এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেসের কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ণে দল অধিকতর আগ্রহ দেখাইবে। সাম্প্রতিক ঘটনা শুধু শেষ তৃণখণ্ডের চাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের দল কর্তৃক কর্পোরেশনে কংগ্রেসের কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের আর কোনো আশা নাই দেখিয়া আমি পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার সেই মনোভাব এখনো আছে, আমার মত সংশোধনের অপেক্ষায় থাকিবে।

৫ জুলাই ১৯৩৮

ফেডারেশন

সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে সাক্ষাৎকারকালে ফেডারেশন প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিবৃতি।

এই প্রশ্নে সংবাদপত্রের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছাও নাই, আবশ্যকতাও নাই। যাহা করা আমি নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা আমি করিয়াছি অর্থাৎ ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্বন্ধে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। ৯ জুলাই আমি যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলাম তাহা ফেডারেশন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাবের প্রবল পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি স্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং ইহা পরে বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরা কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই পরিকল্পনার দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিন্দা, সর্বতোভাবে বিরোধিতা এবং তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত এরূপ সম্ভাব্য সকল উপায়ে ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করিতেছেন। সুস্পষ্ট রূপে জাতির ব্যক্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা উদ্বোধনের প্রয়াস ভারতের জনসাধারণের প্রতি চ্যালেঞ্জ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং, এই ফেডারেশন ভারতের গভীর ক্ষতির কারণ হইবে ও যে শৃংখলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও প্রতিক্রিয়ার সহিত ভারত শৃংখলাবদ্ধ রহিয়াছে তাহা দৃঢ়তর হইবে বলিয়া কমিটি এই ফেডারেশন জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা প্রতিহত করিতে প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলি-সহ সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আহ্বান জানাইতেছে। কমিটির অভিমত এই যে প্রাদেশিক সরকারগুলির উচিত নিজ নিজ আইন-সভাগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরোধিতা প্রকাশ করিয়া প্রদেশগুলিতে ইহা জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে সরকারকে বলা।

হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবেও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুরূপ অভিমত পুনরায় জ্ঞাপন করা হয় :

সুতরাং, কংগ্রেস, প্রস্তাবিত ফেডারেশন পরিকল্পনার নিন্দা পুনর্জ্ঞাপন করে এবং ইহার প্রবর্তন প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি-গুলি-সহ সাধারণভাবে জনগণকে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ও মন্ত্রীসভাগুলিকে

আহ্বানে জানাইতেছে। 'সাধারণের ঘোষিত ইচ্ছা সত্ত্বেও যদি জোর করিয়া ইহা চাপাইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে এরূপ প্রয়াস সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রতিহত করিতে হইবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ও মন্ত্রীসভাগুলিকে ইহাতে সহযোগিতা দানে অস্বীকৃত হইতে হইবে। এইরূপ বিপদে এ সম্বন্ধে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা ও নির্দেশ নিখিল ভারত কংগ্রেসকে দেওয়া হইল।

৯ জুলাই আমার বিবৃতি প্রচারের পূর্বে আমার কাছে খবর ছিল যে ব্রিটিশ সরকার ফেডারেশন পরিকল্পনার অনুকূলে কংগ্রেসসেবীদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং, হরিপুরা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুয়ায়ী এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রয়াসের বিরুদ্ধে যতশীঘ্র সম্ভব অভিযানের সুযোগ লওয়া আমার কর্তব্য ছিল। তাহা না করিলে আমি আমার পদের ন্যস্ত দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালনে ব্যর্থ হইতাম।

আমি সংগতভাবে দাবি করিতে পারি যে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি অন্তর্নিহিত আনুগত্য হইতে আমার বিবৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। আমি যদি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি তবে তাহা করিয়াছি অংশত প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমার অভিমত কঠোর এবং অংশত এ বিষয়ে কংগ্রেসের মনোভাবও কঠোর যথা : ফেডারেশন পরিকল্পনার 'দ্ব্যর্থহীন নিন্দা' ও 'সম্পূর্ণ বিরোধিতা'র মনোভাব। আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে হরিপুরায় কংগ্রেসের যে প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে দ্ব্যর্থমূলক ব্যাখ্যার অবকাশ নাই এবং যে-কোনো কংগ্রেসসেবী, তিনি যত উচ্চপদাধিকারীই হউন, তাঁহার নিকট এই প্রশ্নে কংগ্রেসের প্রভাব ও আপস-বিরোধী পদমর্যাদা দুর্বল করার মতো কোনো প্রয়াস করার পথ খোলা নাই। হরিপুরা কংগ্রেসের পর হইতে এমন-কিছু ঘটে নাই যাহাতে আমরা ফেডারেশন সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবের সামান্যতম অদল-বদল করিতে উৎসাহিত হইতে পারি।

পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এমন অনুকূল অবস্থার দিকে মোড় ফিরিয়াছে যে হরিপুরায় আমরা যে মনোভাব লইয়াছিলাম তাহাতে অবিচল থাকা আমাদের পক্ষে আরো বেশি দায়িত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিবৃতি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যদি কোনো সংশয় থাকিয়া থাকে তাহা হইলে ইহা প্রকাশের পর যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে সে সংশয়ের অবসান হওয়া উচিত। আর আমরা যদি কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য ধরিয়া থাকি তাহা হইলে

আমার বিশ্বাস যে শীঘ্রই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হইবে যে আমার বিবৃতি যথাসময়েই প্রচারিত হইয়াছিল।

ফেডারেশন পরিকল্পনা জোর করিয়া আমাদের গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টা হইলে তাহার সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে বলা যায় যে যদিও কংগ্রেসের পূর্বতন মনোভাব পরিবর্তন অচিন্তনীয়, তবু ঘটনাক্রমে যদি এই অভাবিত দুর্দৈব আসে তখন কী হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পক্ষে পূর্বেই চিন্তা করা ভালো। কংগ্রেসের বর্তমান মেজাজ বিচার করিয়া বলা যায় যে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ কর্তৃক ফেডারেশন পরিকল্পনা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবীরূপে ঐ সংস্থায় গুরুতর ভাঙন সৃষ্টি করিবে— এ-বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নাই। আমরা যদি বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ্ হই তাহা হইলে আমরা পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিতে পারি না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ফেডারেশন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ইহার বিরোধী সংখ্যালঘু সদস্যগণ তাহা মুখ বুজিয়া সহ্য করিবেন— এরূপ আশা করিয়া আমরা যেন আত্মপ্রতারিত না হই।

আমার বিবৃতি সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনায় আমি বিস্মিত ও ব্যথিত। যাহা ফেডারেশন সম্বন্ধে কংগ্রেসের অভিমতের দৃপ্ত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়, তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন বলিয়া চিহ্নিত করা অবাস্তব। কংগ্রেস তাহার পূর্বতন মনোভাব বর্জন করিলে আমি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যাইব এরূপ অভিযোগ আনা সমান অবাস্তব। যে কংগ্রেস আমার জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বরূপ তাহাকে কোনো-কিছুর জন্য আমি ত্যাগ করিব না। আমার বিবৃতির শেষ এবং সমান অবাস্তব যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা হইল এই যে এমন-কি আমি যদি দেখি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ এমন পদক্ষেপ করার দিকে ঝুঁকিয়াছেন যাহা জাতীয় হারাকিরির সমান সে অবস্থায় পদত্যাগের স্বাধীনতাও আমার নাই। কংগ্রেস-কর্তৃক ফেডারেশন পরিকল্পনা গ্রহণ রাজনৈতিক আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া গণ্য হইবে না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই অভাবিত দুর্দৈব যদি আসে, তাহা হইলে আমি সেই আত্মহত্যার খেলায় অংশ গ্রহণ করিব ইহা যুক্তিসংগতভাবে কে প্রত্যাশা করিতে পারে?

উপসংহারে আমি আশা, বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি যে কংগ্রেসসেবীদের পক্ষ হইতে আমাদের জাতীয় দাবির গুরুত্ব হ্রাসের সকল প্রয়াস চিরদিনের মতো বন্ধ হউক। আমরা যেন দিল্লী ও হোয়াইট হলকে অবাঞ্ছিত ফেডারেশন পরিকল্পনার সংশোধনী প্রস্তাব দিয়া নিজেদিগকে পার্লামেন্টের ব্যস্তবাগীশ প্রতিনিধিদের

স্তরে টানিয়া না নামাই। পক্ষান্তরে আসুন আমরা নিজেদের বিভেদ ভুলিয়া যাই ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াই এবং আসুন আমরা এই বিশ্বাসে দৃঢ় হই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর ঐক্যবদ্ধ ও নবজাগ্রত ভারতের জাতীয় দাবি উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

১৫ জুলাই ১৯৩৮

কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান

ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সহিত সাক্ষাৎকার।

আমি সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে অত্যন্ত অসুখী বোধ করিতেছি। একজন বিশ্বস্ত সহকর্মীকে আস্থাজনক ও দায়িত্বপূর্ণ একটি উচ্চপদ হইতে টানিয়া নামানো যে কত যন্ত্রণাদায়ক তাহা আপনারা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাবটি আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা গ্রহণ করা আমার ও আমার সকল সহকর্মীর পক্ষে অত্যন্ত তিক্ত বড়ি গলাধঃকরণের মতো, কিন্তু তাহা না করিয়া আমাদের উপায় ছিল না।

আমরা ভুলিতে পারি না যে অহিংস হইলেও আমরা একটি বিরাট জাতীয় সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছি। প্রদেশগুলিতে ক্ষমতা গ্রহণের অর্থ এই নয় যে সেই সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ শুধু এই যে আমরা আমাদের জয়যাত্রার পথে আরো কয়েকটি দুর্গ দখল করিয়াছি। আমি বন্ধুদের ও সহকর্মীদের এবং সাধারণভাবে আমার দেশবাসীদের সতর্ক করিয়া বলিতে চাই যে শত্রু পূর্বের মতোই সজাগ রহিয়াছে এবং আমাদের সাময়িক কোনো দুর্বলতার কিংবা আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদের সুযোগ লইতেও সে কুণ্ঠাবোধ করিবে না। আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে অনেকে এই মোহ পোষণ করেন যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিলে আমাদের শিবিরে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিবে। হয় বিভেদের কিংবা ভাঙনের আকারে কিংবা আমাদের পক্ষে আর একটি সংগ্রামের সম্মুখীন না হইবার প্রবণতার আকারে সেই নৈতিক অধঃপতন আসিতে পারে। এই দুইটির বিরুদ্ধেই আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। সেইজন্যই আমি আমার দেশবাসীগণকে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলার কোনো সুযোগ কখনো ছাড়ি না। আমার

মতে 'পূর্ণ স্বরাজ' আপস-আলোচনা কিংবা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের সংশোধনের মাধ্যমে আসিবে না, তাহা আসিবে অহিংস গণসংগ্রামের মাধ্যমে।

আমাদের শিবিরে বিভেদের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে যন্ত্রণা-দায়ক এবং দুঃখজনক হইলেও মধ্যপ্রদেশের ঘটনাটি সারা ভারতের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। এমন-কি যেখানে আমাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানেও শৃংখলা কিংবা নৈতিকতায় শৈথিল্য দেখা দিলে গুরুতর বিভেদের সম্ভাবনা আছে সেই সম্বন্ধে ইহা আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে।

আমি ইহা ভাবিয়া সন্তোষ বোধ করি যে বর্তমানে আমাদিগকে যে মেঘ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তাহার মধ্যেও একটি রূপালী রেখা আছে অর্থাৎ যদিও মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে মতভেদ দেখা গিয়াছে, তবু কোনো বিভেদ কিংবা ভাঙন দেখা দেয় নাই। আমার বিশ্বাস আছে যে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করিবেন এবং পুনরায় একযোগে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে যখন ক্ষমতা ও পদমর্যাদার প্রলোভন আমাদিগকে অপদার্থ চিন্তা কিংবা কর্মের দিকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যাইতে পারে সেই সময় শৃংখলা ও নৈতিকতার প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া উচিত। আমরা যে মহান জাতীয় সংগঠনের সদস্য মাত্র তাহার প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার উপরও আমি জোর দিতে চাই।

গত কয়েকদিন সংসদীয় নজির এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গিয়াছে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে কংগ্রেসের প্রতি আমাদের আনুগত্য কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী কিংবা কোনো নজির কিংবা পদ্ধতির প্রতি আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার পাইবে। যখন একটি জাতি জীবন-মরণ সংগ্রামে নিরত শৃংখলা ও নৈতিকতার প্রয়োজন তাহার সর্বাধিক।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে যাহা সবে ঘটিয়াছে তাহা হইতে আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যতের পথনির্দেশের শিক্ষা গ্রহণ করি তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশের ঘটনা অভি-শাপের ছদ্মবেশে আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

মধ্যপ্রদেশ সংসদীয় দলের যে সভায় আমি সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে নেতা হিসাবে পুনর্নির্বাচনের জন্য ড. খারের নাম প্রস্তাবে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটি ইচ্ছা করিয়া দলকে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেন নাই বরং ইহা দলের সদস্যদের

বিচার-বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যখন ড. খারের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং প্রস্তাব উত্থাপক আমার নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার প্রস্তাব বৈধ কি না, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সত্ত্বেও তিনি যদি ড. খারের নাম প্রস্তাব করিতে চান আমি তাহাতে বাধা দিব না— তবে বিষয়টি ভোটে দিব। ইহার পরই প্রস্তাব উত্থাপক সঙ্গে সঙ্গে ড. খারের নাম প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন।

পত্রিকার বিবরণে অন্য একটি বিষয়ে ভুল তথ্য আছে। সংবাদপত্রের বিবরণে একমাত্র এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় ড. খারে সেবা-গ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কোনো বিবৃতিতে সহি দিবার জন্য তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইয়াছিল। সে সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং কী ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে নির্ভুল বিবরণ দিতে পারি। ঠিকই হউক আর ভুলই হউক, মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ড. খারের কৃতকর্ম সম্বন্ধে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিবার পর ড. খারে কী করিবেন তাহা জানিতে চাওয়া হইলে তিনি উত্তর দেন যে তিনি বিনা শর্তে নিজেকে গান্ধীজীর হাতে ছাড়িয়া দিবেন। অতঃপর মহাত্মা গান্ধী পরামর্শ দেন যে ড. খারে নিজে একটি বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করুন কিংবা তাঁহার জন্য একটি বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করাইয়া নেন। তাঁহার জন্য কালি-কলম আনা হইল এবং তিনি নিজে বিবৃতি লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি লেখা শেষ করিবার পর গান্ধীজী তাহাতে কিছু অংশ যোগ ও কিছু অংশের অদল-বদল করিয়াছিলেন। ডক্টর যাহা লিখিয়াছিলেন ইহাতে তাহার মূলগত কোনো পরিবর্তন হয় নাই— কিন্তু খসড়ায় যাহা অন্ত-র্নিহিত ছিল তাহা পরিস্ফুট করিতে সহায়তা করিয়াছিল মাত্র।

উপদেশ ভালোভাবে গৃহীত

সংশোধিত খসড়া পড়িয়া ড. খারে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করার জন্য সময় চান এবং পরদিন তিনি বেলা তিনটার মধ্যে উত্তর দিবেন। আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে আমি ড. খারেকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তিনি যেন বিষয়টি লইয়া যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেন যাহাতে একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে আর তাঁহার তাহা হইতে সরিয়া আসার সম্ভাবনা না থাকে। সেবাগ্রাম হইতে ওয়ার্ধা ফিরিবার সময় আমি তাঁহাকে

গান্ধীজীর উপদেশ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কেননা তাহা শুধু কংগ্রেসের সর্বোত্তম স্বার্থেরই নয় তাঁহার নিজের স্বার্থেরও অনুকূল হইবে। পরে রাত্রিতে ড. খারের সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখনো আমি তাঁহাকে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার অন্যান্য বন্ধুদের পরামর্শে না চলিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে এমন-কি এতটা আশ্বস্তও করিয়াছিলাম যে তিনি আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার কার্যের প্রশংসাসূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সাড়া দিবেন। স্বেচ্ছায় নিজের পদ ত্যাগ করিয়া অনুগত কংগ্রেসসেবীরূপে কাজ করিয়া গেলে কিছুকাল পরে আবার তাঁহার সম্মুখভাগে আসা কেহ ঠেকাইতে পারিত না। আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করিয়াছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো অভিপ্রায় নাই। কিন্তু গুরুতর ভুল করায় বর্তমান মুহূর্তে তাহাকে সেজন্য মূল্য দিতে হইবে এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া সমগ্র ঘটনাটি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

পরদিন ড. খারে আমাকে সম্বোধন করিয়া যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তার সুর ও বিষয়বস্তু বিশেষ দুঃখজনক। পূর্ব পত্রে তিনি নিজে সেবাগ্রামে, বিবৃতির যে খসড়া রচনা করিয়াছিলেন কেহ যদি সেই চিঠিটি তাহার সহিত মিলাইয়া দেখেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তিনি তাঁহার বন্ধুদের পরামর্শে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমি এখনো মনে করি যে কিছুই তলাইয়া যায় নাই। ড. খারে দীর্ঘকাল ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে কংগ্রেস ও জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। আর ওয়ার্কিং কমিটির যে সদস্যদের বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নিন্দা করার মতো অপ্রীতিকর কাজ করিতে হইয়াছিল তাঁহারা এখনো তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি যদি এখনো কঠোর শৃঙ্খলার সহিত এই মহান জাতীয় সংগঠনের সদস্যরূপে কংগ্রেস ও জনসাধারণের সেবা করিয়া চলেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়। ইহা মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সংগঠনের পুনর্বাসনে যেমন সহায়ক হইবে তেমনই আস্থা ও দায়িত্বের পদে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পথও পরিষ্কার হইবে।

২৯ জুলাই ১৯৩৮

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিত্ব-সংকট

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ তারিখে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ড. এন. বি. খারের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিষয়ে কংগ্রেস-সভাপতি-কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ণ তথ্য-সংবলিত বিবৃতি।

২৩ জুলাইয়ের ওয়ার্কিং কমিটির শেষ অধিবেশনের পর আমি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিত্ব-সংকট সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলাম এবং তাহার পর নীরবতা রক্ষা করা আমার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে যে প্রচার অব্যাহত রহিয়াছে এবং ড. খারের সাম্প্রতিক উক্তি ও প্রচার আমার পক্ষে আরো বিবৃতি দান অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে। আমি দুঃখিত যে তাহা করিতে গিয়া আমাকে অনেক অপ্রীতিকর তথ্যের উল্লেখ করিতে হইবে যাহা ড. খারের পক্ষে সম্মানজনক হইবে না। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাইবে।

এই মন্তব্য করিতে আমার বেদনা বোধ হয় যে অব্যাহত প্রচারকার্যের অন্তত একাংশ চারিত্রগত দিক হইতে আপত্তিজনক ও এমন-কি নোংরা। আমাদের মত-ভেদ যাহাই হউক-না-কেন প্রকাশ্যে যদি বিতর্ক চালাইতে হয় তাহা হইলে শিষ্টাচার শালীনতার নিয়ম আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। যাহা সর্বাধিক দুঃখের ব্যাপার তাহা হইল এই যে মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কটূক্তি ও গালাগালি করা হইয়াছে এবং এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিশেষণগুলি যদি সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে পূর্ণ বিতৃষ্ণায় প্রতিটি ভারতীয়ের আত্মা বিদ্রোহ করিবে।

ইহা লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না যে আমাদের দেশের কয়েকটি অংশে খারের সমর্থনে যে প্রচার চলিয়াছে তাহাতে এমন কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা যোগ দিয়াছেন যাঁহারা কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষের জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিচিত। বর্তমান ঘটনা কংগ্রেসকে মারিবার পক্ষে একটি সুবিধাজনক যষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে-সব কংগ্রেসকর্মী তাঁহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছেন তাঁহারা বুঝেন না যে তাঁহারা নিজেদের কাজের দ্বারা নিজেদের সংগঠনের ক্ষতি করিতেছেন— ইহাতে আমি বিস্মিত।

আমার প্রথমে বলা উচিত যে ওয়ার্কিং কমিটি এমন একটি সংস্থা যাহা প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে পুরাপুরি মুক্ত এবং ড. খারে-সম্পর্কিত ইহার সিদ্ধান্ত ছিল সর্ববাদীসম্মত। অন্যান্যদের মধ্যে কমিটিতে ছিলেন একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক শ্রীশঙ্কর রাও দেও এবং এমন কয়েকজন সদস্য যাঁহারা

ড. খারের ব্যক্তিগত বন্ধু ও তাঁহার আস্থাভাজন। এমন-কি ড. খারেও স্বীকার করিবেন যে যখনই তাঁহার সম্পর্কে কোনো ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাঁহারা তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন। এই-সব বন্ধু তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর সহজ।

ড. খারে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে এমন-কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পক্ষেও তাঁহার ব্যবহার ও আচরণ সমর্থন করা সম্ভব ছিল না এবং তাঁহার কাজের দ্বারা তিনি একটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ চালাইবার পক্ষে নিজেকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করিয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের প্রশাসনিক অঞ্চল ভাষার দিক হইতে একটি মিশ্র অঞ্চল— ইহার একটি অংশ মারাঠী-ভাষী ও অবশিষ্টাংশ হিন্দুস্থানী ভাষী। মন্ত্রীদের মধ্যে তিনজনকে (শ্রীযুক্ত খারে, গোলে ও দেশমুখ) নেওয়া হইয়াছিল মারাঠী-ভাষী কংগ্রেস প্রদেশ নাগপুর ও বিদর্ভ (বেরার) হইতে আর অপর তিন জনকে (শ্রীযুক্ত শুক্ল, মিশ্র ও মেহতাকে) নেওয়া হইয়াছিল হিন্দুস্থানী-ভাষী কংগ্রেস প্রদেশ মহাকোশল হইতে। আমার বিশ্বাস যে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন যে মহারাষ্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করা হইয়াছে ও তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় সহকর্মীগণকে পদচ্যুত করা হইয়াছে আর অন্যদিকে অবশিষ্ট তিন জন মহাকোশলের মন্ত্রীকে নূতন মন্ত্রীসভায় রাখা হইয়াছে ও তাঁহাদের একজন প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে যদি গোটা বিষয়টিকে নিরাসক্তভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে ড. খারে ও তাঁহার প্রতি আচরণের প্রশ্নটিকে নূতন মন্ত্রী-সভা গঠনের প্রশ্ন হইতে আলাদা করিয়া লইতে হইবে।

ড. খারের প্রতি যে আচরণ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ণতম দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে।

নূতন মন্ত্রীসভা গঠন সম্পর্কে নেতা নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে কংগ্রেসের বিধান সভা দলের এবং পরে তাঁহার মন্ত্রীসভা নির্বাচনের দায়িত্ব বহুলাংশে দল-নেতার। ২৭ জুলাই কংগ্রেসের বিধান সভার দল যখন ওয়ার্ধায় মিলিত হইয়াছিল তখন নেতা নির্বাচনের বিষয়ে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। মহাকোশল-গোষ্ঠী যদি তাঁহাদের একজনকে নেতা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তবে তাহা হইয়াছে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মতভাবে, যে নীতির প্রতি ড. খারের সমর্থকগণ এখন একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করিতেছেন। ড. খারের

নাম নেতা হিসাবে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাঁহার সমর্থকগণ ভাবিয়াছিলেন যে আমি তাহা অবৈধ ঘোষণা করিব এবং তাঁহারা একটি অভিযোগ পোষণের সুযোগ পাইবেন। কিন্তু আমি তাহা না করাতে তাঁহার নাম দ্রুত প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেসের বিধান সভা দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লকে নেতা নির্বাচন করিলে কাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে? যে মহাকোশলের বিধান সভা সদস্যগণ ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে ড. খারের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের সমর্থন হারানোর জন্য ড. খারের নিজেকেই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

যদি কেহ গোটা বিষয়টি নিরাসক্তভাবে বিবেচনা করেন তবে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইবেন যে ড. খারের প্রতি কোনো অবিচার করা হয় নাই কিংবা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণও করা হয় নাই। তৎসত্ত্বেও কেহ যদি যুক্তি দেখান যে তাঁহাকে বিশেষ কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে নেতাকে নেতৃত্বের মূল্য দিতে হয়। সাফল্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই সম্ভবত যাহা পাইবার উপযুক্ত নন তদপেক্ষা অধিক প্রশংসা ও কৃতিত্ব পান অপর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই সব নিন্দা কিংবা কমপক্ষে তাহার বহুলাংশ পাইয়া থাকেন। সুতরাং কোনো সময় সমর্থকগণ কিংবা দেশবাসীগণ যদি কোনো নেতার বিচার কঠোরভাবে করেন তাহা হইলে নেতার অনুযোগ করা উচিত নয়। কোনো যুদ্ধে জয় হইলে সেনাপতি বীর হইয়া দাঁড়ান আর বিপর্যয় ঘটিলে তিনি কঠোর শাস্তি পান। কিন্তু কোনো বিবেকবান সেনাপতি কিংবা মন্ত্রী তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে কিংবা অসংগত আচরণ করা হইয়াছে মনে করিলেও তাঁহার সরকার কিংবা তাঁহার দলের বিরুদ্ধে সারা দেশে নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়ান না। পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় আচরণে মর্যাদা ও দায়িত্ববোধের এরূপ চরম অভাবের পরিচয় দিবেন না।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বিধান সভা কংগ্রেস দল এমনভাবে গঠিত যে মহাকোশলের সদস্য সংখ্যা অবশিষ্ট সদস্যগণ অপেক্ষা বেশি। ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে দল যখন প্রথম নেতা নির্বাচিত করিয়াছিল তখন ড. খারে সর্বসম্মতভাবে নেতা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ড. খারের ব্যক্তিগত সমর্থক সংখ্যা দলে এত কম ছিল যে তিনি মহাকোশলের ভোট ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাইতেন না। সুতরাং মহাকোশল সদস্যগণের প্রশংসায় ইহা বলিতে হয় যে তাঁহারা প্রাদেশিক কিংবা আঞ্চলিক ধারায় চিন্তা করেন নাই। অতএব অনুকূল অবস্থার মধ্যে ড. খারে নেতা হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে

১৯৩৭-এর জুলাই মাসে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারো মাস সেই পদে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে দলের উপর তাঁহার যে কর্তৃত্ব ছিল তাহা তিনি হারাইলেন কেন? যে মহাকোশল সদস্যদের সমর্থন গত বৎসর তাঁহাকে নেতৃপদে সর্বসম্মতভাবে বসাইয়াছিল তাঁহাদের তিনি বিদ্বিষ্ট করিয়াছিলেন কেন?

১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরা কংগ্রেসের পর শরীফের ব্যাপার, উমরি হত্যার মামলা, জব্বলপুরের দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। অসন্তোষ বাড়িতে বাড়িতে মে মাসের প্রথমে ইহা সংকটে পরিণত হইয়াছিল। ৭ মে ড. খারেকে লিখিত শ্রীযুক্ত মিশ্রের পত্র প্রধানমন্ত্রীর জব্বলপুরের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির মুখোমুখি হইবার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি তাঁহার গভীর অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

৮ মে সকালে মন্ত্রীদের মধ্যে শলাপরামর্শ হইয়াছিল এবং সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর অধীন বিভাগগুলির প্রশাসন বহুল সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল। সেই দিন মন্ত্রী গোলে, শুক্ল, মিশ্র ও মেহতা মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া এবং তাহা করিবার পক্ষে তাঁহাদের কারণ দেখাইতে একটি দীর্ঘ পত্র ড. খারেকে লিখিয়াছিলেন। সেই কারণগুলি ছিল সংক্ষেপে এইরূপ:

ক. তাঁহার স্বরাষ্ট্র বিভাগ পরিচালনা দুর্বলতা-চিহ্নিত ছিল।

খ. অর্থনীতি ও অন্যান্য প্রশ্নে তিনি সহকর্মীদের উপদেশের বিরুদ্ধে বিভাগের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

গ. জব্বলপুরে দুইটি দাঙ্গাহাঙ্গামার পর তিনি তাঁহার সহকর্মীদের অনুরোধ সত্ত্বেও পুলিস প্রশাসনে দৃঢ়তার পরিচয় দেন নাই।

ঘ. পত্রে উল্লিখিত অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি সচিবদের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঙ. গুজবের ভিত্তিতে মন্ত্রী গোলের বিরুদ্ধে ম্যাঙ্গানিজ-পিণ্ড বিক্রয় -সম্পর্কিত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে নাগপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সে সম্বন্ধে তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

চ. তিনি মন্ত্রী শরীফ সম্বন্ধে ওয়ার্ধার ডেপুটি কমিশনারের নিকট খোঁজখবর লইয়াছিলেন এবং সেই ভিত্তিতে পূর্বোক্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সর্দার প্যাটেলের কাছে অভিযোগ করিয়াছিলেন যদিও ডেপুটি কমিশনার পরে এই ঘটনা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

৮ তারিখ সকালের আলোচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেশমুখ একটি বিবরণ তৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং পরের দিন পত্রের আকারে তাহা ড. খারেকে জানাইয়াছিলেন। এই পত্রটিতে শ্রীযুক্ত দেশমুখ লিখিয়াছিলেন :

"যাহা গুরুতর একটি সংকট হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা এড়ানো সম্ভব কিনা তাহাব উপায় নির্ধারণের জন্য আলোচনা হইয়াছিল। প্রত্যেকে এ-বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে সংকট কংগ্রেসের সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূল হইবে না এবং আমাদের মর্যাদা বাড়াইবে না। আলোচনা হইয়াছিল স্পষ্ট, খোলাখুলি এবং তাহাতে কোনো পক্ষপাত এবং অযথা উত্তাপ ছিল না ; কিন্তু আলোচনাকালে এমন মূলগত মতভেদ প্রকাশ পাইয়াছিল যে কাজ চালানোর মতো বোঝাপড়ার বড়ো একটা আশা দেখা যায় নাই।"

শ্রীমিশ্রের অভিমত ছিল যে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ড. খারে ছিলেন খুবই দুর্বল এবং তাঁহাদিগকে যে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব তিনি দিতে পারিবেন না শুধু তাহাই নয়, অধিকন্তু ড. খারে আমলাতন্ত্রের হাতে খেলিতে বাধ্য হইবেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে এই ত্রুটির জন্য জব্বলপুরে তাঁহার নিজের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে খোয়াইয়াছেন এবং কংগ্রেসের মর্যাদা বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে ড. খারে বিভাগীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সব-কিছু বিচার করেন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পরামর্শ করেন না ও তাঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন না— বরং তিনি মুখ্যসচিব ও বিভাগীয় প্রধানের উপর নির্ভর করেন। এই পরবর্তী অভিযোগ সম্বন্ধে শ্রীমেহতাও একমত এবং কড়া বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণস্বরূপ তিনি জব্বলপুর হইতে শ্রীনিয়াজ আহম্মদ খানের বদলি সম্পর্কে মনোভাবের এবং জেলা পুলিসের মহার্ঘভাতা সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কমিটির সুপারিশগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফৌজদারি কর্মবিধির ১৪৪ ধারা বলে প্রদত্ত আদেশভঙ্গ-সম্পর্কিত মামলায় সেওড়ি নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার এবং বিলাসপুর তদন্তে ভৃত্যদের পক্ষে ব্যবহারজীবী নিয়োগের বিষয়গুলিও দুর্বলতার চিহ্নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উল্লিখিত বিষয়গুলি হইতে এবং যে পাঁচমারি আপসের কথা আমি পরে উল্লেখ করিব তাহার পরে মন্ত্রীগণ (প্রধানমন্ত্রী সহ) কর্তৃক প্রচারিত যৌথ বিবৃতি হইতে ইহা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার অধিকাংশ মন্ত্রীর মধ্যে যে বিরোধ ছিল, প্রকৃতির দিক হইতে যেমন তাহা ব্যক্তিগত ছিল না, তেমনই প্রাদেশিকও (আঞ্চলিক) ছিল না। বিরোধের কেন্দ্রে ছিল এমন কয়েকটি প্রশ্ন,

যেগুলি প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক। ড. খারে অবশ্য এই বিরোধকে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও প্রাদেশিক (আঞ্চলিক) মনোভাবসজাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত ঘটনাগুলির দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয় না।

পদত্যাগ পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ড. খারে বুঝিয়াছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার পদ টলিয়া গিয়াছে। সম্ভবত সেই কারণে তিনি তাঁহার সহকর্মী-দের পদত্যাগ পত্র গভর্নরের কাছেও দাখিল করেন নাই কিংবা ইহা বিবেচনার জন্য দলের কোনো সভাও ডাকেন নাই। তাহার পরিবর্তে তিনি দুইটি তাৎপর্য-পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগোলেকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক (আঞ্চলিক) কারণে একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। শ্রীগোলে তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশ্রী শুক্ল, মিশ্র ও মেহতাকে নিম্নরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :

"আজ সন্ধ্যায় আমি আপনাদের সহিত একত্রে আমার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছিলাম। ড. খারের আমন্ত্রণে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ড. খারে আমাকে বলিয়াছিলেন যে সংকীর্ণ প্রাদেশিক কারণে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইতেছে। আমার মনে হয় যে তিনি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে ইহা হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন। আমাকে ইহাও বুঝানো হইয়াছিল যে নাগপুরে ও বেরারে আমার কাজের যুক্তিসংগত কারণ দেখানো আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। আমি বলিয়াছিলাম যে এরূপ প্রশ্ন এখন তোলা উচিত নয় এবং পদত্যাগের এই অর্থই যদি করা হয় তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে আমি ইহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে চাই। শ্রীমিশ্র তাঁহাকে গত-বৎসর সমর্থন করিয়াছিলেন আমি ইহা উল্লেখ করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীমিশ্র এখন কেন তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছেন তাহা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। একমাত্র প্রাদেশিক স্বার্থ বিবেচনায় আমি আপাতত পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন..."

এই সাক্ষ্যের আলোকে ইহা কি বলা যায় যে একজন মহারাষ্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাড়াইবার জন্য মহাকোশলীদের পক্ষে একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছিল? পক্ষান্তরে বরং ইহাই কি বলা যায় না যে মহারাষ্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রীই প্রথম আঞ্চলিক প্রশ্নটি তুলিয়াছিলেন?

ড. খারে দ্বিতীয় যে চালটি চালিয়াছিলেন তাহা হইল এই যে তিনি তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে দুই জনের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে

পত্র লিখিয়াছিলেন। জবরদস্তি প্রতিহত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রত্যভিযোগ উত্থাপন করিলে ডক্টর তাঁহার কৌশল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর শান্তি সম্মেলন আহূত হয় এবং 'নিজের মৃত্যুপরোয়ানা সহি করা ছাড়া' যে-কোনো আপস-রফায় প্রধানমন্ত্রী সম্মত হইলেন। ৯ মে যে বোঝাপড়া হইয়াছিল তদনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে ড. খারেই প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন— তবে তিনি তাঁহার দপ্তরগুলি ছাড়িয়া দিয়া মন্ত্রীদের কাজের সমন্বয় সাধনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবেন। আরো মতৈক্য হইয়াছিল যে এই আপস-রফা ওয়ার্কিং কমিটির কাছে দাখিল করা হইবে।

এই বোঝাপড়া পকেটে লইয়া মন্ত্রীগণ ১৫ মের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে বোম্বাই আসেন। বোম্বাইতে ড. খারে এই বোঝাপড়া হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার দপ্তরগুলি বজায় রাখিতে দিতে মহাকোশলের সহকর্মীগণ যাহাতে সম্মত হন কিংবা তিনি যাহাতে মন্ত্রীসভার রদবদল করিতে পারেন সেজন্য সর্দার প্যাটেলের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সর্দার তাঁহাকে সাহায্য করায় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন এই কারণে যে, দলে যে তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন। এই বোম্বাইতে ড. খারে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যকে জানান যে তিনি মন্ত্রীদের কাজ সম্বন্ধে গোপন তদন্তের আদেশ দিয়াছেন।

১৫ তারিখ বোম্বাই-এ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইয়াছিল এবং সযত্ন-বিবেচনার পর কমিটি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন মধ্যপ্রদেশ বিধান সভা দলের একটি বৈঠক ডাকিয়া মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিবেচনা করেন এবং তাঁহার সমাধানের পথ নির্ধারণ করেন। কমিটি পরামর্শ দেন যে এই প্রশ্ন বিবেচনার জন্য যে দলীয় বৈঠক বসিবে তাহা সংসদীয় সাব-কমিটির সভাপতি শ্রীবল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে যেন অনুষ্ঠিত হয়।

ড. খারে ও তাঁহার সহকর্মী সর্বশ্রী গোলে ও দেশমুখ এই সিদ্ধান্তে খুশি হইতে পারেন নাই। ইহার আগে ৯ মে শ্রীদেশমুখ প্রধানমন্ত্রীকে নিম্নোক্তরূপ লেখেন :

"আমার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে সমস্যার কোনো স্থানীয় সমাধান সম্ভব নয়। কোনো সমাধান যদি থাকে তবে তাহা বাহির হইতে আনিতে হইবে।"

আর ড. খারে তো জানিতেন যে দলের সভায় সরাসরি ভোট লওয়া হইলে তাঁহার অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়িবে, কারণ তিনি তাঁহার মহাকোশল সহকর্মী-

দের সমর্থন হারাইয়াছেন। তিনি প্রায় এই কথাই বোম্বাইতে সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যদের বলিয়াছিলেন। আর এ-বিষয়ে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভার পর শ্রীযুক্ত গোলের মনোভাব পাঁচমারি হইতে সর্দার প্যাটেলকে তিনি যে পত্র ১০ মে লেখেন এবং যাহা পরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

পাঁচমারিতে একটি রাজকীয় যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি থাকিলেও তাহা পূর্ণ হয় নাই। মন্ত্রীগণ নিজেরাই একটা আপস-রফায় আসিয়াছিলেন। সংসদীয় সাব-কমিটির যে-সব সদস্য পাঁচমারিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের এই আপস-রফায় হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ ছিল না। ড. খারে 'আমার কৈফিয়তে' বলিয়াছেন যে উপস্থিত ৬৮ জন সদস্যের ৪৪ জন (মোট সংখ্যা ৭২ জনের মধ্যে) সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন যে কোনো আপস-রফা না হইলে ড. খারে সহ ছয় জন মন্ত্রীকেই বিদায় লইতে হইবে। এই বিবৃতি সত্য, ইহা ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে তিনি তাঁহার মহাকোশল সহকর্মীদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিলে দলের অধিকাংশ সদস্য তাঁহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পাঁচমারির আবহাওয়া ছিল আপসের অনুকূল এবং নিম্নোক্ত আপস-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল :

১. ড. খারে সমস্ত দপ্তরের ভার ত্যাগ করিবেন এবং দপ্তর রদবদল হইবে।
২. ড. খারে মন্ত্রীদের কাজে সমন্বয় সাধনে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।
৩. দপ্তর রদবদলের শীঘ্রতম সময় হইল মন্ত্রীদের পাঁচমারি ত্যাগের পূর্বে এবং শেষতম সময় হইল জুলাই মাসের শেষে।
৪. উভয় গোষ্ঠীর কোনোটিই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো-কিছুর ছুতায় আপস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে না।
৫. দপ্তর রদবদলের প্রশ্নে কোনো মতভেদ দেখা দিলে তাহা সালিশীর জন্য মহাকোশল, নাগপুর ও বিদর্ভ প্রদেশের সভাপতিদের কাছে যাইবে এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
৬. প্রধানমন্ত্রী কোনো সহকর্মীর আচরণ সম্বন্ধে কোনো পুলিসী তদন্ত করাইবেন না এবং কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকিলে তাহা তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীগণের সম্মুখে দাখিল করা হইবে এবং সে ব্যাপারে তাঁহার বক্তব্য জানিতে চাওয়া হইবে।

এত বিলম্বে ড. খারে 'আমার কৈফিয়তে' যাহা বলিয়াছেন তাহা বলা নিরর্থক অর্থাৎ তিনি এই আপস-রফার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডক্টর নিজেই পাঁচমারির

যে পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এরূপ ছিল যে তাঁহার সম্মুখে দুইটি অশুভের মধ্যে একটি বাছিয়া লইবার উপায় ছিল অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ কিংবা দপ্তরগুলি ত্যাগের বিনিময়ে তাহা রক্ষা করা। তিনি শেষেরটিকে অপেক্ষাকৃত কম অশুভ বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার ফল হইয়াছিল আপস-রফা। এই আপস-রফা সহজে হইয়াছিল, কেননা তাঁহার সহকর্মীগণ প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে চান নাই, কেবল তাঁহার অধীন দপ্তরগুলির অব্যবস্থিত পরিচালনা বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি নিজেই প্রথম ৯ মে বোম্বাই রওনা হইবার আগে পাঁচমারিতে প্রধান শর্তটির প্রস্তাব করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি দপ্তরগুলি ছাড়িয়া দিয়া সমন্বয়কারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে থাকিবেন। আপস হইবার পর ২৫ মে পাঁচমারিতে নীচের যৌথ বিবৃতিটি মন্ত্রীগণ কর্তৃক সর্দার প্যাটেলের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল :

"দলের যে ইচ্ছা ২৪ মের সভায় ব্যক্ত হইয়াছিল তাহার জবাবে আমরা একত্রিত হইয়াছিলাম এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সম্পর্কিত সব প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। ইহার কতকগুলি মেজাজ সম্পর্কিত, কতকগুলি ছিল দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতাজনিত আর অন্যান্যগুলি ছিল মন্ত্রীসভার আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে পদ্ধতিগত প্রশ্ন। আমরা এ কথা জানাইতে পারিয়া আনন্দিত যে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাদের সকল বিভেদের অবসান ঘটাইতে পারিয়াছি এবং সাথীর মনোভাব লইয়া আমরা কাজ করিতে সম্মত হইয়াছি। আমাদের আস্থা আছে যে আমরা আপনার পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন পাইব।"

ড. খারের অনুরোধেই চুক্তির শর্তগুলি প্রকাশ করা হয় নাই এবং তিনি অপমানিত হইতেছেন এরূপ বোধের সৃষ্টি যাহাতে না হয় সেজন্য শর্তগুলি কার্যকর করা বিলম্বিত হয়। পাঁচমারি হইতে ২৬ জুন তারিখে শ্রীযুক্ত দেশমুখ সর্দার প্যাটেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই আপস-রফার উল্লেখ আছে এবং শ্রী এম. এস. অ্যানে সর্দার প্যাটেলকে ইয়োটমল হইতে ৮ জুন যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে। বস্তুত কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের চাপে ড. খারে প্রথম দিকে চুক্তি রূপায়ণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি এই অবস্থা হইতে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। নিজের দপ্তরগুলি না ছাড়িয়া তাহার পরিবর্তে তাঁহার মন্ত্রীসভার রদবদল করার ও তাঁহার মহাকোশল সহকর্মীদের বাদ দিবার চেষ্টা করা উচিত— এরূপ একটি ধারণা তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি মে মাসে বোম্বাইতে সর্দার প্যাটেলকে

প্রভাবিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহার চেষ্টা আব্যাহত ছিল। তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তিনি ইতিপূর্বে তাঁহাদের বিরুদ্ধে গোপন পুলিসী তদন্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির যে-সব সদস্য ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা কঠোরভাবে ইহার নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই তাঁহাদের এ নিন্দার কোনো ফল তাঁহার উপর হয় নাই। এখানে ইহা যোগ করা যায় যে দুর্নীতির অভিযোগগুলি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

পাঁচমারি আপসের পর কিছু সময়ের জন্য বাহির হইতে অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু গণ্ডগোল অব্যাহত ছিল। একদিকে ডক্টর যুক্তির শর্তগুলি মানিয়া চলেন নাই। অপর দিকে পূর্বোল্লিখিত গোয়েন্দা পুলিসের তদন্ত অব্যাহত ছিল। পুলিস ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নিজে তদন্ত চালাইবার জন্য বেসরকারী সংঘ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে সে কথা মৌলানা আজাদ ও আমাকে পর্যন্ত বলিয়াছিলেন। কোনো প্রধানমন্ত্রীর এরূপ অভূতপূর্ব আচরণের ফল সচিবদের উপর, সরকারী সাধারণ কর্মচারীদের উপর এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের উপর কী হইতে পারে তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা কল্পনা করা বেশি সহজ। প্রকৃতপক্ষে একজন উচ্চপদাধিকারী কর্মচারী একজন কর্মরত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এরূপ তদন্তে দৃঢ় আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী অপর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুরূপ তদন্তের আর-একটি নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তা নিজে সে আদেশ কার্যকর করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

পাঁচমারির পরে ঘটনাবলীর বিবর্তন যদি কেহ সযত্নে বিশ্লেষণ করেন তবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বাধ্য হইবেন যে ড. খারে নিজেই আপস-রফার শর্তগুলি পূরণের হাত এড়াইবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছিলেন। জুন মাসের শেষে যখন মৌলানা আজাদ ও আমি কলিকাতায় ফিরিতেছিলাম তখন ট্রেনে ডক্টরের সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল এবং আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে আপস-রফা তাঁহার কার্যকর করা উচিত এবং সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সকল গোপন কার্যকলাপ বন্ধ করা উচিত। তিনি সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো-কিছু শুনিলে কেন তাহা তাহাদের জানান না— আমরা সরাসরি এই প্রশ্ন তাঁহাকে করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে তাহা হইলে তাঁহারা সতর্ক হইয়া যাইবেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিবেন না। মৌলানা আজাদ এবং

আমি ট্রেনে তাঁহার সহিত যে আলোচনা করিয়াছিলাম দৃশ্যত তাঁহার উপর তাহার কোনো ফল হয় নাই এবং আমরা মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা লইয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম। ৮ জুলাই ড. খারে একজন মন্ত্রীর সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ-সংবলিত একটি পত্র ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হইয়াছিল যে ডক্টর তাঁহার কয়েকজন সহযোগীকে পদচ্যুত করার জন্য এবং নিজের খুশিমতো মন্ত্রীসভা পুনর্গঠনের জন্য মামলা তৈয়ারি করার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পাঁচমারি চুক্তি কার্যকর করার জন্য মন্ত্রীদের সভা হইত। এরূপ শেষ সভা হইয়াছিল ১৩ জুলাই নাগপুরে; কিন্তু সে-সব সভায় কোনো ফল হয় নাই। চুক্তির শর্তগুলি লংঘন করিয়া শেষ পর্যন্ত সর্বশ্রী খারে, গোলে ও দেশমুখ বলিয়া চলিয়াছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে পুলিস দপ্তর থাকা উচিত। এই-সব সভায় ড. খারে বলিতেন যে তিনি পদত্যাগ করিবেন এবং অন্য মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে বলিবেন। তিনি ১৫ জুলাই সর্দার প্যাটেলকে দুইটি পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোনোটিতে তাঁহার পদত্যাগের ও অপর মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে বলার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নাই, যদিও এই দুইটি পত্রের একটিতে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"ঘটনা যেমন যেমন ঘটে সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে মাঝে মাঝে অবহিত রাখিব।"

১৩ জুলাই শ্রীগোলে ও দেশমুখ ড. খারের হাতে তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন ডক্টর রায়পুরের ঠাকুর পিয়ারেলাল সিং-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিনিধি ১৭ জুলাই রায়পুরে গিয়াছিলেন এবং ঠাকুর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ১৯ জুলাই ঠাকুর সাহেব ড. খারেকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার নতুন মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে সম্মত আছেন। ইত্যবসরে নাগপুরে ডক্টর সর্বশ্রী শুক্ল, মিশ্র ও মেহতার কাছে চিঠি লিখিয়া জানিতে চান তিনি যদি পদত্যাগ করেন তবে তাহারা নজির অনুসরণ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর সহিত পদত্যাগ করিবেন কিনা। চিঠির তারিখ ছিল ১৮ জুলাই— কিন্তু এ চিঠি কার্যত ১৯ তারিখ বৈকালে তাঁহাদের কাছে পৌঁছিয়াছিল। আমি শ্রীমেহতার উত্তরের একাংশের উদ্ধৃতি নীচে দিতেছি এবং এই চিঠিটি ২০ জুলাই বেলা ১১টায় ড. খারে গভর্নরের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করার পূর্বে তাঁহার হাতে শ্রীমেহতা ব্যক্তিগতভাবে দিয়াছিলেন।—

"আপনার ১৯৩৮এর ১৮ জুলাই-এর যে গোপনীয় পত্রটি আজ বিকাল ২টায় আমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনি স্মরণ করিবেন যে আমার অনুরোধে শ্রীগোলে আপনাকে গত শুক্রবার (১৫ জুলাই) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি বার্তা দিয়াছিলেন। এই বার্তায় তিনি এ প্রদেশে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বে আপনাকে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা ব্যবস্থা না লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৭ তারিখ সকালে আমি আপনার গৃহে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তখন এক ঘণ্টারও অধিক সময় আপনার সহিত আলোচনার পর আপনি বলিয়াছিলেন যে আপনি আপনার সহকর্মী শ্রীমিশ্রকে প্রথমে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা না জানাইয়া, অভিযোগগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে তদন্ত না করিয়া গুরুতর ধরনের সেই অভিযোগগুলি মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার সাহেবের গোচরীভূত করিয়া নিজের সহকর্মীর প্রতি গুরুতর ব্যক্তিগত অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া আপনি মনে করেন। আপনি এ কথাও আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাহার পরে আপনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানাইয়াছিলেন যে বিষয়টি যেন বাতিল বলিয়া গণ্য করা হয়। অবশ্য আপনি যে মন্ত্রীসভা হইতে তাঁহাকে বাদ দিবার দাবি করিয়াছিলেন এবং এই অভিযোগ তদন্ত করার জন্য পুলিস প্রশাসনও নিয়োগ করিয়াছিলেন— আমার এই সংবাদের যাথার্থ্য আপনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। আপনার মধ্যে যে সম্ভ্রমবোধ আছে তা দাবি করে যে আপনার নিজের এই আচরণের জন্য শ্রীমিশ্রের কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত— এবিষয়ে আপনি একমত হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে আপনাদের পরস্পরের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন এবং আমিও যথাসম্ভব শীঘ্র সুবিধামতো সে ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমি এ কথাও আপনাকে বলিয়াছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী যদি এইভাবে সমঝোতা বজায় রাখিতে ও শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে আমি সহ প্রত্যেক সহকর্মী দলীয় প্রধানকে একনিষ্ঠ সমর্থন দিতে বাধ্য হইবেন। এইরূপ সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও হৃদ্যতার আবহাওয়ায় আমি আপনাকে ব্যক্তিগত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে উল্লিখিত ভাবে ঐক্য ফিরিয়া আসিলে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই আবহাওয়ায় আপনি যে পুলিস দপ্তরটি রাখিতে চান সে দপ্তরটি রাখিতে দিবার প্রশ্নটি আলোচনা করা সহজতর হইয়া উঠিবে। আমি পরে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে দুইজন মন্ত্রী অর্থাৎ শ্রীশুক্ল ও শ্রীগোলে ১৯ তারিখের আগে কর্মকেন্দ্রে

অনুপস্থিত থাকিবেন বলিয়া তাঁহারা না ফেরা পর্যন্ত বিষয়টি চূড়ান্ত আকার লইতে পারিবে না।

"প্রথমত, যে কারণে আপনি আমাদের রবিবার সকালের (১৭ তারিখ) আলোচনার বিরোধী কাজ করিয়াছেন এবং যে কারণ আপনাকে শুক্রবারে জানানো সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনুরোধের প্রত্যক্ষ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা যদি আমাকে জানান তাহা হইলে আমি বাধিত হইব। দ্বিতীয়ত, আপনার যে ব্যক্তিগত অভিমতের সহিত আদপেই আমার কোনো মিল নাই সেই অভিমত দ্বারা আপনি আমাকে কিভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমি বুঝি না। আপনার সেই অভিমত এই যে 'আমাদের মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ব্যতীত আমাদের অসুবিধাগুলির কোনো সম্ভাব্য সমাধান নাই।' আপনার সে ব্যক্তিগত ভালোলাগা না-লাগা আপনার একমাত্র নিজস্ব, তাহা ছাড়া, আমাদের অভিযোগগুলি শুনিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন অদূর ভবিষ্যতে বসিবে তাহা বসিবার আগে পদত্যাগ করার জন্য আপনার এত তাড়া কেন তাহা আমি বুঝি না। আপসের অন্যতম শর্ত ছিল যে পুলিস দপ্তর আপনার হাতে থাকিবে না আর এখন আপনি সে দপ্তর হাতে রাখিবার জেদ ধরিয়াছেন। রবিবার আপনি ও আমি একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে একমত হইয়াছিলাম আর এখন আপনি আমার অজানা কোনো কারণে তাহা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। আমাদের সকলের সম্মুখে অন্য যে পথ খোলা আছে তাহা এই যে আমরা উভয় পক্ষের অসুবিধা ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে পেশ করিয়া তাহার উপদেশ লইতে পারি। আমি নিশ্চিতরূপে সংকট বৃদ্ধির ও পাঁচমারির নাটক পুনরভিনয়ের বিরোধী। যদি আমাদের মধ্যে একজন (এবং তিনিও যিনি আমাদের নেতা) পাঁচমারিতে পরিদৃষ্ট সকল যন্ত্রণার পর সম্পাদিত চুক্তি মানিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে পৃথিবী কী বলিবে?

"আপনার পত্রের শেষাংশ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে আপনি সাংবিধানিক অবস্থার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এমন স্বতঃসিদ্ধ নয় যাহা আমাদের ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। এখানে সোজা ভাষায় বলিতে গেলে দোষ আপনার সহকর্মীদের নয়— দোষ আপনার নিজের। এখানে আপনিই সহকর্মীগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি না পালন করা সুবিধাজনক মনে করেন। যে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আপনাকে শুধু নিজের কথার মর্যাদা রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সেই মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিবার পক্ষে আপনার কি যুক্তি আছে?

"আপনি যদি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন না করেন তাহা হইলে আপনার বেদনাহত সহকর্মীদের অভিযোগের ও তাঁহারা চাহিলে তাঁহাদের পদত্যাগের কারণ থাকে এবং তাঁহারা আপনাকে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া আপনার তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার প্রশ্ন উঠে না।

"এতক্ষণ আমরা যে মহান সংগঠনের ছত্রছায়ায় ক্ষমতায় আসীন হইয়াছি তাহার কথা আমি বলি নাই। সেই সংগঠনের সতর্ক প্রহরা ও পরামর্শে মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে আমরা শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগের সম্মুখীন না হইয়া এমন কিছু করিতে পারি না যাহা অনমনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ২৩ তারিখ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিতেছে এবং কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে আমি পুনরায় আপনাকে বিষয়গুলি শান্তভাবে ও আবেগহীনভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

"আপনি যদি তৎসত্ত্বেও অবিচল থাকেন এবং মহামান্য গভর্নরের হাতে পদত্যাগপত্র তুলিয়া দেন এবং আমাকেও তাহা করিতে বলেন, তবে আমি বেদনার সংগে আপনার দাবি প্রতিরোধ করিতে বাধ্য হইব।"

শ্রীশুক্ল ও শ্রীমিশ্র ডক্টরকে একই সুরে পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীমিশ্রের পত্র ছিল দীর্ঘ এবং তাতে নীচের কথাগুলিও তিনি লিখিয়াছিলেন :

"আপনার মতলব যাহাই হউক-না-কেন আমি আপনাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে চাই যে আপনার সর্বজনস্বীকৃত নজিরে আমি ভয় পাই না কিংবা আপনার ভারত সরকারের আইনের কোনো ধারা আমাকে আশায় উদ্দীপিত করিয়া তুলে না। ইহা অদ্ভুত যে মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে আপনি বৃহত্তর একটি সম্মেলনের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন— দিল্লীর নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্মেলন যেখানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আপনাকে ও আমাকে মহান কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। যে কংগ্রেস সংবিধান কংগ্রেসের উপর ওয়ার্কিং কমিটিকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব দিয়াছে তাহার কথা আপনার স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষে মাত্র এক বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময় যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল না।

"যাহা হউক, নিজের সম্বন্ধে যাহা-কিছু করিবার অধিকার আপনার আছে তাহা আমি মানি কিন্তু আপনি আপনার সহকর্মীদের কাছে এ আশ্বাস দাবি করিতে পারেন না যে আপনি কংগ্রেস কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করিলে তাঁহারাও স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে তাহা করিবেন। শৃঙ্খলার নামে একজন সেনাপতি আমাদিগকে স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্রের মতো আচরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন কিন্তু আমাদের নিকট হইতে এরূপ আচরণ পাইবার দুঃসাহস একজন বিদ্রোহীর থাকা উচিত নয়। সেইজন্য বিষয়টি সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস সংসদীয় সাবকমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমার পদত্যাগে আপত্তি আছে।"

ড. খারে ২০ জুলাই গভর্নরের হাতে তাঁহার পদত্যাগ পত্র তুলিয়া দিবার পূর্বে শ্রীশুক্ল ও শ্রীমেহতার পত্র তাঁহার নিকট পেঁাছিয়াছিল এবং শ্রীমিশ্রের পত্র পেঁাছিয়াছিল একই দিনে কিছুটা পরে। প্রায় দ্বিপ্রহরে ড. খারে শ্রীদেশমুখ ও শ্রীগোলের পদত্যাগ পত্র সহ নিজের পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পরে কী ঘটিয়াছিল তাহা ২১ জুলাই প্রচারিত শ্রীশুক্ল, শ্রীমিশ্র ও মেহতার নিম্নোক্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যায়:

"২০ তারিখ বেলা সাড়ে বারোটায় আমাদের জানানো হইয়াছিল যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন এবং গবর্নর আমাদিগকে সাক্ষাতের অনুরোধ করিয়াছেন। বেলা ২টায় আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গভর্নরকে বলিয়াছিলাম যে আমরা ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে পারেন না। রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটে আমাদের একজন, শ্রীমেহতা, ড. খারেকে জানান যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে একটি পত্র পাঠাইয়াছেন এবং ইহা মধ্যরাত্রির দিকে আসিয়া পেঁাছিবে। শ্রীমেহতা তাঁহাকে আবার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। রাত্রি প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটে ঠাকুর ছেদিলাল প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য ও ড. খারের জন্য শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের একটি করিয়া পত্র লইয়া উপস্থিত হন। তিনি অবিলম্বে ড. খারের বাসস্থানে চলিয়া যান এবং সেখানে শ্রীগোলে ও শ্রীদেশমুখের চিঠি তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে ড. খারের চিঠি নিতে অস্বীকার করেন এবং সারারাত্রি ধরিয়া সর্বপ্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেখানে কেহ সে চিঠি গ্রহণ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত সে চিঠি আজ ডাকে পাঠাইতে হইয়াছে। যদিও লাটসাহেবের বাড়ির একটি পত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল, ঠাকুর ছেদিলালের ব্যক্তিগত ও পৌনঃপুনিক অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ চিঠিটির সহিত তাঁহার চিঠিটি লইবার অনুরোধ ড. খারের পুত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ড. খারে এবং শ্রীগোলে ও শ্রীদেশমুখকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন পদত্যাগের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি না করেন এবং এ বিষয়ে অন্যান্য কার্য স্থগিত রাখেন। তিনি আমাদিগকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আমরা যেন পদত্যাগ না করি, কারণ

এই সংকট মুহূর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে আমরা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি লইতে বাধ্য ছিলাম। আমরা তদনুসারে ভোর ১টা ৫০ মিনিটে মহামান্য গভর্নরকে জানাইয়াছিলাম এবং মৌখিকভাবে ও লিখিত-ভাবে আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।

পূর্বোদ্ধৃতভাবে আমরা আজ সকালে আমাদের পদচ্যুতির আদেশ পাইয়াছিলাম। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা বরাবর প্রদেশের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করিয়াছি এবং ২৩ তারিখে ওয়ার্ধায় যখন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে তখন আমরা বিশুদ্ধ বিবেক ও নির্মল হস্তে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিব।"

শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ২০ জুলাই ড. খারের পদত্যাগের সংবাদ জানিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে মন্ত্রীদের যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার বয়ান মোটামুটি একই প্রকার ছিল। ড. খারেকে তিনি নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছিলেন :

"কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহা স্পষ্ট যে সেই সংস্থার কাছে না জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের মতো গুরুতর পদক্ষেপ লওয়া উচিত নয়। সুতরাং আপনি সংসদীয় সাবকমিটির সদস্যগণের আগমনের ও ২৩ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করুন এবং আপনার পদত্যাগ প্রত্যাহার করুন— আমি এই উপদেশ আপনাকে দিতেছি। আপনার যদি ইহা প্রত্যাহার করার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে অন্তত আপনি গভর্নরকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করার অনুরোধ জানাইয়া সংকট এড়াইতে পারেন। আমার মতে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা বেশি ভালো হইবে। আপনি যদি আমার অনুরোধ না মানেন এবং ৪৮ ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যদি অবিলম্বে সংকট সৃষ্টি করিতে চান তাহা হইলে নিজের কাজের তাৎপর্য এবং তাহার ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হইতে বাধ্য তাহা আপনি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। আমি আশা করি যে আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না এবং যে বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া ইহা লিখিত হইয়াছে সেইভাবে ইহা গ্রহণ করিবেন।"

২০ জুলাই শ্রীশুক্ল, শ্রীমিশ্র ও মেহতা মহামান্য গভর্নরকে নীচের পত্রটি লিখিয়াছিলেন :

"আমাদের দুইজন শ্রীশুক্ল ও শ্রীমিশ্র ওয়ার্ধায় নিখিলভারত কংগ্রেস সংসদীয় সাবকমিটির সদস্য ও নিখিলভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শের ফলে তিনি ড. খারে ও শ্রীগোলে ও শ্রীদেশমুখকে পত্র লিখিয়া এই

অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া নেন কিংবা অন্তত ওয়ার্ধায় ২৩ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংসদীয় সাব-কমিটির সভা না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি না করেন। যে কমিটির কথা বলা হইয়াছে তাহার দুই জন সদস্য এখন ওয়ার্ধার পথে রওনা হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করা সম্ভব নয়। আজ বিকালে আপনাকে আমরা যেমন বলিয়াছিলাম আমাদের প্রথম কর্তব্য হইল কংগ্রেস ও তাহার সেই-সব সংগঠনের প্রতি যেগুলি, যে-সব প্রদেশে কংগ্রেসমন্ত্রীরা কর্মরত, তাঁহাদের সংসদীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য গঠিত হইয়াছে। আমরা কংগ্রেসের নির্দেশে পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পরিচালনায় পদ দখল করিয়া আছি। যদিও প্রধানমন্ত্রী চাহিলে তাঁহার সহকর্মীদের পদত্যাগ করা কর্তব্য— এই নজিরের মূল্য আমরা স্বীকার করি, আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে আমরা কংগ্রেসের স্পষ্ট নির্দেশে যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই। সুতরাং আপনার হাতে যে-সব পদত্যাগপত্র আছে সেগুলি গ্রহণ আপনি স্থগিত রাখুন— এই অনুরোধ করি।

"ইহা আমাদের বলার প্রয়োজন নাই যে গুরুতর পরিণতি এড়াইবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী প্রদেশ যুক্ত-প্রদেশ ও বিহারে মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ স্থগিত রাখার নজির আছে। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার আলোকে আমরা পদত্যাগ করিতে অক্ষম।"

এই পত্র সত্ত্বেও মহাকোশলের তিনজন মন্ত্রীকে ২১ জুলাই ভোর প্রায় ৫টার সময় পদচ্যুত করা হইয়াছিল। একই দিনে নূতন মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২২ জুলাই নূতন মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণও আমার সহিত মিলিত হন। কিছু আলোচনার পর ড. খারে ও তাঁহার সহকর্মী-বৃন্দ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য ভিন্ন একটি কক্ষে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ড. খারে ভুল স্বীকার করিয়া পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহকর্মীগণও এবিষয়ে একমত হইয়াছিলেন। ঠাকুর পিয়ারেলাল সিং পদত্যাগপত্রের একটি খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উন্নতি সাধন করিয়া নকল করা হইয়াছিল। যে আকারে মহামান্য গভর্নরকে ইহা জানানো হইয়াছিল তাহা ছিল এইরূপ :

"আমার পদত্যাগ ও নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের পর কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস

সংসদীয় সাব-কমিটির সঙ্গে আমার পরামর্শ করিবার সুযোগ হইয়াছে। এই পরামর্শের ফলে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আমার পদত্যাগপত্র পেশ করা ও নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে আমি হঠকারীভাবে কাজ করিয়াছি এবং বিচারে গুরুতর ধরনের ভুল করিয়াছি। সুতরাং আমি অত্রসহ আমার নিজের পক্ষে ও আমার সহকর্মীদের পক্ষে পদত্যাগ করি।"

ড. খারে নিজে সেই রাত্রে টেলিফোনে গভর্নরের সচিবকে এই পত্রের বক্তব্য জানাইয়াছিলেন।

'আমার কৈফিয়তে' ড. খারে শ্রীযুক্ত দেশমুখ কর্তৃক লিখিত উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণটি ছবির মতো হইলেও ইহা ঠিক নহে ও বিভ্রান্তিকর। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। শ্রীদেশমুখের বিবরণ হইতে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে যখন ড. খারে পৌঁছিয়াছিলেন তখন সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণ মহাকোশলের ভূতপূর্ব মন্ত্রীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ঘটনা এই যে মহাকোশলের ভূতপূর্ব মন্ত্রীগণ নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়াছিলেন আর ড. খারে ও তাঁহার দুইজন সহকর্মী বিলম্বে আসিয়াছিলেন। শ্রীদেশমুখ আসিয়াছিলেন ডক্টরের আসার প্রায় আধঘণ্টা পরে। তাহা হইলে তাঁহার আসার পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীদেশমুখ কি করিয়া হইতে পারেন?

২৩ জুলাই ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল এবং ড. খারে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। কমিটি তাঁহাকে জানায় যে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে আইন-সভা দলের নেতৃত্বপদ তাঁহার ত্যাগ করা উচিত। তিনি এই অবস্থা মানিয়া লন কিন্তু কমিটিকে জানান যে দল কর্তৃক তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণের পর তিনি আবার এই পদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইবেন। কমিটি তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে যাহা-কিছু ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পর এরূপ কাজ করা তাঁহার পক্ষে যথোচিত হইবে না। ড. খারে অবশ্য নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যে অধিকার তাঁহার আছে বলিয়া মনে করেন সেই অধিকার প্রয়োগের জন্য জিদ ধরিয়া থাকেন। কমিটি তাঁহার পদত্যাগ ও তজ্জনিত বিষয়-গুলি বিবেচনা করার কথা বলার পর ড. খারে কর্তৃক আইন-সভা দলের একটি সভা আহূত হইয়াছিল এবং এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিয়াছিলেন:

বুধবার ২৭ জুলাই সকাল ৯টায় ওয়ার্ধায় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কংগ্রেস

আইন-সভা দলের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে—

১. প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার দুই সহকর্মীর পদত্যাগ ; মহাকোশলের তিন-জন মন্ত্রীর পদচ্যুতি, নূতন মন্ত্রীসভা গঠন ও পরে ইহার পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি ;

২. নেতার পদত্যাগ ;

৩. নেতা নির্বাচন।

কিছুটা ভুলের দরুন কয়েকজন সদস্যকে টেলিগ্রামে জানানো হইয়াছে যে উল্লিখিত সভাটি নাগপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা দয়া করিয়া লক্ষ করিবেন যে উল্লিখিত সভাটি ওয়ার্ধায় হইবে, নাগপুরে নয়।"

২৫ জুলাই ডক্টরকে আবার আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং পুনরায় তাঁহাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায় ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখনো তিনি ইহাতে সম্মত হন নাই। তখন প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার আগে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত পরামর্শ করুন। ড. খারে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে সেবাগ্রামে গিয়াছিলেন। কমিটির কয়েকজন সদস্য সহ আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কাজ সম্বন্ধে কী মনে করেন তাহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এবং আলোচনার শেষে ড. খারে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'আমি বিনা দ্বিধায় নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম।' এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজী যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেম আমি তাহা হইতে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দিতে পারি :

"আমি ড. খারের আত্মপক্ষ সমর্থন পড়িয়াছি। আমি একমাত্র যে অংশের সহিত জড়িত সে বিষয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা আমার কর্তব্য। ড. খারের প্রতিবাদ করিতে হইবে ইহা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। তিনি স্বেচ্ছায় সেবাগ্রামে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন কোনো প্রতিবাদ করেন নাই। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনিয়াছিলাম তিনি পূর্ণ তর্ক যুক্তি ব্যতীত তাহা মানিয়া লন নাই। আর যখন তিনি আমার যুক্তির শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বিনা দ্বিধায় নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি স্বীকৃতভাবে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহার যে বন্ধুদের নাম করিয়াছিলাম তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে

অহেতুক দ্রুততা ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত লইতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং অন্য বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন তাঁহার নাই। তখন আমি বলিয়াছিলাম যে তিনি যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা বরং নিজে লিখিয়া ফেলুন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজে মুসাবিদাকারী নন বলিয়া বিবৃতির খসড়া আমার রচনা করা উচিত। আমি বলিয়াছিলাম যে তাহা সত্ত্বেও আমি তাঁহার ভাষা চাই। আমি যদি মনে করি যে তিনি যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা যথেষ্টভাবে খসড়ায় নাই তবে উহা আমি সংশোধন করিব কিংবা কিছু যোগ করিব। কিছুটা ইতস্তত করার পর তিনি কাগজ ও কলম লইয়াছিলেন এবং খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। আমি তখন তাহা লইয়াছিলাম এবং সংশোধন ও সংযোজন করিয়াছিলাম। তিনি দুইবার কিংবা তিনবার ইহা পড়িয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তিনি কখনো আস্থা ভঙ্গ মানিয়া লইতে পারেন না এবং এই অবস্থায় তিনি তখনো সেই স্থানে কোনো বিবৃতি দিবেন না বরং বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করার যে কথা আমি বলিয়াছিলাম তাহা মানিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিবেন। তখন তাঁহার উত্তর পাইবার সময়-সীমা স্থির হইয়াছিল পরবর্তী দিনের বিকাল ৩টা। আমি, সভাপতি শ্রীসুভাষ বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, যাঁহারা এখানে আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি এবং তাঁহারা আমার এই বয়ান সমর্থন করিয়াছেন।"

নাগপুরে বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া ড. খারে মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি ২৬ জুলাই বিকাল প্রায় ৩টার সময় সেই মর্মে একটি টেলিফোন বার্তা পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিত তাঁহার পত্র সেই দিন সন্ধ্যা প্রায় ৮টার সময় পাওয়া গিয়াছিল। সেই পত্রে তিনি নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"আমি কোনো শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে দোষী ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমার কাজের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা হানি হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নই। খসড়ায় কংগ্রেসে আস্থা ও দায়িত্বের পদে আসীন থাকায় আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু ভিত্তিহীন ইঙ্গিত আছে। আমি তাহা মানিয়া লইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত।"

তাঁহার এই বিদ্রোহী মনোভাবের পটভূমিকায় ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে গুণাগুণের ভিত্তিতে বিষয়টি সম্বন্ধে মতামত ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়

ছিল না। সুতরাং নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল :

"সংসদীয় সাব-কমিটির বক্তব্য শোনার পর ও পাঁচমারিতে সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণের ও সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের উপস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদনের পর হইতে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে সেগুলি উদ্বেগের সহিত বিবেচনা করিবার পর এবং ড. খারের সহিত কয়েকটি সাক্ষাৎকারের পর ওয়ার্কিং কমিটি অনিচ্ছায় হইলেও এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে তাঁহার নিজের পদত্যাগে ও তাঁহার সহকর্মীগণের পদত্যাগের দাবিতে পর্যবসিত হইয়াছিল এরূপ পর পর কতকগুলি কাজের দ্বারা ড. খারে বিচারের গুরুতর ভ্রান্তিতে দোষী। তাহার ফলে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস উপহাসের পাত্র হইয়াছে এবং তাহার মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে। তাঁহাকে কোনো হঠকারী কাজ না করা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই রূপকাজ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়েও দোষী।

"কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর তাঁহার পদত্যাগের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ গভর্নর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ড. খারের তিনজন সহকর্মীকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি সন্তোষের সহিত লক্ষ করিয়াছে যে এই তিন জন কংগ্রেসী মন্ত্রী, গভর্নর তাঁহাদের পদত্যাগ দাবি করিলেও, সংসদীয় সাব-কমিটির নির্দেশ ব্যতীত পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য গভর্নরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এবং যে রেওয়াজের কথা তিনি জানিতেন তাহার বিপরীত উপায়ে সংসদীয় সাব-কমিটিকে না জানাইয়া প্রকৃতপক্ষে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া ও শপথ গ্রহণ করিয়া ড. খারে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে আরো দোষী হইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি যখন জানিতেন যে এই সংস্থার অধিবেশন আসন্ন।

তাঁহার এই-সব কার্যদ্বারা ড. খারে নিজেকে কংগ্রেস সংগঠনগুলিতে দায়িত্ব-পূর্ণ পদের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যে পর্যন্ত কংগ্রেসসেবী-রূপে নিজের সেবার দ্বারা নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ ও কঠোর শৃঙ্খলাসম্পন্ন এবং নিজের গৃহীত দায়িত্ব পালনে দক্ষ বলিয়া প্রমাণিত না করেন ততদিন পর্যন্ত তিনি এইভাবেই বিবেচিত হইবেন।

"ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তেও আসিয়াছে যে মধ্যপ্রদেশের গভর্নর যে

অশোভন দ্রুততার সহিত রাত্রিকে দিনে পরিণত করিয়াছিলেন ও প্রদেশের সংকটকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা তিনি কংগ্রেসকে দুর্বল ও নিন্দাভাজন করিতে আগ্রহী ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে তিনি মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে যাহা চলিতেছিল তাহা এবং সংসদীয় সাব-কমিটির নির্দেশের কথা নিশ্চয় জানিতেন। এই অবস্থায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন আসন্ন ছিল তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অশোভন দ্রুততার সংগে অন্য তিন জন মন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করা, যাঁহারা পদত্যাগ করিতে চান নাই তাঁহাদের বরখাস্ত করা, অবিলম্বে ড. খারেকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহবান করা এবং যাঁহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল তাঁহাদিগকে লইয়া নূতন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ করানো তাঁহার উচিত হয় নাই।"

ওয়ার্কিং কমিটি ২৭ তারিখে ওয়ার্ধায় আহূত দলীয় সভার জন্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল 'ওয়ার্কিং কমিটির উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশ আইন-সভার কংগ্রেস দলের আহূত সভা প্রসংগে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন. ১৯৩৮-এর ২৬ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রীসভার সংকট সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব সভাকে জানাইবেন এবং সভার কার্য পরিচালনা করিবেন। অধিকন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে ওয়ার্ধার নব ভারত বিদ্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হউক।'

নির্দেশিত ভাবে ২৭ জুলাই সকাল ৯টায় আমার সভাপতিত্বে কাহারো অনুপস্থিতি ব্যতীত আইনসভা দলের অধিবেশন হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আইন-সভা দলের সদস্যগণ, সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির (মহা-কোশল, নাগপুর ও বিদর্ভ) তিন জন সভাপতি (ইঁহারা আইন-সভা দলেরও সদস্য) এবং কেন্দ্রীয় আইন-সভার দুই জন সদস্য। ভোটের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র আইন-সভা দলের সদস্যগণই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছু লোক সভায় সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে আপত্তি তুলিয়াছেন। এরূপ আপত্তি শিশুসুলভ। তাঁহারা এইরূপ অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকার অধিকারী এবং তাঁহাদের অধিকার ছাড়াও সভার সভাপতি যখন তাঁহাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন নাই, তখন এ ব্যাপারে আপত্তি

তোলা চলে না। কেহ যদি মনে করেন তাঁহাদের উপস্থিতি ভোটের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের আইন-সভার সদস্যগণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিশ্চয়ই দীন।

আমার ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাঠের মধ্য দিয়া কার্যক্রম আরম্ভ হইয়াছিল। আমি তখন দলের নেতৃত্ব হইতে ড.খারের পদত্যাগ সভার কাছে পেশ করিয়াছিলাম এবং ইহা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। পরে আমি সদস্যগণকে তাঁহাদের নূতন নেতা নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম। একজন সদস্য ড.খারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম প্রস্তাব করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে তখন সভাপতির নির্দেশ দাবি করা হইয়াছিল। আমি তখন বলিয়াছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সভার সম্মুখে আছে এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ড. খারের নাম প্রস্তাব করা হয় আমি তাহাতে বাধা দিব না ও এ ব্যাপারে ভোট গ্রহণের অনুমতি দিব। আমার এই নির্দেশের পর ডক্টরের নাম প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

দলের সভায় অন্যান্য যাঁহাদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাঁহারা হইলেন শ্রীযাজুজি, শ্রীরবিশংকর শুক্ল, শ্রীগুপ্ত, শ্রীখান্দেকর, শ্রীমেহতা এবং রমারাও দেশমুখ। আমার এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে সভা চলা কালে চার ঘণ্টার জন্য কাজ স্থগিত রাখার একটি প্রস্তাব আনা হইয়াছিল কিন্তু তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে 'পরাজিত হইয়াছিল। এই মর্মে অপর একটি প্রস্তাব আসিয়াছিল যে দলের আস্থা উপভোগ করে বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটির উচিত নেতাকে মনোনীত করা। একজন সদস্য এই মর্মে একটি সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে দলের উচিত তিন কিংবা চার জনের নাম নির্বাচিত করা এবং ওয়ার্কিং কমিটির সেই তালিকা হইতে একজনকে নেতা মনোনীত করা উচিত। ইহার পর ওয়ার্কিং কমিটির তরফে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে কমিটি নেতা মনোনয়নে কিংবা এমন-কি এ সম্বন্ধে কোনো অভিমত প্রকাশ করিতে কিংবা কাহারো জন্য উমেদারি করিতে প্রস্তুত নয়। ওয়ার্কিং কমিটি এইভাবে গোটা জিনিসটি পুরাপুরি দলের পছন্দের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল। শ্রীকালাপ্পা কর্তৃক এই মর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে মন্ত্রীদের দুইটি গোষ্ঠীর মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁহাদের বিভেদের দরুন মন্ত্রীসভায় সংকট সৃষ্টি হইয়াছিল সেই ছয় জন ব্যক্তির কাহাকেও দলনেতা নিযুক্ত করা হইবে না। প্রস্তাবটির পক্ষে ২৫টি ভোট ও বিপক্ষে ৪২টি ভোট পড়ায় ইহা নাকচ হইয়া গিয়াছিল।

যে-সব নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে যজুজীর সম্মতি নেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। শ্রীগুপ্ত, শ্রীখান্দেকর ও শ্রীমেহতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং মাত্র দুই জন প্রার্থী অবশিষ্ট ছিলেন— শ্রীশুক্ল ও শ্রীদেশমুখ। ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং প্রথম ব্যক্তি পাইয়াছিলেন ৪৭টি ভোট, দ্বিতীয় ব্যক্তি পাইয়াছিলেন ১২টি ভোট আর ১৩ জন সদস্য নিরপেক্ষ ছিলেন। অতএব শ্রীশুক্লকে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার আইন-সভার কংগ্রেস দলের বৈধভাবে নির্বাচিত নেতা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল।

শ্রীরবিশঙ্কর শুক্ল নেতা নির্বাচিত হইবার পর তিনি সংসদীয় সাব-কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

১৯৩৮-এর ২৯ জুলাই নূতন মন্ত্রীগণ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঘটনাগুলি যেভাবে ঘটিয়াছে আমি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এখন ড. খারে যে-সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহার কয়েকটি লইয়া আমার আলোচনা করা উচিত। কিন্তু তাহা করার পূর্বে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে যে-সব যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক ত্রুটি আমি প্রমাণিত করিব।

তিনি বলিয়াছেন যে তিনি সংসদীয় নজির ও গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিংবা তাহার কয়েকজন সদস্য তাঁহার বৈধ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঘটনা এই যে ভারতের সমস্ত আইন-সভার কংগ্রেস সদস্যগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রার্থীপদ অনুমোদিত হইয়াছিল নিখিল ভারত সংসদীয় সাব-কমিটি কর্তৃক। তাঁহাদিগকে কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে গ্রহণ করার পূর্বে তাঁহারা কংগ্রেসের শপথ বাক্যে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অন্যান্য ধারার মধ্যে নিম্নোক্ত ধারাগুলি ছিল :

ঙ. আমি আরো ঘোষণা করি যে কংগ্রেস কর্তৃক কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ ও অর্থনীতি আমি অনুসরণ করিব এবং মাঝে মাঝে যথাবিহিতভাবে প্রদত্ত নিয়ম ও নির্দেশ ও আইন-সভার সদস্যদের জন্য আইন-সভার দলীয় সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মানিয়া চলিব।

চ. যখনই কোনো যথোপযুক্ত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ চাহিবেন তখনই আমি আসন ত্যাগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিব।

এইরূপ যে শপথে প্রতিটি কংগ্রেসপ্রার্থী দায়িত্ব সহকারে নিজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহার আলোকে বিচার করিলে কংগ্রেসী আইন-সভা সদস্যদের আনুগত্য কাহার প্রতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। নির্বাচনের পরে ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে দিল্লীতে সর্বভারতীয় সম্মেলনে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন কংগ্রেসের আইন-সভার সদস্যগণকে আনুগত্যের শপথ পাঠ করাইয়াছিলেন তখন এই আনুগত্য পুনর্স্থাপন করা হইয়াছিল।

ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে যখন আইন-সভার কংগ্রেস সদস্যগণ মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী হন, তখন কংগ্রেসসেবী হিসাবে তাঁহাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মন্ত্রী হিসাবে তাঁহাদের আচার-আচরণের জন্য তাঁহারা যে মহান সংগঠনের সদস্য তাহার কাছে দায়ী থাকেন। সুতরাং সেই সংগঠনের উর্ধ্বতম কর্মপরিষদ ওয়ার্কিং কমিটি ও সাব-কমিটির (কিংবা সাব-কমিটিগুলির) কাছে তাঁহাদের জবাবদিহি করিতে হয়। মন্ত্রীই হউন কিংবা প্রধানমন্ত্রীই হউন তিনি সংসদীয় নজির ও গণতন্ত্রের অজুহাতে কংগ্রেস ও তাহার কার্যপরিষদের নিকট আনুগত্য হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।

মন্ত্রীগণ ও প্রধান মন্ত্রীগণ কাহার কাছে দায়ী এই প্রশ্নটি ড. খারের সমর্থকগণ গুলাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আলোকসম্পাতকারী বিবৃতির উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া বেশি কিছু করিতে পারি না।—

"তাঁহাদের দায়িত্ব হইল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে, আইন-সভায় তাঁহাদের দলের কাছে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তাহার কর্মপরিষদের কাছে, ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে। এমন-কি, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিও মনে করে যে প্রাদেশিক সরকারের কাজে তাহাদের বক্তব্য আছে। এই সমস্ত শুনিতে জটিল ও বিভ্রান্তিকর মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তাহা নয়। নির্বাচক-মণ্ডলীর দায়িত্ব কি? সেই নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেস প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণের জন্য তাঁহাদের সমর্থন করেন নাই, তাঁহারা প্রতিনিধি ছিলেন কংগ্রেস ও তাহার কর্মসূচীর। ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার আর-কিছু নাই। ভোট ছিল কংগ্রেসের জন্য। আজিকার আইন-সভার প্রতিটি কংগ্রেস সদস্য যদি আদর্শচ্যুত হইয়া কংগ্রেসের বিরোধী হিসাবে আবার নির্বাচনের সম্মুখীন হইবার মতো অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন তাহা হইলে কংগ্রেস প্রার্থী যিনিই হউন-না-কেন তাঁহার

হাতে তাঁহার পরাজয় হইবে। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের প্রতি নির্বাচকমণ্ডলী আনুগত্য দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসই নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী। পালাক্রমে মন্ত্রীগণ ও আইন-সভার কংগ্রেস দলগুলি কংগ্রেসের কাছে দায়ী এবং তাহার মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী।

"কংগ্রেস যদিও বহু কমিটির মাধ্যমে কাজ করে তবু ইহা মূলত এক এবং ইহার বুনিয়াদী কর্মনীতি এক। এইভাবে কংগ্রেস মন্ত্রীগণ কিংবা আইন-সভায় কংগ্রেস দলের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী আনুগত্যের প্রশ্ন ওঠে না। সেই বুনিয়াদী কর্মনীতি বার্ষিক অধিবেশনে স্থির করা হয় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ইহা ব্যাখ্যা ও কার্যে রূপায়িত হয়। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটি এই কর্মনীতি রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত।"

আমি এখন একদিকে কংগ্রেস আইন-সভা দল ও কংগ্রেস মন্ত্রীদের এবং অপরদিকে কংগ্রেস ও তাহার অংগগুলির সম্পর্কের প্রশ্ন আলোচনা করিব। কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী যাহাতে সমগ্র দেশে কংগ্রেস আইন-সভা দলগুলি ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কর্তৃক রূপায়িত হয় এবং কংগ্রেস সংগঠনের ঐক্য, বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মতো কোনো কিছু যাহাতে করা না হয় তাহা দেখার জন্য আছে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অংগগুলি যেমন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও তাহার কর্মপরিষদ, ওয়ার্কিং কমিটি ও তাহার সাব-কমিটিগুলি। কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী নির্বাচনী ইস্তাহারে এবং পরে কংগ্রেস, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে নির্ধারিত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে বলিয়া আইন-সভার দলগুলি ও মন্ত্রীসভাগুলিকে সাহায্য করা, পরামর্শ দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পড়ে ওয়ার্কিং কমিটি ও তাহার মনোনীত সাব-কমিটিগুলির উপর। এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কিত কিংবা ইহার ঐক্য, বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা সম্পর্কিত যে-কোনো প্রশ্নে যে-কোনো সময়ে কিংবা যে-কোনো স্তরে ওয়ার্কিং কমিটি ও তাহার যথোচিত সাব-কমিটিগুলি কংগ্রেস আইন-সভা দলগুলির কিংবা মন্ত্রীসভাগুলির কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যেখানে একদিকে ব্রিটিশ সরকার কিংবা গভর্নর এবং অন্যদিকে মন্ত্রীসভাগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে সেখানে শেষোক্তদের ক্ষেত্রে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার এবং নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটির ও তাহার যথোচিত সাবকমিটিগুলির আরো বেশি বাড়িয়া যায়। যুক্তপ্রদেশ

ও বিহারে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে, এবং উড়িষ্যায় অস্থায়ী গভর্নর পদের প্রশ্নে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল।

কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য এবং কংগ্রেস সংগঠনের ঐক্য, বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও ইহার সাব-কমিটির (কিংবা সাব-কমিটিগুলির) উপর যে দায়িত্ব আসিয়া পড়ে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদিগকে দ্বিবিধ কাজ করিতে হয়। ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রদেশে আইন-সভা দলগুলি ও মন্ত্রীসভাগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করিতে হয় এবং দল ও মন্ত্রীসভা যাহাতে প্রতি প্রদেশে যথোচিতভাবে কাজ করে তাহা দেখিতে হয়। যদি কংগ্রেস আইন-সভা দলে কিংবা কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় কোনো প্রকার দলাদলি, মতবিরোধ কিংবা বিচ্ছেদ-প্রবণতা দেখা দেয় তাহা হইলে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ইহা মনে করা ভ্রান্ত হইবে যে একমাত্র নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্নে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সীমিত থাকা উচিত। কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সুশৃংখলাবদ্ধ কংগ্রেস-দলের অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হয় এবং ইহা প্রয়োজনীয়। সুতরাং প্রতিটি আইন-সভা দলে ও প্রতিটি মন্ত্রীসভায় ঐক্য, বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা যাহাতে রক্ষা হয় তাহা দেখা কংগ্রেস ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যখন ব্যক্তিগত মত-ভেদ কিংবা আন্তঃপ্রাদেশিক বিরোধ দেখা দেয়, তখন একমাত্র কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বন্ধুত্ব ও ঐক্যের সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের মতো মিশ্র-প্রদেশে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব খুব বেশি। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে বিহারে যখন বিহারী-বাঙালী বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছিল তখন বিহার মন্ত্রীসভা কিংবা বিহার আইন-সভা দল এ বিষয়ে হাত দিবার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটি সরাসরি ইহা হাতে লইয়াছিল। কংগ্রেসের ঐক্য, বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা সংরক্ষণ এবং শৃংখলা আরোপ কিংবা কংগ্রেস সংগঠনে বন্ধুত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রায়ই দেশের বিভিন্ন অংশে মধ্যস্থ হিসাবে কিংবা পরিদর্শক হিসাবে কিংবা এমন-কি যে সভায় কোনো গুরুতর মত-ভেদ কিংবা বিরোধ থাকে সে সভার সভাপতি হিসাবে নিজের প্রতিনিধি পাঠাইতে হয়। মধ্যপ্রদেশ আইন-সভা দলের পাঁচমারিতে ২৪ মের সভায় এবং ওয়ার্ধায় ২৭ জুলাই-এর সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, কেননা সে ক্ষেত্রে গুরুতর মতভেদ সংশ্লিষ্ট ছিল। পরবর্তী সভার ক্ষেত্রে বাহিরের একজন সভাপতির প্রয়োজন আরো বেশি ছিল এই কারণে

যে যিনি সাধারণত এইরূপ দলীয় সভায় সভাপতিত্ব করেন সেই দলনেতা পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমি সমগ্র দেশের কংগ্রেসসেবীদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। কোনো কোনো ব্রিটিশ মহলে এই প্রত্যাশা আছে যে ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু হইবার পর আমাদের আন্দোলন স্থায়ীভাবে সাংবিধানিক দিকে চলিয়া যাইবে, আন্তঃপ্রাদেশিক বিরোধ দেখা দিবে এবং মধ্য-প্রদেশ কিংবা বোম্বাই কিংবা মাদ্রাজের মতো মিশ্র-প্রদেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিবে। সন্দেহ নাই যে মিশ্র-প্রদেশগুলিতে এই বিপদের সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং আমরা যাহাতে, ভারতীয়ই হউক কিংবা ব্রিটিশই হউক, আমাদের শত্রুদের হাতে খেলার পুতুল না হই সেজন্য আমাদের পক্ষে আরো বেশি সতর্ক প্রহরার প্রয়োজন হইবে। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রদেশের সংকট বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ড. খারে জ্ঞাতসারেই হউক কিংবা অজ্ঞাতসারেই হউক গভর্নরের হাতে খেলিয়াছিলেন আর গভর্নর তাঁহার দিক হইতে পূর্বতন কংগ্রেস মন্ত্রীসভার মতভেদ কাজে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

ড. খারে দাবি করিতেছেন যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটি কিংবা সংসদীয় সাব-কমিটির কাছে কোনো প্রকার উল্লেখ না করিয়া পদত্যাগ করিবার এবং মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করিবার স্বাধীনতা তাঁহার আছে। এই ধরণের দাবি ১৯৩৭-এর জুলাই ও ১৯৩৮-এর জুলাই-এর মধ্যে তাঁহার আচার-আচরণের স্বারা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এই সময়-সীমার মধ্যে তিনি যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ও সামান্য প্রশ্ন সংসদীয় সাব-কমিটির কাছে উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে আমি পরে উল্লেখ করিব। এই আলোকে তিনি ২০ ও ২১ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি কিংবা সংসদীয় সাব-কমিটিকে কিছু না জানাইয়া পদত্যাগ ও মন্ত্রীসভা পুনর্গঠনের মতো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যার অতীত ও যুক্তির অতীত বলিয়া মনে হয়।

ড. খারের অন্য দাবি যে মন্ত্রীসভার সদস্য নির্বাচনে তাঁহার স্বাধীনতার অধিকার আছে— তাহাও ভিত্তিহীন। আমি অতঃপর দেখাইব যে ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে তিনি যখন প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কোনো কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীই সংসদীয় সাব-কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করেন নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সংসদীয় সাব-কমিটি ও তাহার

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওয়ার্কিং কমিটির এবং অতীতে তাহারা সে অধিকার প্রয়োগ করিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই যে যখন মন্ত্রীসভায় মতবিরোধ দেখা গিয়াছিল ড. খারে কংগ্রেসের কাছে তাঁহার দায়িত্ব ভুলিয়া এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে কোনো কিছু না জানাইয়া তাঁহার কয়েকজন সহযোগীকে অপসারণের জন্য ও পরে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য গভর্নরের শক্তি ও সহায়তার সুযোগ লইয়াছিলেন। তাঁহার দোষের কারণ হইয়াছিল এই যে তিনি শুধু কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নষ্ট করেন নাই, তাহা করিতে তিনি গভর্নরের সাহায্যও লইয়াছিলেন এবং তিনি এখন সংসদীয় নজির ও গণতন্ত্রের অজুহাতে নিজেকে যুক্তিসংগত বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিতেছেন। উল্লিখিত যুক্তিগুলি ছাড়াও ড. খারে বর্তমানে যে মনোভাব লইয়াছেন তাহার তীব্রতম সমালোচনা হিসাবে ১৯৩৭-এর মার্চ মাস ও ১৯৩৮-এর জুলাই মাসের মধ্যে তাঁহার আচরণ সহ নীচের ঘটনাগুলি আছে।

ক. ১৯৩৭-এর ৩ এপ্রিল সর্দার প্যাটেল ড. খারেকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন : 'প্রয়োজন হইলে যাহাতে আমি আপনাকে সহায়তার জন্য নির্দেশ দিতে পারি সেজন্য আপনার প্রদেশে যাহা ঘটে সে সম্বন্ধে আপনি আমাকে অবশ্য অবহিত রাখিবেন।'

খ. ১৯৩৭-এর ৭ এপ্রিল একটি প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ড. খারে সর্দার প্যাটেলকে লিখিয়াছিলেন : 'আপনি দয়া করিয়া আরো যে-সব নির্দেশ দিবেন সেগুলি বিশ্বস্ততার সহিত অনুসৃত হইবে— এ আশ্বাস আপনাকে আমি দিতেছি। এক ছত্র উত্তর পাইলে শুধু বিশেষ বাধিত হইব না যাঁহারা অলস ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে সে উত্তর কর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে।'

গ. কিভাবে ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল ড. খারে সম্ভবত তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। বোম্বাই হইতে ১০ জুলাই তারিখের ১৫৬ নং পত্রে সর্দার প্যাটেল তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :

'এখানে আসার পর প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিবরণ হইতে আমি জানিলাম যে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করায় গভর্নর আপনাকে শীঘ্র মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাইবেন। আপনি ৭ তারিখ ওয়ার্ধায় আপনার প্রদেশের মন্ত্রীসভা গঠন সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু

আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য না থাকায় আলোচনা অসমাপ্ত ছিল। এখন যখন সময় নিকটে আসিয়াছে আপনি আপনার সহযোগীদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করিবেন এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণের চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র বোম্বাইতে আসিবেন। আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অস্থায়ী প্রস্তাব রচনা করিয়া আমাকে তারযোগে তাহা জানাইবেন।'

ঘ. ১৯৩৭-এর ২১ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. খারে নাগপুর হইতে সর্দার প্যাটেলকে নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছিলেন :

'আপনি আমাকে কেন্দ্রের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে পত্র দিয়াছেন সেজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আপনার উপদেশ চাই।

১. মন্ত্রীগণের বাড়ি ও গাড়ি ভাতা ;
২. আইন-সভা সদস্যগণের ভাতা ;
৩. পার্লামেন্টারি সচিব নিয়োগের প্রশ্ন :
৪. স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন।'

ঙ. ৩০ জুলাই, ১৯৩৭ তারিখের ১৯০ নং পত্রে সর্দার প্যাটেল ড. খারেকে নিম্নরূপ লিখিয়াছিলেন :

'আপনি গান্ধীজীর সহিত পরামর্শক্রমে যে খসড়া নির্দেশাবলী তৈয়ারি করিয়াছি তাহার একটি অনুলিপি এইসঙ্গে পাঠাইতেছি। এগুলি আমাদের সভাপতির অনুমোদনসাপেক্ষ। কিন্তু আপনার পথনির্দেশের জন্য এগুলি আপনাকে অগ্রিম পাঠানো হইল এবং আমি আমাদের সভাপতির অনুমোদন পাইবার পর চূড়ান্ত নির্দেশাবলী আপনাকে পাঠানো হইবে।'

চ. যখন ড. খারে কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতাদির দরুন আইন-সভার একজন হরিজন সদস্য শ্রীঅগ্নিভোজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি ১৯৩৭ সালের ২২ নভেম্বর সর্দার প্যাটেলের নির্দেশ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। (ঐ একই শ্রীঅগ্নিভোজ ডক্টরের নূতন ও স্বল্পস্থায়ী মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ছিলেন)।

ছ. শরীফের ব্যাপারে গভর্নর জাওয়ার হুসেনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও এবং মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেস আইন-সভাদল কর্তৃক শ্রীশরীফকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটি অন্যরকম অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীশরীফকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি তাহা করিয়াছিলেন,

তখন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী তো ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবেন নাই।

জ. ৮ মে ১৯৩৮ যখন তাঁহার চারজন সহকর্মী (শ্রীগোলে, শ্রীশুক্ল, শ্রীমিশ্র এবং শ্রীমেহতা) ড. খারের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া সংসদীয় সাব-কমিটিকে বিষয়টি বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যখন বিষয়টি বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে পেশ করা হইয়াছিল তখন বিষয়টি কংগ্রেস আইন-সভা দলের কাছে উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। যখন বিষয়টি এইভাবে কংগ্রেস আইন-সভা দলের কাছে উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তখন ড. খারে শ্রীগোলে, ও শ্রীদেশমুখ এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কেননা তাঁহারা চাহিয়াছিলেন ওয়ার্কিং কমিটিই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। বস্তুত শ্রীগোলে পাচমারি হইতে ১৭ মে সর্দার প্যাটেলকে নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছিলেন :

'যদিও মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রীসভা সম্পর্কে যে আলোচনা ওয়ার্কিং কমিটিতে হইতেছিল তাহাতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা আমার ছিল না আমার ইহা আপনাকে জানানো আবশ্যক যে গতকাল ওয়ার্কিং কমিটি দলীয় সভায় মীমাংসার জন্য বিষয়টি রাখিয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত লইয়াছিল তাহাতে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মন্ত্রীগণ স্বেচ্ছায় ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নিজেদের মতভেদের প্রশ্নটি পেশ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন এবং ইহার অর্থ এই যে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত যাহাই হউক-না-কেন তাহা মানিতে তাঁহারা বাধ্য ছিলেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনিয়া ওয়ার্কিং কমিটি কোনো অভিমত দানের বদলে বিষয়টিকে ধামাচাপা দিয়াছিল এবং এই পর্যায়ে কী করা উচিত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছিল দলের হাতে। মন্ত্রীগণের গুণাগুণের আলোচনা দলীয় সভায় হইবে, ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহা চাই না। যদি ইহা কার্যকর হয়, তাহা হইলে এখন হইতে দলের কাছে যে-কোনো মন্ত্রীর অবস্থা পুরা-পুরি হাস্যকর হইয়া উঠিবে। গত দশ মাস ধরিয়া যদিও দলীয় সদস্যগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী অনেক কিছু করার জন্য মন্ত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তবু মন্ত্রীগণ ওয়ার্কিং কমিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিতেন যে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি ব্যতীত কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহারা কিছু করিতে অক্ষম। ওয়ার্কিং কমিটির গতকল্যের সিদ্ধান্তের ফল এই হইবে যে অতঃপর কংগ্রেস দলের সদস্যগণ তাঁহাদের ইচ্ছা মন্ত্রীগণ কর্তৃক

পালিত হওয়া সম্বন্ধে জিদ করিবেন এবং মন্ত্রীগণের অবস্থা হইবে সম্পূর্ণ শোচনীয়।

আমি গতকাল ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে এই-সব কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু যেহেতু আমি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা পছন্দ করি নাই আমি চুপ করিয়া ছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে আমার কোনো সহকর্মী ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি তুলিয়া ধরিবেন। কিন্তু যেহেতু কেহ তাহা করেন নাই, সেইজন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপ অর্থাৎ দলীয় সভা ডাকিয়া মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত আপনার কাছে পেশ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। যদি ওয়ার্কিং কমিটি, যে-দিকেই হউক, কোনো সিদ্ধান্ত দিত তাহা হইলে মন্ত্রীদের মর্যাদা সংরক্ষিত হইত। ইহাতে ঊর্ধ্বতন সংস্থা হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটির মর্যাদাও সংরক্ষিত হইত। গতকল্যকার সিদ্ধান্তের অর্থ এইরূপ বলিয়া মনে হইবে যে ওয়ার্কিং কমিটি নিজের ঊর্ধ্বতন ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছে এবং নিজেকে আইন-সভায় কংগ্রেস দলের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ইহাতে মন্ত্রীদের অতঃপর আত্মরক্ষার আর কোনো সুযোগ থাকিল না।'

ঝ. ডক্টর তাঁহার একজন সহকর্মী শ্রীমিশ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নিজে তাহা না করিয়া ১৯৩৮-এর ৯ জুলাই সর্দার প্যাটেলকে পত্র লিখিয়া তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশ চাহিয়াছিলেন। পরবর্তী দশ দিনে এমন কী ঘটিয়াছিল যাহাতে তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য।

১৫ জুলাই নাগপুর হইতে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলকে নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছিলেন: 'বর্তমান অবস্থায় দপ্তরগুলির পুনর্বণ্টন আপনার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। যেহেতু কতকগুলি বিষয়ে আমার সুনিশ্চিত মতামত আছে এবং সেগুলি সাধারণভাবে মন্ত্রীসভার এবং বিশেষভাবে ইহার প্রধানমন্ত্রীর মসৃণ কার্যপরিচালনা ব্যাহত করিতে পারে, সেইজন্য আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাকে অনুরোধ করি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সেগুলি আপনার সম্মুখে পেশ করার একটা সুযোগ আমাকে দেওয়া উচিত।' তিনি এই কথা বলিয়া পত্র শেষ করিয়াছিলেন: 'যেমন যেমন ঘটনা ঘটে সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে মাঝে মাঝে অবহিত রাখিব।' ইহার ছয় দিন পরে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু পদত্যাগ না করা পর্যন্ত সর্দারকে কিছু জানাইবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই।

আবার ১৫ জুলাই তারিখে নাগপুর হইতে ড. খারে সর্দারকে নিম্নরূপ লিখিয়াছিলেন : 'আমার সহকর্মী শ্রীমিশ্রের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করিবার অভিপ্রায় আছে এবং তাহাও যে-সব ঘটনা তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য পেশ করার কোনো সুযোগ না দিয়া আমার পত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা আপনি করিয়াছেন জানিয়া আমি দুঃখিত। আপনি অনুমতি না দিলে ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে শ্রীমিশ্রকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো অভিপ্রায় আমার নাই। গত মে মাসের গণ্ডগোলের পর যে-সব বিষয় আমার গোচরীভূত হইতেছে সে সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত রাখা আমি ভালো বলিয়া মনে করিয়াছি এবং আপনি যাহা সমীচীন মনে করেন সেরূপ নির্দেশ দানের দায়িত্ব আপনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছি।'

২০ জুলাই-এর সংকটের পর ড. খারে ২৫ জুলাই একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল : 'আমি ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে কংগ্রেস ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি সিদ্ধান্ত নেন যে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সকলেরই বিদায় নেওয়া উচিত এবং নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য নূতন ছয়জন কংগ্রেসী আইন-সভা সদস্য নির্বাচন করা উচিত, তাহা হইলে আমি সে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে ইচ্ছুক।' (মনে হয় যে ড. খারের বক্তব্য এই যে পুরাতন মন্ত্রীসভার তিনজন মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মোট ছয়-জনকে অপসারিত করা হইলেও তাঁহার আপত্তি থাকিবে না।)

উল্লিখিত ঘটনাবলী ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনজন মন্ত্রীর পদচ্যুতি একটা প্রথামাফিক বিষয় এবং তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও সংসদীয় সাব-কমিটিকে না জানাইয়া ইহা করিতে পারেন— ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর এই যুক্তি অর্থহীন। এই অজুহাত স্পষ্টত পশ্চাত-চিন্তার ফসল এবং ইহা কাহাকেও প্রতারণা করিতে পারিবে না। অন্য যে-কোনো কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী যেমন জানেন তেমনই ড. খারেও জানেন যে ওয়ার্কিং কমিটিকে ও সংসদীয় সাব-কমিটিকে না জানাইয়া কোনো কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী গভর্নরের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করিতে পারেন না। ডক্টর ১৩ জুলাই সর্দার প্যাটেলের যে পত্রের জবাব দিয়াছিলেন সেই ১১ জুলাই-এর ৩৫১ নং পত্রে সর্দার প্যাটেল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : 'আপনি শ্রীমিশ্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির কথা লিখিতভাবে জানাইয়া সরাসরি তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিবেন ইহা জানিয়া আমি বিস্মিত। এরূপ না করা এবং এইভাবে অবিবেচনাপ্রসূত গুরুতর কাজের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার

সদুপদেশ আপনার বন্ধুরা আপনাকে দিয়াছেন। আপনি জানেন যে ২৩ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ওয়ার্ধায় বসিতেছে। পাঁচমারি আপসের পর হইতে ঘটনাবলীর যে বিবর্তন হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে অবহিত রাখিতেছি এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা আপনি ওয়ার্কিং কমিটির বিচারের উপর ছাড়িয়া দিন।'

এইভাবে সহকর্মীদের পদত্যাগে বাধ্য না করার সুস্পষ্ট নির্দেশ ড. খারে সংসদীয় সাব-কমিটির সভাপতির নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

১৭ জুলাই সেই সময় জয়পুরের শিকারে অবস্থানরত শেঠ যমুনালাল বাজাজ নীচের টেলিগ্রামটি ড. খারেকে পাঠাইয়াছিলেন : 'ড. খারে, প্রধানমন্ত্রী, নাগপুর — আপনার ১৬ তারিখের টেলিগ্রাম। সংকট সংবাদে গভীর উদ্বিগ্ন। সংকট আমার সেখানে উপস্থিতি অত্যাবশ্যক জানিয়াও শিকারে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির দরুন এখানে থাকিতে বাধ্য। মৌলানা, বল্লভভাই ও রাজেন্দ্রবাবুর উপদেশে কাজ করুন— ইহাই দৃঢ় পরামর্শ— যমুনালাল।'

ড. খারে সর্দার প্যাটেলকে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সর্দার ১৯৩৭-এর ১৬ জুলাই তাঁহাকে যে পত্র (পত্র নং ১৬৮) লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :

'আমি মন্ত্রীসভা নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার তারবার্তা পাইয়াছি। আপনি শুভভাবে কাজের সূচনা করিয়াছেন জানিয়া আমি আনন্দিত এবং আমরা আশা করি যে দেশে, বিশেষ করিয়া আপনাদের প্রদেশে আপনার মন্ত্রীসভা সাদরে গৃহীত হইয়াছে। আমি আশা করি যে এই মহান পরীক্ষায় আপনি যে সর্বপ্রকার সহযোগিতা পাইবার উপযুক্ত তাহা জনগণের সকল অংশের নিকট হইতে আপনি পাইবেন ; আমাদের সকল শুভেচ্ছা অবশ্য আপনার প্রতি আছে এবং আপনি কেন্দ্রের নিকট হইতে পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি পাইবেন।'

ইহা ছাড়া, পাঁচমারি আপসের সকল শর্ত পূরণ করিয়া ড. খারে যাহাতে রক্ষা পান সেজন্য সর্দার আপ্রাণ প্রয়াস করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি মন্ত্রী দেশমুখ ও শ্রীঅ্যানের সহায়তা লইয়াছিলেন এবং ইঁহারা দুইজন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, সর্দার প্যাটেল ও ড. খারের মধ্যে পত্রবিনিময় হইতে উপরে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহাদের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ছাড়া অন্যরকম ছিল না।

ড. খারে ১৪ জুলাই তাঁহাকে লিখিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্র

হইতে একটি ছোটো উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ডক্টর ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে ইহাতে প্রদেশটিকে অকংগ্রেসী প্রদেশরূপে ঘোষণা করার ইঙ্গিত ছিল, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত। এই ইঙ্গিত তাঁহাকে নাকি এরূপ ভীত করিয়া তুলিয়াছিল যে তিনি প্রদেশে রাজনৈতিক সংকট ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। ইহা ঘোষণা করা ডক্টরের পক্ষে পশ্চাত-চিন্তার ফসল। যাহা হউক, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার যাহাতে অকংগ্রেসী প্রদেশ না হয় সে বিষয়ে কংগ্রেস একমাত্র ড. খারেই আগ্রহী ছিলেন না। ড. খারে আমাদিগকে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন মৌলানার গোটা পত্রটি পড়িলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব সৃষ্টি হয়। ইহা লক্ষ করা উচিত যে ড. খারের ৯ জুলাই-এর যে পত্রে শ্রীমিশ্রের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ ছিল তাহার জবাবে মৌলানা পত্র লিখিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেবের পত্রটি নিম্নোক্ত-রূপ :

'আপনার ৯ জুলাই-এর পত্র হাতে পৌঁছাইয়াছে। আপনি শ্রীমিশ্রের সম্বন্ধে দুইটি বিষয় লিখিয়াছেন যাহা আমার মতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগের সামিল নয়। নিশ্চয়ই সেগুলির জন্য তাঁহার জবাবদিহি প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনার কর্তব্য হইল আপনার সহকর্মীগণের আপত্তিজনক কাজ লক্ষ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় পরিষ্কার করিয়া লওয়া। যদি পরিষ্কার হইয়া যায় তবে তাহাই সর্বাধিক উত্তম ; অন্যথায় আপনার উচিত তাঁহাদিগকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝানো কিংবা প্রয়োজন হইলে আপনি ইহা সংসদীয় সাব-কমিটির নজরে আনিতে পারেন। অবশ্য আপনার ও আপনার সহকর্মীগণের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা থাকা উচিত নয় এবং আপনাদের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল-বুঝাবুঝি কিংবা সন্দেহ আসা উচিত নয়। এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা চলিতে থাকিলে অচল অবস্থা ছাড়া আর-কিছু সৃষ্টি হইবে না।

'আমরা পাঁচমারিতে আপনাদের মধ্যে ঐক্য ও আস্থার ভাব সৃষ্টির জন্য চূড়ান্ত প্রয়াস করিয়াছিলাম। যদি পুরাতন অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে তাহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে চিরদিনের জন্য মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভার অবসান ঘটানো, কেননা আমার মনে হয় যে প্রদেশের সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস সেখানে তাহার মন্ত্রীসভা রাখিবে না। আমি আপনাকে অতীত ভুলিয়া যাইতে ও অতীতের একটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিতে এবং পাঁচমারির সিদ্ধান্ত অনুসারে পারস্পরিক অবস্থার মনোভাব লইয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। আপনি খোলা মনে আপনার সহকর্মীগণের

সহিত কাজ করিতে চান না এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে এ ধরনের কোনো অভিযোগের সুযোগ আপনার দেওয়া উচিত নয়।

'আপনার সহকর্মীগণও যদি অনুরূপ মনোভাব লইয়া কাজ করেন তাহা হইলে কোনো ভুল-বুঝাবুঝি সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের যদি ত্রুটি হয় তবে তাঁহারা সেজন্য দায়ী হইবেন এবং আপনি যদি তাঁহাদের সহিত কাজ না করিতে ও তাঁহাদের স্থলে অন্যদের লইতে চান সে ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে আপনার অবস্থা জোরদার হইবে।'

"আমার কৈফিয়তে" ২২ জুলাই-এর সভার কথা উল্লেখ করিয়া ড. খারে বলিয়াছেন যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহাকে এই আশা দিয়াছিলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে গোটা বিষয়টি গুণাগুণের ভিত্তিতে বিবেচনা করার পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তিনি আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাইতে চান যে তিনি ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হইবে। মৌলানা এরূপ কোনো আশা বা ইঙ্গিতও দেন নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে উর্দুতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ ছিল যে ড. খারে আমাদের সম্মুখে একটি দেওয়াল তুলিয়াছেন। সেই দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে এবং পথ পরিষ্কার করিতে হইবে— হয় তাহা ওয়ার্কিং কমিটিই করুক কিংবা ডক্টর নিজেই করুন এবং তাঁহার মতে এই শেষোক্ত পন্থাটিই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ইহার নিগূঢ়ার্থ এই ছিল যে যদি ডক্টর নিজে পদত্যাগ না করেন, তবে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে সে কাজে বাধ্য করিবে।

এ পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলিতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে ড. খারেকে আমাদের উপদেশ অনুসারে চালিত করার জন্য আমাদের উদ্বেগের সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করা হইয়াছে। ২৩ জুলাই যখন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল, তখন ইহা প্রথম হইতে ড. খারের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাও অনুভূত হইয়াছিল যে গুণাগুণের ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য বিষয়টি যদি ওয়ার্কিং কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ডক্টরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল ডক্টরকে তাঁহার কার্যাবলী পুনর্বিবেচনা করিয়া নিজের বিচার নিজে করিতে প্ররোচিত করা। ইহা স্পষ্ট ছিল যে অন্যেরা তাঁহার কার্যাবলী যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তিনি সে দৃষ্টিতে সেগুলি দেখেন নাই। সুতরাং নিজের কাজ সম্বন্ধে তাঁহার মনে নিরাসক্ত ও বাস্তব বিবেচনা বুদ্ধি

সঞ্চারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। ২২ জুলাই-এর সভায় মনে হইয়াছিল যে তিনি হয়তো আমাদের উপদেশে সাড়া দিবেন। সেই মনোভাব লইয়া আমরা ২৩ ও ২৫ জুলাই-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আলোচনার জন্য সেবাগ্রাম পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শের সঙ্গে একমত হইয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি সেই অবস্থা হইতে সরিয়া দাঁড়ান এবং বলেন যে নাগপুরে বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করার জন্য তিনি সময় চান। সেবাগ্রাম হইতে ওয়ার্ধায় ফিরিবার সময় আমি গান্ধীজীর উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহার উপর চাপ দিয়াছিলাম। কেননা তাঁহাতে শুধু কংগ্রেসের নয়, তাঁহার সর্বোত্তম স্বার্থও সংরক্ষিত হইবে। পরে রাত্রে ড. খারের সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি তখন একা ছিলেন। তখনো আমি তাঁহাকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার অন্যান্য বন্ধুদের উপদেশে বিপথগামী না হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে এমন কথা বলিয়াও আশ্বস্ত করিয়াছিলাম যে তিনি যদি আমাদের উপদেশ অনুসরণ করেন, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাবে তাঁহার কাজের প্রশংসা করিয়া যথোচিত সাড়া দিবে। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া যদি অনুগত কংগ্রেসসেবী হিসাবে কাজ করিয়া চলেন তবে কিছুকাল পরে পুনরায় তাঁহার সম্মুখভাগে প্রত্যাবর্তন কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না। আমি এ আশ্বাস তাঁহাকে দিয়াছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো অভিপ্রায় নাই। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে তিনি ভয়ানক রকমের ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শাস্তি তাঁহাকে পাইতে হইবে এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া গোটা ব্যাপারটা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহা বুঝা যাইবে যে আমাদের পক্ষে সহজতম কাজ ছিল ওয়ার্কিং কমিটিতে গোটা বিষয়টি আইনের দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া ড. খারের সম্বন্ধে রায় দেওয়া। আমরা সেই অপ্রীতিকর পদক্ষেপ এড়াইতে উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং ডক্টর যদি শুধু আমাদের পরামর্শে সাড়া দিতেন তাহা হইলে আমরা তাহা এড়াইতেও পারিতাম। ২৫ জুলাই রাত্রে আমি তাঁহাকে যে বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলাম তিনি ইচ্ছা করিয়া তাহা বিকৃত করিয়াছেন ও তাহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখিয়া আমি বেদনাবোধ করিতেছি। তিনি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলে কী ঘটিতে পারিত? প্রতিটি কংগ্রেসসেবী এখনো তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন

এবং স্বাভাবিকভাবে বহু বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাওয়া হইত। ইহা বলার অর্থ কোনো টোপ ফেলা নয়, একটি বিশেষ পদক্ষেপের ফলাফল দেখানো মাত্র : এই সদিচ্ছাকে ভুল বুঝা মনের বিকৃত অবস্থার পরিচায়ক মাত্র।

ড. খারে নাগপুর-বিদর্ভ-মহাকোশল সংযুক্ত পর্ষদের কার্যকলাপকে অনেক বাড়াইয়া দেখান। তিনি অভিযোগ করেন যে ড. খারেকে প্রধানমন্ত্রী পদ হইতে সরানোর জন্য এই পর্ষদ গঠিত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার নাম দিয়াছেন 'নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ'। এই অভিযোগের আদৌ কোনো ভিত্তি নাই। ড. খারে নিজেই তাহার বিবৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন যে সংযুক্ত পর্ষদের ধারণাটা ছিল তাঁহার নিজস্ব। পাঁচমারি আপস-রফার বহুপূর্বে নাগপুর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তিনটি প্রদেশের একটি সংযুক্ত পর্ষদ গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। পর্ষদে প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব লইয়া তিনটি প্রদেশের মধ্যে মতভেদ দেখা গিয়াছিল। সুতরাং বিষয়টি বিলম্বিত হইয়াছিল। পাঁচমারিতে তিন প্রদেশের সভাপতিদের ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল এবং সেখানে প্রশ্নটি আলোচিত হইয়াছিল। তিনজন সভাপতি এবং প্রতিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে পর্ষদের উদ্দেশ্য হইবে কার্যপরিচালনায় মন্ত্রীসভাকে সাহায্য ও পরামর্শ দান এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীসভার কার্য সম্বন্ধে সংসদীয় সাব-কমিটিকে অবহিত রাখা। সংসদের গঠন ও উদ্দেশ্য পত্রিকাগুলিতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে তাহা জানানো হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও কিছু বন্ধু এবং কিছু পত্রিকা এই পর্ষদকে 'নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' আখ্যা দিয়াছিলেন এবং ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা আজাদ ও পর্ষদের সচিব শ্রীবিয়ানী বিবৃতি প্রচার করিরা জানাইয়াছিলেন যে পর্ষদটি ছিল উপদেশদানকারী এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নয়। খারে-বিতর্কে পর্ষদ আদৌ কোনো পক্ষাবলম্বন করে নাই। পাঁচমারি আপসের পর যখন এই পর্ষদে একজন সদস্য নির্বাচনের প্রশ্নটি নাগপুর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে ছিল তখন ড. খারে সে নির্বাচনে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'আমার কৈফিয়তে' ডক্টরের মন্তব্য হইতে মনে হইবে যে তিনি পর্ষদ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ২১ মে তিনি পর্ষদের অন্যতম সদস্য শেঠ যমুনালাল বাজাজকে এই তার পাঠাইয়াছিলেন :

"মন্ত্রীত্ব সংকটে আপনার সাহায্য' ও উপস্থিতি প্রার্থনীয়
—খারে।'

১৬ জুলাই তিনি আর-একজন সদস্য আকোলার শ্রীব্রিজলাল বিয়ানীকে নিম্নোক্তরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :

'আমি আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে দুর্ভাগ্যবশত দপ্তরগুলি পুনর্বন্টন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতৈক্য হয় নাই। আমি শুনিয়াছি যে আপনি গত পরশ্ব নাগপুরে ছিলেন। কিন্তু আমি আপনার সহিত দেখা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। আপনি যদি সংকট মোচনে কোনো সহায়তা করেন, তবে আমি আনন্দিত হইব।'

ড. খারে অনুযোগ করিয়াছেন যে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের হাতে বলপ্রয়োগের শিকার হইয়াছিলেন। তিনি ২৪ ও ২৫ মে পাঁচমারিতে শিকার হইয়াছিলেন, ২২ জুলাই ওয়ার্ধায় শিকার হইয়াছিলেন এবং ২৫ জুলাই সেবাগ্রামে শিকার হইয়াছিলেন। পাঁচমারিতে তাঁহাকে জোর করিয়া আপস-রফায় সম্মত করানো হইয়াছিল। ওয়ার্ধায় তাঁহাকে বলপ্রয়োগে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। সেবাগ্রামেও তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করা হইতেছিল —তবে তিনি পালাইয়া বাঁচিয়াছিলেন। বলপ্রয়োগের অজুহাত কিন্তু দ্বিমুখী অস্ত্র। ইহা কোনো কিছু উড়াইয়া দিবার জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু যিনি ইহার ধুয়া তোলেন তাঁহাকে ইহা দুর্বল-চরিত্র বলিয়াও প্রতিপন্ন করে। জনগণ ইহা কী করিয়া বিশ্বাস করিবেন যে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী যাহা করিতে চান নাই তাহা করিবার জন্য বারবার তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল? তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে তাঁহাকে পুরাপুরি অপদার্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে হয়।

ডক্টর বলিয়াছেন যে তাঁহার তিনজন সহকর্মীর (অর্থাৎ সর্বশ্রী শুক্ল, মিশ্র ও মেহতা) সহিত তাঁহার বনিবনা হইতেছিল না বলিয়া মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে তিনি ২০ জুলাই তাঁহার নূতন মন্ত্রীসভায় শ্রীমেহতাকে একটি পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিভাবে? কিভাবেই বা তিনি ২৫ জুলাই সংবাদপত্রের বিবৃতিতে নিম্ন উক্তি করিয়াছিলেন?—

'আমি জনসাধারণকে ও কংগ্রেস আইন-সভা দলের সদস্যদের এই আশ্বাস দিতে চাই যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ পাইলে পদচ্যুত মন্ত্রীদের কয়েকজনকে নিয়োগ করার পরামর্শ গভর্নরকে দিবার অভিপ্রায় আমার ছিল।' ড. খারে

কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ আনার ঔদ্ধত্য দেখাইয়াছেন এবং সব-কিছু ফাঁস করিয়া দিবার শাসানিও দিয়াছেন। তাঁহার কাছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বজনপোষণ সম্পর্কিত যাহা-কিছু তথ্য আছে তাহা প্রকাশ করিতে যদি তিনি সময়ক্ষেপ না করেন তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের সর্বোত্তম সেবা করিবেন।

ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ২০ জুলাই তাঁহাকে কোনোপ্রকার হঠকারী কাজ না করার জন্য যে লিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী আপত্তি তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনি সুবিধামতো ভুলিয়া গিয়াছেন যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটির একজন অতি বিশিষ্ট সদস্য এবং সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্য। জরুরি অবস্থার সময় যখন অপর দুইজন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন তখন সংসদীয় সাব-কমিটির পক্ষে কাজ করিবার পরিপূর্ণ অধিকার ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহার পিছনে সংসদীয় সাব-কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ণতম সমর্থন ছিল। এই প্রসঙ্গে ড. খারে ৯ মে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি পঙ্ক্তি আমি উদ্ধৃত করিতেছি :

'আমি আরো মনে করি যে এই-সব ঘটনা আপনার গোচরীভূত করা আমার অবশ্যকর্তব্য। বিষয়টি সম্বন্ধে আমার অভিমত কী তাহার ইঙ্গিত আমি পূর্বেই দিয়াছি। এই বিষয়ে আমার আর-কোনো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কিনা এবং উচিত হইলে সেই-সব ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আপনি আমাকে জানাইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।'

ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ যদি ড. খারের দৃষ্টিতে কেহই না হন তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার নির্দেশ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন কেন ?

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দেখাইয়াছেন যে তাঁহার মহাকোশল সহকর্মীগণ তাঁহার প্রতি অনুগত ছিলেন না, কেননা ২০ জুলাই তাঁহারা তাঁহার সহিত পদত্যাগ করেন নাই। ইহা তাঁহার মাথায় আসে নাই যে তিনি নিজে যখন তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুগত ছিলেন না, তখন সহকর্মীগণ তাঁহার প্রতি অনুগত হইবেন এ প্রত্যাশা তিনি করিতে পারেন না। মন্ত্রীরা যদি বিদ্রোহী প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধের মতো অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় ভুল করিতেন। ইহা ছাড়া, তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রশ্নটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ না করার স্পষ্ট নির্দেশ পাইয়াছিলেন

ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে। ড. খারে ও তাহার দুইজন মহারাষ্ট্রীয় সহকর্মীকে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। পরবর্তী মন্ত্রীগোষ্ঠী তাঁহার নির্দেশ মানেন নাই কিন্তু পূর্ববর্তী মন্ত্রীগোষ্ঠী তাহা মানিয়াছিলেন। এইজন্যই ওয়ার্কিং কমিটি তাহার প্রস্তাবে পূর্ববর্তী গোষ্ঠীর কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল।

ডক্টর অনুযোগ করিয়াছেন যে ২০ জুলাই ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন করেন নাই। সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণ যদি তাঁহার সহিত যোগাযোগ নাও করিয়া থাকেন তাহা হইলে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার কর্তব্য ছিল সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্যগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করা ও তাঁহাদের নির্দেশ গ্রহণ করা। সংসদীয় সাব-কমিটির কোনো সদস্যের সহিত কোনো মন্ত্রীর সরাসরি যোগাযোগ থাকায় ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট যে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহার একটা অতিরঞ্জিত ধারণা আছে। যাঁহারা উচ্চপর্যায়ে অধিষ্ঠিত তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের অধীন ব্যক্তিদের সরাসরি যোগাযোগ থাকার মধ্যে আপত্তিজনক তো কিছু নাই-ই বরং এরূপ যোগাযোগ নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে গভর্নরের উদাহরণ আদৌ খাটে না। গভর্নর বাহিরের ব্যক্তি এবং আমরা আশংকা করি যে তিনি আমাদের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পক্ষে যতটা সম্ভব গভর্নরের সহিত স্বতন্ত্র সাক্ষাৎকার এড়াইয়া চলা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক বিভেদ সৃষ্টির পর হইতে সংসদীয় সাব-কমিটির ও ওয়ার্কিং কমিটির বার বার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা গিয়াছে। পাঁচমারিতে মন্ত্রীসভার দুইটি গোষ্ঠী একটা আপসে আসিয়াছিলেন। আপসভঙ্গের কারণ দেখা গেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ সংসদীয় সাব-কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারস্থ হইবার পথ উভয় গোষ্ঠীর কাছে উন্মুক্ত ছিল। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁহার মন্ত্রীগণকে নিজের পালিত জীব মনে করেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করেন তখন তিনি নিজেই নিজেকে অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মীগণের সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল এইজন্য যে এই সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না এবং তিনি তাঁহার দলকে ঠিকভাবে চালাইতে পারেন নাই। আর ড. খারে ইহা সুবিধাজনকভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন.

যে এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যখন তিনি নিজে তাঁহার মন্ত্রীসভার কার্যকলাপে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চাহিয়াছেন।

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী অনুযোগ করিয়াছেন যে তাঁহার মহাকোশলের সহকর্মীগণ মে মাসে তাঁহার অনুগত ছিলেন কিন্তু জুলাই মাসে তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশিদূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। মে মাসে তিনি নিজে তখনো কংগ্রেসের শৃংখলা অনুসারে কাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বাধ্য ছিলেন। জুলাই মাসে তিনি যে মুহূর্তে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন সেই মুহূর্ত হইতে তিনি সহকর্মী ও অধস্তন ব্যক্তিদের নিকট হইতে আনুগত্য দাবি করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন জুলাই মাসে তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার নির্দেশে পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে সংসদীয় সাব-কমিটি কিংবা ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ পাওয়া মাত্র তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। ডক্টরের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে তিনি যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানাইয়া মে মাসে পদত্যাগ কাজে লাগাইতে পারেন নাই তখন তিনি জুলাই মাসেও তাহা পারিবেন না।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীসভা ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন না পাইয়া ফেব্রুয়ারিতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার এই বক্তব্যে তিনি পুরাপুরি ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে হরিপুরা কংগ্রেসের আগে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহাই এই মন্ত্রীসভা দুইটি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ড. খারের আত্মপক্ষ সমর্থন আপাত-নিরপরাধীর ভূমিকার মধ্যে নিবদ্ধ। তিনি বলেন যে তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন হইল তিনি যদি পাঁচমারির আপস কার্যকর করিতেন এবং সহকর্মীগণের বিরুদ্ধে গোপন তদন্ত বন্ধ করিতেন তাহা হইলে কে তাঁহাকে তাড়াইতে পারিত? তিনি বলেন যে মহাকোশলের মন্ত্রীরা পাঁচমারিতে তাঁহাকে গদিচ্যুত করায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাহাই যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাও সমান সত্য যে তিনিও তাঁহাদের অপসারণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এক জায়গায় অনুযোগ করিয়াছেন যে মহাকোশলের নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিকতাভাবাপন্ন (প্রাদেশিক) ছিলেন। একই সংগে তিনি আঞ্চলিক ও সংকীর্ণ বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য মহাকোশলের আইনসভা সদস্যদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। তাঁহার কোন্ বক্তব্য আমরা গ্রহণ করিব?

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে মহাকোশলের মন্ত্রীগণ মন্ত্রীসভায় একটি গোষ্ঠী গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা এই যে মে মাসের প্রথম দিকে যখন বিদ্রোহ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তখন ইহা চরিত্রের দিক দিয়া ছিল অ-প্রাদেশিক (কিংবা অনাঞ্চলিক)। যে-সব মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছিলেন শ্রীগোলে তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীই প্রাদেশিক প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন এবং সেই ভিত্তিতে তাঁহাকে নিজের দলে টানিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে ডক্টরের অবস্থা, তাঁহার নিজের উক্তি অনুসারে, নিম্নোক্তরূপ ছিল। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল— তেমনই তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল উপদেষ্টা পর্ষদ ('নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ'), দলের অধিকাংশ এবং মন্ত্রীদের মধ্যে তিন জন। কেন এবং কিভাবে তিনি নিজেকে এই পরিণতিতে টানিয়া আনিয়াছিলেন ?

ড. খারে ১৯৩৫-এর ভারত সরকারের আইনের এমন এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে ব্যাখ্যা দিতে এমন-কি একজন সাংবিধানিক ব্যবহারজীবীও সাহস পাইবেন না। তাঁহার অভিমত অনুসারে তাঁহার নিজের কাজের ফলে তিনজন মহাকোশল মন্ত্রীর কাজের মেয়াদ ফুরাইয়াছিল, গভর্নরের কাজ সেজন্য দায়ী ছিল না। কিন্তু এই আইনের ৫১ ধারা কী বলে ?

১. গভর্নরের মন্ত্রীগণ তৎকর্তৃক মনোনীত ও আহূত হইবেন, তিনি তাঁহাদিগকে মন্ত্রীসভার সদস্যরূপে শপথ গ্রহণ করাইবেন এবং তাঁহারা তাঁহার বিচারবুদ্ধিমতো পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

২. এই ধারায় মন্ত্রীগণের মনোনয়ন, তাঁহাদিগকে আহ্বান ও তাঁহাদের পদচ্যুতির এবং তাঁহাদের বেতন নির্ণয় সম্পর্কিত গভর্নরের দায়িত্বগুলি তিনি নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী পালন করিবেন।

লক্ষ্য করিলে ইহা হাস্যকর মনে হয় যে গভর্নর পদচ্যুত করা কথাটি প্রয়োগ না করিয়া 'কার্যকালের মেয়াদ শেষ করা' ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ডক্টর ভাবিয়াছিলেন যে গভর্নর প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করেন নাই।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে ব্যবহৃত 'বিশেষ ক্ষমতা' পদটি লইয়া হৈ-চৈ করা হইয়াছে। এই পদটি ব্যবহার করা হইয়াছিল জনপ্রিয়তার অর্থে— সাধারণ ক্ষমতা হইতে স্পষ্টত ভিন্ন কিছু বুঝাইবার জন্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা হওয়া উচিত ছিল 'বিবেচনাময় ক্ষমতা', কেননা আইনের আওতায় গভর্নরের পদচ্যুত করার দায়িত্ব পালন করা হয় তাঁহার বিবেচনা অনুসারে। গভর্নর একমাত্র তাঁহার বিবেচনা মাফিক ক্ষমতাবলে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করিতে পারেন।

শৃঙ্খলার ব্যাপারে তিনি কোথায় দোষী হইয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডক্টর চুল-চেরা যুক্তি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিচার-বিভ্রান্তি স্বীকার করিলেও শৃঙ্খলাভঙ্গ স্বীকার করেন না। পূর্ববর্তী বিবরণ হইতে দেখা গিয়াছে যে তিনি সতর্কবাণী পাইয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কর্ম-পদ্ধতি ও রেওয়াজ বরাবর কি তাহাও তিনি জানিতেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর একটি বিবৃতির সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে দোষ স্বীকার করিতে বলে নাই। সুতরাং তিনি স্বীকারোক্তি করিতে অস্বীকৃত হইয়া শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ বৃদ্ধি করিয়াছেন—এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইহা কূট তার্কিকের যুক্তি। সম্মিলিত সংস্থা হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটি সেই মর্মে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে—তবে এ বিষয়ে সংশয় নাই যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ তাঁহাকে এই স্বীকারোক্তি করিতে বলিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

'আমার কৈফিয়তে'র অন্যতম প্রধান হাস্যকর অংশ হইল যেখানে তিনি তাঁহার হঠকারী কাজের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সহকর্মীদের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মধ্যপ্রদেশ অকংগ্রেসী প্রদেশ হইয়া যাইবে এই ভয় তাঁহাকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্ত ইহা তাঁহার মনে পড়ে নাই যে নিজেকে এই দুই-এর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিজের পদ সংরক্ষণের জন্য তাঁহার একমাত্র যাহা করার ছিল তাহা হইল পাঁচমারি আপসের রূপায়ণ এবং সহকর্মীগণের সঙ্গে খেলোয়াড়সুলভ আচরণ। তিনি যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে তিনি পাহাড়ের মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন এবং কোনো কিছু তাঁহাকে সরাইতে পারিত না। কিন্তু পুরাতন মন্ত্রীসভা ভাঙার এবং নূতন মন্ত্রীসভা লইয়া ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি নিজেকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে ড. খারে এখনো নিজের কাজ বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারিতেছেন না। কাজেই নিজের কাজকে যুক্তিসংগত বলিয়া প্রমাণ করার এবং তিনি অন্যায় কিছু করেন নাই এই বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিবার অব্যাহত প্রয়াস তাঁহার চলিয়াছে। তাঁহার আচরণের ফলে কংগ্রেসের ক্ষতি ও মর্যাদা হানি হইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য এখনো তাঁহার সহিত যুক্তিতর্ক করিতে হয়— ইহা কী পরিতাপের বিষয়! সমান পরিতাপের

বিষয় এই যে তিনি এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে গভর্নর তাঁহাকে লইয়া কী খেলা খেলিয়াছিলেন। যদিও গভর্নর যে 'অশালীন দ্রুততার' সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন এবং যেভাবে তিনি সারা রাত জাগিয়া কাটাইয়াছিলেন তাহা যে-কোনো লোকের চোখ খুলিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ডক্টর পরে কংগ্রেসে তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মীদের প্রতি যদিচ্ছা গালিমন্দ করিয়াছেন। যেখানে তিনি ২২ জুলাই স্বেচ্ছায় গভর্নরের কাছে পদত্যাগ করিয়াছিলেন সেখানে আজ তিনি বলিতেছেন যে আমরা নাকি গভর্নরের কাছে তাঁহার সম্মানহানি করিয়াছি। তিনি সব-কিছুই বাঁকা দেখিতেছেন এবং সেইজন্য বুঝিতে পারিতেছেন না যে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত চরম ব্যবস্থা মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসকে চরম বিপর্যয়ের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। পদত্যাগের দ্বারা তিনি সেই সময় নিশ্চয়ই গভর্নরের কাছে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যদিও তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ড. খারে মহাত্মা গান্ধীর নির্মম সমালোচনায়ও ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু ঘটনাক্রম বিচার করিলে তাঁহার পরামর্শই ছিল শ্রেষ্ঠ এবং ডক্টরের তদনুসারে কাজ করা উচিত ছিল। আর মহাত্মাজীর খসড়ার কথা বলিতে গেলে ইহা প্রতিটি নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ড. খারের খসড়ায় তিনি যাহা-কিছু সংযোজন করিয়াছিলেন তাহা ঘটনাবলীর সামান্য বিবরণ দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রত্যেক নিরপেক্ষমনা ব্যক্তির কাছে ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে ড. খারের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয় নাই বলিয়া কোনো মহলে এরূপ কোনো মনোভাব সৃষ্টির কণামাত্র সংগত কারণ নাই।

কিন্তু আমি ব্যক্তিগত কৈফিয়ত সহ ইহার উপসংহার করিতে চাই। মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত আমার সম্পর্কের কথা প্রত্যেকে জানেন। ড. খারে শুধু মহারাষ্ট্রীয় নন, আমার বন্ধু ও ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁহার অন্যান্য বন্ধুও ছিলেন। তিনি নিশ্চয় জানেন যে মহাত্মা গান্ধী কিংবা আমরা তাঁহার প্রতি অবিচার করিতে পারি না কিংবা সেই অবিচার করিতে আমরা কাহারো দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারি না। আমি বুঝি যে তাঁহাব প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। অতীতেও অনেকে তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে ইহা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন যদিও তাঁহারা নিজেরাই ছিলেন অন্যায়কারী। বন্ধু হিসাবে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিব যে তিনি যদৃচ্ছভাবে

যে-সব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবৃতি দিয়াছেন সেগুলি প্রত্যাহার করুন এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ কংগ্রেসসেবীর মতো কাজ করিয়া চলুন। তিনি যে কেবল বন্ধুদের সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও সমর্থন পাইবেন তাহাই নয়, এমন-কি, আজ যাঁহাদের তাঁহার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের সহানুভূতি, সদিচ্ছা এবং সমর্থনও তিনি পাইবেন— এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

সাম্প্রদায়িক সংহতি

১৯৩৮ মে মাসে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন প্রসঙ্গে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-সভাপতি মি. জিন্নার সহিত পত্রালাপ সুভাষচন্দ্র-কর্তৃক ১৭ আগস্টের পত্রিকায় প্রকাশিত।

বসু-জিন্না পত্র বিনিময়

মহাত্মা গান্ধী, মি. জিন্নার সহিত যে আলোচনা শুরু করিয়াছিলেন তাহা চালাইয়া যাইবার জন্য ১১ মে, ১৯৩৮ তাঁহার সহিত বোম্বাইতে আমার সাক্ষাৎকারের পর তাঁহার সহিত আমার পত্রালাপ আমি মিঃ জিন্নার অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিতেছি। গত মে মাসে বোম্বাইতে থাকাকালীন মি. জিন্নার সহিত আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কর্মপরিষদের শেষ অধিবেশনের পর মি. জিন্না কংগ্রেস সভাপতিকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে যদিও মুসলিম লীগকে ভারতের সমগ্র মুসলিম জনসমষ্টির একমাত্র মুখপাত্র বলিয়া দাবি করিয়াও ইহাতে কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হইয়াছিল কংগ্রেস যেন সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জন্য আরো আলোচনার দ্বার রুদ্ধ না করিয়া দেয়— সমস্যাটি 'একটি গৌণ সমস্যারূপে' চিহ্নিত হইয়া মতভেদের কারণ হইয়াছে। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ পত্রটি ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে বলিয়া মি. জিন্নাকে জানানো হয়।

১৩ মে ১৯৩৮ : মি. জিন্না-প্রদত্ত সূত্র

১. ভারতীয় মুসলমানগণের কর্তৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংগঠনরূপে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং হিন্দু অভিমতের সংহত, কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনরূপে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য সূত্ররূপে দুইটি প্রধান সম্প্রদায় নিম্নোক্ত শর্তগুলি গ্রহণ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

২. কংগ্রেস এবং ভারতের মুসলমানদের কর্তৃত্বপূর্ণ প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন রূপে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের সূত্ররূপে নিম্নোক্ত শর্তগুলি গ্রহণ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

১৪ জুন ১৯৩৮ সভাপতি কর্তৃক মি. জিন্নার হাতে প্রদত্ত মন্তব্য (গোপনীয়)

কংগ্রেস সভাপতি এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সভাপতি মি. জিন্নার মধ্যে আলোচনাকালে মি. জিন্না প্রস্তাব করেন সম্ভাব্য কোনো মতৈক্যে উপস্থিত হইলে তাহার ভিত্তি হওয়া উচিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অবস্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোঝাপড়া। তিনি প্রস্তাব করেন যে নিম্নোক্ত ধারায় আলোচনা অগ্রসর হওয়া উচিত :

ভারতীয় মুসলমানগণের কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনরূপে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং হিন্দু অভিমতের সংহত কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন রূপে কংগ্রেস, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের সূত্ররূপে নিম্নোক্ত শর্তগুলি গ্রহণ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

আরো বিবেচনার পর কিছুটা ভিন্ন ধরনের বাক্য-সংযোজিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি তিনি উত্থাপন করেন :

"কংগ্রেস এবং ভারতের মুসলমানদের কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন রূপে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের সূত্ররূপে নিম্নোক্ত শর্তগুলি গ্রহণ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।"

একই ভাবনা

দ্বিতীয় খসড়াটি দৃশ্যত হ্রস্বতর হইলেও প্রথমটিতে যে বক্তব্য আছে তাহাই অভিব্যক্ত করে অর্থাৎ কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবে।

কংগ্রেস সম্ভবত একমাত্র একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে বিবেচনা করিতে কিংবা সেই মর্মে কাজ করিতে পারে না। যদিও তাঁহারাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ইহার দরজা অবশ্যম্ভাবী রূপে সকল সম্প্রদায়ের জন্য খোলা থাকিবে এবং ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারাই ইহার সাধারণ কর্মনীতি ও পন্থা তর সহিত একমত হন তাঁহাদের সকলকেই ইহা গ্রহণ করিবে। ইহা একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব মানিয়া লইতে পারে না এবং এইভাবে নিজেকে সাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করিতে পারে না। একই সংগে অন্যান্য যে-সব সংগঠন সংখ্যালঘু স্বার্থের প্রতিনিধি তাহাদের সহিত আলোচনা ও সহযোগিতা করিতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ সম্মত রহিয়াছে।

ইহা স্পষ্ট যে ভারতের মুসলমানেরা সমগ্র দেশে সংখ্যালঘু হইলেও তাঁহারা জনসংখ্যার একটা বিশেষ বড়ো অংশ এবং ভারত-সম্পর্কিত যে-কোনো পরিকল্পনায় তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই বিচার করিতে হইবে। ইহাও সত্য যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মুসলমান জনমতের একটা বড়ো অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন রূপে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এইজন্যই কংগ্রেস লীগের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিবার এবং ইহার সহিত একটা বোঝাপড়ায় আসিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অতীতে অন্যান্য যে-সব মুসলিম সংগঠন কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে কংগ্রেস বাধ্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীর কিংবা সংখ্যালঘুর স্বার্থ বিজড়িত থাকিলে সেইরূপ স্বার্থের প্রতিনিধিদের সহিতও পরামর্শ করা প্রয়োজন হইবে।

ব সু - জি ন্না

২৬, মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই
১৫ মে ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

গত রাত্রে আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া আমি একটি নোট আপনাকে দিয়াছিলাম। আপনি আমার কাছে জানিতে চাহিয়াছিলেন আমাদের কী ধরনের গঠনমূলক প্রস্তাব আছে। আমি মনে করি যে নোটটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আপনার প্রস্তাবের উপর কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া জানাইয়া দিবার পর এখন আমাদের পরবর্তী স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যে কমিটিগুলি যৌথভাবে বোঝাপড়ার শর্ত মীমাংসা করিবে সেই কমিটিগুলির নিয়োগ।

মি. জিন্না, এস্কোয়ার
লিট্‌ল গিবস্ রোড, বোম্বাই

একান্তভাবে আপনার
সুভাষচন্দ্র বসু

জি ন্না - ব সু

লিট্‌ল গিবস্ রোড
মালাবার হিল, বোম্বাই
১৬ মে ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বসু,

আপনি কংগ্রেসের পক্ষে আমাকে ১৪ মে যে নোট দিয়াছিলেন এবং ১৫ মে ১৯৩৮ আপনার পত্রেরও প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। বিষয়টি জুন মাসের প্রথম

সপ্তাহে আহূত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্মপরিষদ ও ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভায় উপস্থাপিত হইবে। যত শীঘ্র সম্ভব তাহার সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাইব।

একান্তভাবে আপনার
এম. এ. জিন্না

বোম্বাই
৬ জুন ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বসু,

কংগ্রেসের পক্ষে আমাকে প্রদত্ত আপনার নোটের এবং আপনার ১৫ মে, ১৯৩৮-এর আমাকে লিখিত পত্রের ভিত্তিতে ১৬ মে ১৯৩৮ এ লিখিত আমার পত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী— নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্মপরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এইসঙ্গে পাঠাইলাম।

একান্তভাবে আপনার
এম. এ. জিন্না

প্রস্তাব : ১

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সভাপতি মি. সুভাষচন্দ্র বসু, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মি. জিন্নাকে ১৪ মে যে নোট এবং ১৯৩৮-এর ১৫ মে যে পত্র দিয়াছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্মপরিষদ সেগুলি বিবেচনা করিয়া মনে করে যে মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমানগণের কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন এই ভিত্তিতে ছাড়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষে কংগ্রেসের সহিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি উত্থাপন কিংবা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

প্রস্তাব : ২

পরিষদ মি. গান্ধীর ১৯৩৮-এর ২২ মের পত্রও বিবেচনা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করে যে কংগ্রেস যে প্রস্তাবিত কমিটি নিয়োগ করিবে তাহাতে কোনো মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রস্তাব : ৩.

কর্মপরিষদ ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চায় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মনে একটা নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যান্য সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত— ইহা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঘোষিত নীতি এবং এইরূপ কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিংবা অন্য কোনো স্বার্থ বিজড়িত হইলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তাহাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করিবে।

বসু-জিন্না তারবার্তা। ২১ জুন ১৯৩৮

"জিন্না, বোম্বাই

"গতকাল ফিরিয়াছি। আপনার পত্র পাইলাম। ধন্যবাদ। প্রাপ্তি স্বীকারে বিলম্বের জন্য দুঃখিত। —সুভাষ বসু।"

পত্র।

৩৮/২, এলগিন রোড। কলিকাতা
২৭ জুন ১৯৩৮

প্রিয় মি. জিন্না,

আপনার এই মাসের ৬ তারিখের যে পত্রের সহিত মুসলিম লীগ কর্ম-পরিষদের প্রস্তাবগুলি পাঠাইয়াছিলেন তাহা যথারীতি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু আমি সফরে থাকায় এই মাসের ২০ তারিখে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহা পাই নাই। আমি পরদিনই আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম।

৯ জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে। আপনার পত্র ও মুসলিম লীগের প্রস্তাবগুলি কমিটির সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং তাহার পরে আমি ইহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপনাকে যথাসম্ভব শীঘ্র অবহিত করিব। আমি ওয়ার্ধায় গিয়াছিলাম এবং সবে সেখান হইতে ফিরিয়াছি।

সর্বোত্তম শ্রদ্ধা সহ

একান্তভাবে আপনার
সুভাষচন্দ্র বসু

এম. এ. জিন্না, এস্কোয়ার
বোম্বাই।

তারবার্তা । ২৪ জুন ১৯৩৮

"জিন্না, বোম্বাই

"সংবাদপত্রে প্রকাশ আপনি গান্ধীজীর ও আমার সহিত আপনার আলোচনার বিবরণ প্রকাশ করিতে চান। আশা করি পূর্বে আমাদের সম্মতি না লইয়া তাহা প্রকাশ করিবেন না।—সুভাষ বসু।"

জিন্না-বসু। তারবার্তার উত্তর। ২৫ জুন ১৯৩৮

"সুভাষ বসু, ওয়ার্ধা।

"আপনার টেলিগ্রাম। সংবাদপত্রের উল্লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ অসত্য

—জিন্না।"

বসু-জিন্না

শিবির (ওয়ার্ধা)
২৫ জুলাই ১৯৩৮

প্রিয় মি. জিন্না,

আপনার ১৯৩৬-এর ৬ জুনের পত্রের সহিত আপনি মুসলিম লীগের যে-সব প্রস্তাব অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ওয়ার্কিং কমিটি সেগুলি সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল প্রকার মনোযোগ দিয়াছে। লীগ কর্মপরিষদের প্রথম প্রস্তাবে লীগের পদমর্যাদার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সমাধানের শর্ত বিবেচনার পদ্ধতি স্থির করার পূর্বে কংগ্রেস প্রস্তাবে ব্যাখ্যাত পদমর্যাদা মানিয়া লইবে, সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট অসুবিধা আছে। যদিও প্রস্তাবে 'একমাত্র' এই বিশেষণটি ব্যবহার করা হয় নাই, তবুও প্রস্তাবের ভাষায় এই বিশেষণটি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইতিপূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটি লীগের এই অন্যনিরপেক্ষ পদমর্যাদার স্বীকৃতি সম্বন্ধে সতর্কবাণী পাইয়াছে। মুসলিম লীগ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছে এরূপ আরো মুসলমান সংগঠন আছে। তাহাদের কয়েকটি কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এমন মুসলমান আছেন যাঁহারা কংগ্রেসসেবী এবং দেশে যাঁহাদের প্রভাব নগণ্য নয়। ইহা ছাড়া সীমান্ত প্রদেশ রহিয়াছে। যেখানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং যে প্রদেশ দৃঢ় সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সমর্থক। আপনি দেখিতে পাইবেন যে এই-সব স্বীকৃত তথ্যের পটভূমিকায় লীগ কর্মপরিষদের প্রথম

প্রস্তাবে কংগ্রেসকে যাহা স্বীকার করাইতে চাওয়া হইয়াছে তাহা স্বীকার করা কংগ্রেসের পক্ষে শুধু অসম্ভবই নয় অনুচিতও বটে। ইহা বলা যায় যে সংগঠনের মর্যাদা সংজ্ঞা নির্দেশ হইতে আসে না। ইহা আসে সংগঠন যে সেবায় নিয়োজিত তাহার মাধ্যমে। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি আশা করে যে লীগ কর্মপরিষদ কংগ্রেসকে অসম্ভব কোনো কিছু করিতে বলিবে না। ইহাই কি যথেষ্ট নয় যে, বহু বিতর্কিত হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে একটা সম্মানজনক বোঝা-পড়ায় আসার জন্য ও লীগের সঙ্গে সর্বাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কংগ্রেস শুধু ইচ্ছুকই নয়, উদ্গ্রীবও বটে।

এই সুযোগে কংগ্রেসের দাবির কথাও বোধ হয় উত্থাপন করিয়া রাখা উচিত। যদিও ইহা স্বীকার্য যে অগণিত কংগ্রেস সদস্য-তালিকায় বৃহত্তম সংখ্যক ব্যক্তিরা হিন্দু, তবু কংগ্রেসে বহু সংখ্যক মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মের মানুষও আছেন। ভারতবর্ষ যাঁহাদের স্বদেশ সেই-সকল সম্প্রদায়ের, সকল জাতির এবং সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য হইয়া আছে। ইহার জন্ম হইতে প্রায়ই দেশের এবং কংগ্রেসের আস্থাভাজন প্রখ্যাত মুসলমানগণ ইহার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

কংগ্রেসের ইহাই ঐতিহ্য যে কোনো কংগ্রেসসেবী যে-ধর্মে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও লালিত-পালিত হইয়াছেন তিনি তাহাতেই সম্পৃক্ত থাকিলেও ধর্মের দাবিতেই কেহ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হন না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মনীতি সমর্থনের ভিত্তিতেই তিনি কংগ্রেসের একজন ও তাহার অংগীভূত হন। সুতরাং কংগ্রেস কোনো অর্থেই সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়। বস্তুত সাম্প্র-দায়িকতা পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলংক জাতীয়তাবোধের অন্তরায় বলিয়া কংগ্রেস সর্বদা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস এই দাবি করিলেও এবং কম-বেশি সদস্যের সহিত দাবিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিলেও ওয়ার্কিং কমিটি লীগ কর্মপরিষদের নিকট হইতে কোনো স্বীকৃতির প্রার্থী নয়। জাতীয় সংহতি গড়িয়া তুলিবার এবং আমাদের অভিন্ন ভাগ্যের অন্তিমসার্থকতার উদ্দেশ্যে মনে প্রাণে কাজ করিবার জন্য লীগ কর্মপরিষদ যদি কংগ্রেসের সহিত একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছায় তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি আনন্দিত হইবে।

কর্মপরিষদের দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা এই যে ইহাতে ব্যক্ত ইচ্ছার সহিত ওয়ার্কিং কমিটির ঐক্যমত হওয়া সম্ভব নয়।

ওয়ার্কিং কমিটি তৃতীয় প্রস্তাবটি অনুধাবনে অক্ষম। ওয়ার্কিং কমিটি যতদূর জানে তাহাতে মুসলীম লীগ এই অর্থে একটি ষোলো-আনা সাম্প্রদায়িক সংগঠন যে ইহা মুসলিম স্বার্থের সেবাপ্রয়াসী এবং ইহার সদস্যপদও একমাত্র মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত। ওয়ার্কিং কমিটি বারবার বুঝিয়া আসিয়াছে যে মুসলিম লীগ এ-ব্যাপারে যতটা সংশ্লিষ্ট তাহাতে সে চায় এবং সংগতভাবেই চায় যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে কংগ্রেসের সহিত একটা আপস-রফা হউক এবং এ ক্ষেত্রে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন উঠে না। আর কংগ্রেস এ ব্যাপারে যতটা সংশ্লিষ্ট ততটা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো অভিযোগ যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থা করিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, কেননা কংগ্রেস তাহার সংবিধানের বলেই জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বলিয়া ইহা তাহার অবশ্যকর্তব্য।

পূর্বোল্লিখিত তথ্যের পটভূমিকায় আমি আশা করি যে সমাধানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের আলোচনার পরবর্তী স্তরের কাজ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

পূর্ববর্তী পত্রালাপ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আমাদের মধ্যে পরবর্তী পত্র-বিনিময় প্রকাশ করা বিজ্ঞোচিত হইবে। আপনি সম্মত হইলে এই দলিলগুলি প্রকাশের জন্য অবিলম্বে প্রচার করা হইবে।

একান্তভাবে আপনার

মি. এম. এ. জিন্না সুভাষচন্দ্র বসু

জিন্না - বসু

লিট্‌ল গিব্‌স রোড
মালাবার হিল, বোম্বাই
২ আগস্ট, ১৯৩৮

প্রিয় মি. বসু,

আমি আপনার ১৯৩৮-এর ২৫ জুলাই-এর পত্র নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্মপরিষদের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম।

ইতিপূর্বে আপনার কাছে প্রেরিত কর্মপরিষদের ১নং প্রস্তাবে যে পদমর্যাদা

দাবি করা হইয়াছে তাহা হইতে বিরত থাকার জন্য আপনার পত্রে যে-সব যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে কর্মপরিষদ সেগুলি গভীর মনোযোগ ও যত্ন সহকারে বিবেচনা করিয়াছে। আমাকে জানাইতে বলা হইয়াছে যে পদমর্যাদার সংজ্ঞা নির্দেশ করায় পরিষদ কোনো স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, বরং স্বীকৃত তথ্য পরিবেশন করিয়াছে মাত্র।

কর্মপরিষদের এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রত্যয় রহিয়াছে যে মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানগণের একমাত্র কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদনকালে এই মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে ১৯৩৫ সালে জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা-বৈঠক পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠে নাই। সুতরাং কংগ্রেসের নিকট হইতে এরূপ কোনো ঘোষণার বা স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজন মুসলিম লীগের নাই কিংবা বোম্বাইতে কর্মপরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহার ক্ষেত্রেও এরূপ কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তাঁহার একটি বিবৃতিতে, দেশে মাত্র দুইটি দল আছে অর্থাৎ বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস, এই দাবি করিয়া লীগের সত্তা, এমন-কি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, সেই হেতু যে ভিত্তিতে উভয় সংগঠনের মধ্যে আলোচনা অগ্রসর হইতে পারে তাহা কংগ্রেসকে জানানো প্রয়োজন বলিয়া কর্মপরিষদ মনে করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেস আলোচনায় অগ্রসর হওয়ায় লীগের কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র পূর্বস্বীকৃত হইয়াছে এবং এইভাবে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার যে তাহার আছে তাহাও মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

পরিষদ অবগত আছে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার বর্তমান এবং অন্যান্য প্রদেশেও কিছু মুসলমান কংগ্রেস সংগঠনে আছেন। কিন্তু পরিষদের অভিমত এই যে কংগ্রেসের এই মুসলমানগণ ভারতের মুসলমানগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না, এই কারণে যে তাঁহারা সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং কংগ্রেসের সদস্যভুক্তিতে তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার কিংবা কথা বলার অধিকার নিজেরাই হারাইয়াছেন। তাহা না হইলে আপনার পত্রে আপনি কংগ্রেসের যে জাতীয় চরিত্রের দাবি করিয়াছেন তাহা এভাবে ধূলিসাৎ হইত না।

আপনার পত্রে উল্লিখিত "অন্যান্য মুসলমান সংগঠন"-এর আপনি কোনো নাম উল্লেখ করেন নাই এবং পরিষদ মনে করে যে এ বিষয়টির কোনো উল্লেখ না করিলেই তাহা অধিকতর যুক্তিসংগত হইত। তাহারা যদি সম্মিলিতভাবে কিংবা এককভাবে ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে আলোচনার অধিকারী হইত, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মীমাংসার জন্য কংগ্রেস সভাপতি এবং মি. গান্ধী মুসলিম লীগের সহিত আলোচনার সূত্রপাত করিতেন না। যাহা হউক, এ-বিষয়ে মুসলিম লীগ যতটা সংশ্লিষ্ট তাহাতে সে এমন কোনো মুসলিম রাজনৈতিক দলের কথা জানে না যে দল কখনো ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে কথা বলিবার কিংবা আলোচনা করিবার অধিকার দাবি করিয়াছে। সুতরাং ইহা বেশ পরিতাপের বিষয় যে আপনি এই প্রসঙ্গে "অন্যান্য মুসলিম সংগঠনে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

বহু বিতর্কিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা সমাধান করার জন্য এবং এই-ভাবে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন ত্বরান্বিত করার জন্য পরিষদ সমভাবে উদ্‌বিগ্ন; কিন্তু ইহা বেদনাদায়ক যে মূল প্রশ্ন মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তোলার জন্য এবং আলো-চনার গতি ব্যাহত করার জন্য সূক্ষ্ম যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে।

উপরি উক্ত তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ এখনো আশা করে যে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হইবে না এবং কংগ্রেস সেই ভিত্তিতে কমিটি নিয়োগের কাজে অগ্রসর হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদ বলিতে চায় যে কংগ্রেস যে-কমিটি নিয়োগ করিবে তাহাতে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তি পরিষদ এই কারণে অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিল যে এই কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য মিলিত হইবে এবং তাহাতে স্বাভাবিকভাবে যে-সব সমস্যা জড়িত থাকিবে সেই ব্যাপারে তাঁহারা হিন্দু কিংবা মুসলমান কাহারো আস্থা অর্জন করিতে পারিবেন না ও তাঁহাদের অবস্থা হইবে সবচাইতে সংকটজনক। সুতরাং পরিষদ উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করে।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে বলা যায় যে আপনারা ১৯৩৮-এর ১৫ মে তারিখের পত্রে কংগ্রেসের যে স্মারকলিপির উল্লেখ আছে তাহাতে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্র-দায়ের কথা ছিল এবং মুসলিম লীগ তাহার ঘোষিত নীতি অনুসারে প্রয়োজন-বোধে তাহাদের সহিত পরামর্শ করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছে।

এই পত্র সহ পত্র-বিনিময় প্রকাশের জন্য প্রচার করার যে ইচ্ছা আপনি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে পরিষদের কোনো আপত্তি নাই।

একান্তভাবে আপনার
এম. এ. জিন্না

সুভাষচন্দ্র বসু, এস্কোয়ার
কংগ্রেস সভাপতি
৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

বসু-জিন্না

৩৮।২, এলগিন রোড
কলিকাতা
১৬ আগস্ট ১৯৩৮

প্রিয় মি. জিন্না,

আপনার ১৯৩৮-র ২ আগস্টের পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি বিলম্বে উত্তর দানের জন্য দুঃখিত। প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমি সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে ইহা উপস্থিত করিতে চাই। তৎপর আপনি আমার নিকট হইতে পুনরায় সংবাদ পাইবেন।

শ্রদ্ধাসহ
একান্তভাবে আপনার
সুভাষচন্দ্র বসু

মি. এম. এ. জিন্না
বোম্বাই

১৭ আগস্ট ১৯৩৮

ইউরোপীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি

সেন্ট পলস্ কলেজ ইউনিয়নের উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

বৈদেশিক টেলিগ্রামের বিচারে বলা যায় যে ইউরোপের ঘটনাবলী, সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্থান দখল করিয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতির পটভূমি এবং ইহার অন্তর্নিহিত ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে আপনারা আরো একটু বেশি অবহিত থাকিলে এই-সকল ঘটনা অনুধাবন আপনাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। একটা সময় ছিল যখন ইতিহাসের ছাত্ররা মনে করিতেন যে মানবিক ইতিহাসের রূপ নির্ণীত হয় রাজা এবং সম্রাটদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা।

সাম্রাজ্যগুলির সংঘাত

ইতিহাসকে চিত্রিত করা হইত বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সংঘাত রূপে। আমরা ইতিহাসের সেই অধ্যায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আমরা গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ইহা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে সাম্প্রতিক ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য দায়ী অন্য কোনো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আধুনিক রাজনীতিতে জাতীয়তার নীতির উদ্ভব সেই কারণ। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী-গুলিতে যুদ্ধ ও বিপ্লব অনেক ঘটিয়াছে। অবদমিত জাতিগুলি কর্তৃক স্বাধীনতা পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে ইহার কারণ বলা যায়। আজ আমরা দেখি যে অন্য একটি নূতন উপাদান আবির্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শের উদ্ভব ঘটিয়াছে। আজ আমরা শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যগুলিকে অস্তিত্বের সংগ্রাম করিতে দেখি না, কেবলমাত্র অবদমিত জাতিগুলিকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে দেখি না, পরন্তু যে-সব জাতি জাতীয় স্বাধীনতা পাইয়াছে তাহাদিগকেও নূতন সামাজিক বিধানের জন্য সংগ্রাম করিতে দেখি। তাহারা একটি নূতন সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজে-দের সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চায়।

এই নূতন উপাদানের দরুন আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দিনের পর দিন বিক্ষোভ চলিতেছে অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদগুলির মধ্যে অব্যাহত সংঘাত চলিয়াছে। আধুনিক ইউরোপের দাবার ছকে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে এই নীতির দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বৈষম্যমূলক সন্ধি

আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে বিগত ২০ বৎসরব্যাপী বিক্ষোভের অনেকাংশের জন্য দায়ী বৈষম্যমূলক ভার্সাই-সন্ধি— যে সন্ধি স্বাধীনতার নূতন যুগ আনিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। সেই আশা এবং প্রত্যাশা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ন্যায় ও সমস্যার ভিত্তিতে গঠিত ছিল না। নিঃসন্দেহে কয়েকটি অবদমিত জাতি জাতীয় মুক্তি অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য জাতির প্রতি অন্যায় করা হইয়াছিল। জাতীয়তার ভিত্তিতে নূতন নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমন-কি সে-সব ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার করা হয় নাই। চেক'রা নিঃসন্দেহে নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যে-সব রাষ্ট্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অংশীদাররূপে স্ফীতকায় হইয়াছিল সেই সব রাষ্ট্রে শুধু তাহাদের স্বজাতিভুক্তরাই অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, বিদেশীরাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। যখন জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা হইতেছিল, সে-সময় কোনো কোনো জাতিভুক্তদের বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভার্সাই সন্ধির মধ্যে বিক্ষোভের বীজ নিহিত ছিল। জার্মান ভূখণ্ডের অংশ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। পোলদিগকে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করা হইয়াছিল। সুতরাং ভার্সাই-সন্ধি বহু প্রত্যাশিত শান্তি আনে নাই।

ইহা ছাড়া, ইউরোপের মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস অবৈজ্ঞানিক হইয়াছিল। শুধু যে কোনো কোনো জাতিভুক্তদের বৈদেশিক রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাই নয়, রাষ্ট্রগুলিও গঠিত হইয়াছিল অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। পুরাতন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য যে ত্রুটিই থাকুক তাহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একক ছিল। কিন্তু সেই রাষ্ট্রকে কাটিয়া গঠন-করা কয়েকটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বনির্ভর নয়। ফলে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল। ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে এবং জাতীয় প্রতিশোধ গ্রহণের ভিত্তিতে কর্মটি রচিত হইয়াছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপে যুদ্ধোত্তর কালের পটভূমি বিক্ষোভের পটভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিক্ষোভ ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করা সম্ভব ছিল না।

সোভিয়েট, ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী

এই পটভূমিকায় তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য : ১. সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ভাব, ২. ফ্যাসিস্ট ইটালীর উদ্ভব এবং ৩. জার্মান নাৎসীবাদের সৃষ্টি। সোভিয়েত

রাশিয়াকে সর্বদা বিক্ষোভের উৎস বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে তাহাকে আর সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা চলে না। যে পর্যন্ত কমিউনিস্ট রাশিয়ার সম্মুখে বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ ছিল, সে পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া নিশ্চয়ই বিশ্ব-বিক্ষোভের উৎস ছিল। কিন্তু লেনিনের তিরোধানের পর হইতে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন হইয়াছে। বিশ্ববিপ্লবের ধারণাকে কার্যত মুলতবী রাখিয়া রুশেরা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ নিজেদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্টালিন এবং তাঁহার সমর্থকগণ রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অভিযান চালাইয়াছেন যাহাতে তাঁহারা অন্যান্য দেশকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। আমাদের এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে গত দুই বৎসর সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপে অস্থিরতার উৎসরূপে কাজ করে নাই। ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতায় আসায় ইটালী তাহার জাতীয় ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমত ইটালীয়রা ইটালীর সীমান্তের উপর নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তাঁহারা কোন্ দিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করিবেন সে বিষয়ে মন স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিভিন্ন দিকে এ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ফ্রান্সে ও করফুতে। ফ্রান্স ও ইটালীর সন্ধির পর ইটালী দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত লইয়াছিল; ফ্রান্স তাহাকে এ স্বাধীনতা দিতে সম্মত হইয়াছিল। ইটালী ভূমধ্যসাগরীয় শক্তি হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। মধ্য ইউরোপে তাহার সম্প্রসারণ ছিল গৌণ লক্ষ্য। ইটালী যখন একবার মধ্য ইউরোপে নিজের স্বার্থকে গৌণ করিয়া তুলিয়াছিল এবং আফ্রিকায় সম্প্রসারণের দিকে তাহার সকল শক্তি একত্রিত করিয়াছিল, তখন জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ ইটালীকে স্বাভাবিকভাবে বৃটিশ স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন করিয়াছিল। সেইজন্য আমরা ইঙ্গ-ইটালীয় উত্তেজনার কথা শুনি। ইটালী যতদিন তাহার আফ্রিকায় আত্মসম্প্রসারণের বর্তমান নীতিতে বিশ্বাস করিবে ততদিন ইংল্যান্ড ও ইটালীর মধ্যে কোনো শান্তি স্থাপিত হইবে না।

জার্মানীর লক্ষ্য

জার্মান রাজনীতিবিদ্‌গণের লক্ষ্য হইল পূর্বদিকে অগ্রগতি। জার্মানীর লক্ষ্য হইল চেকোস্লোভাকিয়া এবং পরে দক্ষিণ রাশিয়া। তাহার পূর্বে তাহাকে জার্মান

ভাষাভাষী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই ঐক্য সৃষ্টির বিরোধিতা করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও নাৎসী প্রচারের জোরে বিনা রক্তপাতে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল। সুদেতেন জার্মানদের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিপদ দেখা দিয়াছে। আজ প্রতিটি চেক্ মনে করেন যে তিনি আগ্নেয়-গিরির উপর বসিয়া আছেন। ইহাই অব্যবহিত সমস্যা। নাৎসীরাও ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল অন্য কিছুর জন্য দরকষাকষি করা।

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতিবিদেরা নিজেদের মন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বৃটেনের স্বার্থ ইউরোপ অপেক্ষা এশিয়ায় বৃহত্তর। ফ্রান্স ইউরোপীয় শক্তি বলিয়া সে জার্মানীকে দক্ষিণ রাশিয়া, পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে যাহা খুশি করার স্বাধীনতা দিতে পারে না। কারণ সে ভয় পায় যে তাহা হইলে জার্মানরা ইউরোপে শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিবে। তাহার অর্থ হইল ইউরোপে ফরাসী আধিপত্যের অবসানের সূচনা। ইটালী ইতি-পূর্বে আবিসিনিয়ায় একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়া যুদ্ধ বাধাইবে না। স্পেনে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিয়াছে। ইহা দুইটি আদর্শবাদের মধ্যে যুদ্ধ। অন্যদের কেন ইহার সহিত জড়াইয়া ফেলা হইয়াছে? ইহার কারণ, যে জিব্রাল্টার ভূমধ্যসাগরের চাবিকাঠি স্বরূপ তাহা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এবং ইটালী সেখানে প্রভুত্ব চায়। কাজেই সে ফ্রান্সের দক্ষিণে পা রাখিবার জায়গা পাইবার উদ্দেশ্যে স্পেনের যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। কিন্তু জার্মানী কেন? গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে তাহার নৌবাহিনীকে ব্যাহত করা হইয়াছিল এবং তাহার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। সে যদি স্পেনের দক্ষিণে পা রাখিবার জায়গা পায় তাহা হইলে সেও অনুরূপভাবে ভাবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নৌ-বাহিনীকে ব্যাহত করিতে পারিবে এবং তাহাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

ইউরোপে যাহা ঘটে ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া হয়। ইহা যত শীঘ্র আমরা অনুধাবন করি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আমরা যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনুসরণ করি তাহা হইলে আমরা অতীত অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সহিত ভবিষ্যতে আমাদের গতি পরিচালিত করিতে পারিব।

১৭ আগস্ট ১৯৩৮

জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনায় ড. মেঘনাদ সাহার ভাষণের উত্তর।

ভারতীয় মুক্তির আন্দোলন এমন একটা স্তরে পেঁছিয়াছে যখন স্বরাজ আর স্বপ্ন নয়— দূর ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপায়িত করিবার আদর্শ নয়। পক্ষান্তরে ক্ষমতা এখন আমাদের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে। ব্রিটিশ-ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশ এখন কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির অধীনে। যদিও এই-সব সরকারের ক্ষমতা সীমিত, তবু তাঁহারা নিজেদের সীমানার মধ্যে পুনর্গঠনের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হইতেছে। আমরা কিভাবে এই-সব সমস্যার সমাধান করিব? আমরা সর্বাগ্রে এই কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

আমি এই অভিমত সর্বদা পোষণ করিয়াছি এবং হরিপুরা-কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সে কথা আমি বলিয়াছিলাম যে স্বাধীনতার জন্য যে দল সংগ্রাম করে, ক্ষমতা অর্জনের পর সে দল আত্মবিলয় করিতে পারে না। সেই দলের কর্তব্য হইবে সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনের কাজেরও দায়িত্ব গ্রহণ। সুতরাং অদ্যকার কংগ্রেসসেবিগণ স্বাধীনতা সংগ্রামেই শুধুমাত্র নিয়োজিত থাকিবে না, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের চিন্তা ও উদ্যোগের একাংশ জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যার দিকেও নিয়োগ করিতে হইবে। আর জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব হইবে কেবল বিজ্ঞান ও আমাদের বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায়।

পুনর্গঠনের সমস্যা

আমি কি আপনাদের অনুমতি লইয়া জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যা সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি? আমরা আজকাল প্রায়ই এই দেশে শিল্পগত পুনরুজ্জীবনের জন্য পরিকল্পনার কথা শুনি। এই প্রদেশের একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী সম্প্রতি বাংলার পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি কি এ কথা বলিতে পারি যে সমস্যাটি শিল্পগত পুনরুজ্জীবনের নয়, ইহা শিল্পায়নের সমস্যা? ভারত এখনো প্রাক্‌-শিল্প-বিপ্লবের পর্যায়ে রহিয়াছে। আমরা শিল্প-বিপ্লবের যন্ত্রণার মধ্য দিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পুনর্গঠন কিংবা পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন উঠে না। আমরা

ইহা পছন্দ করি বা না-কার, আধুনিক ইতিহাসে বর্তমান যুগ যে শিল্পের যুগ-এই ধারণার সহিত আমাদেরও খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। শিল্প-বিপ্লবের হাত হইতে মুক্তি নাই। আমরা সর্বোত্তম যাহা করিতে পারি তাহা হইল এই বিপ্লব অর্থাৎ শিল্পায়ন এদেশে ব্রিটেনের মতো তুলনামূলকভাবে ক্রমিক হইবে কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ার মতো জবরদস্তি করিয়া অগ্রগতি হইবে তাহা স্থির করিতে পারি।

আমার এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে যখন আমরা সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় সরকার গঠন করিব তখন আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ হইবে সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করা। বস্তুত সাতটি প্রদেশে আমাদের মন্ত্রীসভাগুলি ইতিমধ্যে একটি এক রকমের শিল্পনীতি ও কর্মসূচীর প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। ইহা পূর্বে অনুমান করিতে পারিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি ক্ষমতায় আসার পরে পরেই, এক বৎসর আগে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন যে শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে কংগ্রেস সরকারগুলিকে পরামর্শদানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ প্রয়োজন। আমার সভাপতিত্বে ১৯৩৮-এর মে মাসে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে এই অভিমত সমর্থিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রশ্নটি অনবরত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে রহিয়াছে এবং জুলাই মাসে ইহার শেষ অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমার উচিত সাতটি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের শিল্প-মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা। আমি এই-সব তথ্য উপস্থাপিত করিতেছি এই কারণে যে, পূর্ণ স্বরাজের অভ্যুদয়ের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হইতেছি।

বৃহৎ ভিত্তির পরিকল্পনা

যদিও আমি কুটির-শিল্প বর্জনের পক্ষে নহি এবং যদিও আমি বলিয়াছি যে যেখানে সম্ভব কুটির-শিল্পগুলিকে রক্ষার ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্যও সর্ব-প্রকার প্রয়াস করিতে হইবে, তবু আমার অভিমত এই যে ভারতের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তাৎপর্য বহুলাংশে হওয়া উচিত সারা দেশের জন্য শিল্পায়ন পরি-কল্পনা রচনা। আর আপনারা এ বিষয়ে একমত হইবেন যে স্যার জন অ্যান্ডার্সন যেমন আমাদের বিশ্বাস করাইতে চান, তেমন ভাবে শিল্পায়নের অর্থ ছাতার বাঁট ও কাঁসার থালা তৈয়ারি করা নয়।

আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি যে আপনাদের সাময়িক পত্র 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' দেশের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাকে শিল্পায়নের সমস্যার দিকে নিবদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী-পদার্থ-বিদ্যা, জাতীয় গবেষণা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলি বিশেষ আলোকসম্পাতকারী ও শিক্ষাপ্রদ।

পরিকল্পনার নীতি

১. যদিও শিল্পগত দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথিবী একটি একক, তৎসত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে, বিশেষ করিয়া আমাদের প্রধান প্রয়োজন গুলির ক্ষেত্রে।

২. মৌলিক শিল্পগুলির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত, যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ধাতব উৎপাদন, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতিকরণ, অত্যাবশ্যক রাসায়নিক উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগ শিল্প প্রভৃতি ।

৩. আমাদের কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি গবেষণার সমস্যারও সম্মুখীন হইতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসঙ্গে ইহা সর্ববাদীসম্মতভাবে স্বীকৃত হইবে যে জাপানী ছাত্রদের মতো আমাদের ছাত্রগণকে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো উচিত যাহাতে তাঁহারা ভারতে ফিরিয়াই সরাসরি নূতন শিল্প গড়ার কাজে অগ্রসর হইতে পারেন।

কারিগরি গবেষণা

কারিগরি গবেষণা প্রসঙ্গে আমরা সকলেই একমত হইব যে ইহা সর্বপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। একমাত্র এই হতভাগ্য দেশেই রাজকীয় বেতনের বিনিময়ে সরকারী চাকুরিয়াদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এই ব্যবস্থার ফল কি হইয়াছে তাহা আমরা খুব ভালোভাবে জানি।

৪. জাতীয় পরিকল্পনার দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিল্পগত পরিস্থিতির অর্থ-নৈতিক সমীক্ষা হওয়া উচিত।

৫. শেষ হইলেও তাহা যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাহা হইল এই যে একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা পরিষদ থাকা উচিত।

শিল্পায়ন ও জাতীয় পুনর্গঠন সমস্যা সম্বন্ধে এইগুলিই হইল সংক্ষেপে

আমার কিছু ধারণা এবং আমি বিশ্বাস করি, যে এই ধারণাগুলি এই দেশে বৈজ্ঞানিক নরনারীরাও পোষণ করিয়া থাকেন। আমরা যাহারা প্রায়োগিক রাজনীতিবিদ্, আপনারা যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদের নিকট হইতে ভাবগত সহায়তা চাই। আমাদের দিক হইতে আমরা এই-সকল ভাবধারা প্রচার করিতে পারি এবং যখন শক্তির দুর্গ চূড়ান্তভাবে দখলে আসিবে, তখন আমরা এই-সব ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিতে সহায়তা করিতে পারিব। যাহা প্রয়োজন তাহা হইল বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সহযোগিতা।

শিল্পায়ন সম্পর্কে কংগ্রেসকর্মীরা ঐক্যমত নন

সত্য কথা বলিতে গেলে আমার বলা উচিত যে শিল্পায়ন সম্পর্কিত সমস্যায় সব কংগ্রেস কর্মী একমতাবলম্বী নন। কিন্তু অত্যুক্তি না করিয়া আমি হয়তো বলিতে পারি যে এ ব্যাপারে কংগ্রেস কর্মীদের তরুণতর প্রজন্ম যতটা সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের চিন্তাভাবনা শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা বিভিন্ন কারণে শিল্পায়নে বিশ্বাস করি। প্রথমত, আমরা শিল্পায়ন ছাড়া বেকারদের সমস্যার যথোচিত সমাধানের কথা চিন্তা করিতে পারি না। যদিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে এবং সম্ভব হইবে, তবু তাহা আমাদের জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না।

আমরা যদি অন্যান্য দেশের কৃষিকার্যে ও শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার তুলনা করি তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে আমরা যদি সত্যই সমগ্র জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশকে জমি হইতে শিল্পে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। আমাদের শিল্পায়নে বিশ্বাসের আর-একটি কারণও আছে। তাহা হইল এইরূপ। রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিচারে তরুণতর প্রজন্ম সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করিতেছেন। হয়তো তাঁহারা কোন-ধরনের সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী সে সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে সংশয় নাই যে তাঁহারা সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করেন সে সমাজতন্ত্রের ধরন যাহাই হউক-না কেন। এই চিন্তাভাবনায় একটি সাধারণ উপাদান এই যে শিল্পায়ন ছাড়া সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়।

একটি প্রয়োজনীয় অভিশাপ

এই দেশের তরুণতর প্রজন্মের চিন্তাভাবনা শিল্পায়নের প্রয়োজনের দিকে পরিচালিত করার পক্ষে আর-একটি যুক্তিও আছে। শিল্পায়ন অভিশাপ হইতে

পারে— ইহাই সাধারণ অভিমত, কিন্তু এই অভিশাপের হাত এড়াইবার উপায় নাই। ভালোর জন্যই হউক কিংবা মন্দর জন্যই হউক, জাতীয় সীমানা ও বাধা ভাঙিয়া পড়িতেছে। এবং সমগ্র পৃথিবী একটি অর্থনৈতিক একক হইয়া উঠিতেছে। আমরা যদি আত্মসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে নিজের শিল্পায়নের দ্বারা বিদেশের শিল্পায়নের বিপদের মুখোমুখি হইতে হইবে।

এই-সব যুক্তি তরুণতর প্রজন্মের অনেক সদস্যের মনে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে যে শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে ভবিষ্যৎ ভারতের কথা চিন্তা করিতে হইবে।

ভারতের মূলগত ঐক্যের প্রশ্নে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে আমরা যদি এখন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ না করি তাহা হইলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিলেও তুরস্কের পদ্ধতিতে না হইয়া চীনের পদ্ধতিতে আমাদের অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে আমরা বিদেশীদের সমস্যার সমাধান করিলেও নিজেদের সমস্যার সমাধান লাভ করিয়া উঠিতে পারি।

আমরা যাঁহারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য তাঁহারা দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত। আমরা বিশ্বাস করি যে যখন ভারত স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে একটি একক ও একটি জাতি হিসাবে আমরা যদি ধরিয়া রাখিতে চাই তাহা হইলে একমাত্র একটি সর্বভারতীয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমেই তাহা করা সম্ভব।

রাশিয়ায় ঐক্যসাধনে বলশেভিক দল যে ভূমিকা নিয়াছে তাহা আমরা ভালোভাবে জানি, জার্মানীতে নাৎসীরা অন্য ভাবে যে ভূমিকা লইয়াছে তাহা আমরা জানি, ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে অন্য পদ্ধতিতে ফ্যাসিস্ট দল যে ভূমিকা নিয়াছে তাহাও আমরা জানি এবং তুরস্ককে একীকরণের ব্যাপারে তরুণ তুর্কীদল যেভাবে তাহাদের ভূমিকা পালন করিয়াছে তাহাও আমরা জানি। সুতরাং আমাদের একমাত্র আশা হইল ভারতে কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার জন্য শিল্পায়ন। অবশ্য 'জাতীয় ভাষা', জাতীয় পোশাক ও জাতীয় খাদ্যের সমস্যা-গুলিও আছে। আমাদিগকে এগুলির সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু মৌলিক সমস্যা হইল মনস্তাত্ত্বিক। অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে আমাদের জনগণকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হইতে পারে।

স্বায়ত্তশাসনের অভিশাপ

ভারত সরকারের আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে পরিকল্পনা আছে তাহার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার মধ্যে একটি হইল এই যে, ইহা ভারতে বর্তমান বিচ্ছেদের প্রবণতা বৃদ্ধি করার জন্য অভিপ্রেত। আমরা ইতিমধ্যে বিহারে বিহারী-বাঙালী বিতর্ক এবং মধ্যপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়-হিন্দুস্থানী বিতর্কের উদ্ভব হইতে দেখিতেছি। এই বিতর্কের বীজ প্রথম হইতে ভারত সরকারের আইনে নিহিত ছিল। আমরা এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম এবং আমরা ইহার সম্মুখীন হইবার চেষ্টা করিতেছি। আপনারা সকলে মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা জানেন এবং আমাদের নিজেদের দলে যে বিভেদ দেখা গিয়াছিল তাহা নিবারণের যে চেষ্টা আমরা করিয়াছিলাম তাহাও আপনারা জানেন। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের জনগণের মধ্যে জাতীয় ইচ্ছা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের পক্ষে জাতীয় পোশাক ও এক জাতীয় খাদ্য প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যার সমাধান তুলনামূলকভাবে সহজে করা সম্ভব হইবে।

জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি যে সহজ হিন্দুস্থানী এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে এবং যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা আছে সেখানে জনগণের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। অন্যান্য জিনিসও আছে এবং অধ্যাপক সাহার প্রশ্নের জবাবে আমি যাহা-কিছু বলিতে চাই তাহা এই যে আমাদের উপর যে দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং আমাদের সর্বাধিক ক্ষমতা অনুসারে আমরা সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এখানেও বৈজ্ঞানিকগণ ও বিজ্ঞান আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন, তাঁহারা ভারতের সমস্যা সমাধান ও ভারতীয় ঐক্যসম্পন্ন করার জন্য আমাদিগকে নূতন ধ্যান-ধারণা দিতে পারেন।

২১ আগস্ট ১৯৩৮

আসাম ও বাংলায় প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার কুমারটুলি পার্কে জনসভায় ভাষণ।

আমার যাহা মনে হয় তাহা এই যে আসাম ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা আছে। বাংলা এই প্রদেশগুলির অন্যতম এবং সেখানেও একটি এই ধরনের মন্ত্রীসভা কর্মরত। যে বাংলা চিরদিন জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়াছে সেই বাংলাতেই আজ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন। কিন্তু কেন এইরূপ হইয়াছে? আমাদিগকে যদি এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাহা হইলে কেন এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা আজও বাংলায় ক্ষমতাসীন তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের অনেক কিছু বলিতে হয়। বহু জটিল ও অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশের দরুন এখনো এরূপ মন্ত্রীসভা বাংলায় নিজেকে ক্ষমতায় রাখিতে পারিয়াছে। এই প্রদেশে এই মন্ত্রীসভা কিভাবে নিজেকে ক্ষমতায় রাখিয়াছে তাহা বাংলার কোনো ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাত নয়। কিছুদিন পূর্বে যখন আইন-সভায় বাংলার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচিত হইতেছিল তখন কংগ্রেস-বিরোধী বহু অসত্য ও বিকৃত তথ্য-সংবলিত একটি পুস্তিকা বহু সংখ্যায় দরাজ হাতে বিলি করিয়া মন্ত্রীসভার সমর্থনে একটি কৃত্রিম বিক্ষোভ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। জনগণের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কাছে আবেদন জানাইয়া এই মন্ত্রীসভা কতদিন টিঁকিয়া থাকার প্রত্যাশা করেন তাহা জানিবার ইচ্ছা করে। তাঁহারা যে ভবিষ্যতে চিরদিনের মতো বাংলার জনগণকে ধোঁকা দিতে পারিবেন না— মন্ত্রীসভা ইহা জানেন কিনা জানি না। কৃত্রিমভাবে সঞ্জাত এইরূপে বিক্ষোভ মন্ত্রীসভার অন্তর্নিহিত দুর্বলতারই পরিচায়ক। আমি বিশ্বাস করি যে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, বাংলার জনগণ আর দীর্ঘ-দিন ধরিয়া মিথ্যা ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের দ্বারা নিজদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দিবেন না, কেননা যাঁহারা সত্য ও ন্যায়ের ধারক তাঁহারাই শুধু জনগণের আস্থা অব্যাহতভাবে ভোগ করার প্রত্যাশা করিতে পারেন। আমার সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গ সফরের সময় এই মন্ত্রীসভাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য মিথ্যা প্রচারের কিছু অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করিয়াছিলাম।

যখন এই মন্ত্রীসভা প্রথম বাংলায় ক্ষমতাসীন হইয়াছিল তখন আইন-সভার বিরোধীদলের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ এবং বিরোধী দলের সকলেই ছিলেন কংগ্রেসসেবী। আর আজ আইন-সভায় বিরোধীদের সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে

১১১। এত লোক কেন কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন ? ক্ষমতাসীন দলের হাতে আছে অর্থ ও সম্পদ এবং সে দল আনুকূল্যও বিতরণ করিতে পারে। কিন্তু তবু দিনের পর দিন বিরোধী দলের শক্তি বাড়িতেছে কেন ? কেন এই মন্ত্রসভার ভাগ্য দোদুল্যমান ? উত্তর সহজ। যেখানে কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে জনগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে কিছু পরিমাণে ভালো কাজ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে জনমানসে কিছুটা সন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে এই মন্ত্রীসভা এই প্রদেশের জনগণের কল্যাণকর গঠনমূলক কোনো কাজ করিতে এ-পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রীসভা যদি এইরূপ কৃতিত্ব দাবি করিতে পারিতেন তাহা হইলে বিরোধী দলের শক্তি ৫৩ হইতে বাড়িয়া এখন ১১১ হইতে পারিত না।

পতন অবশ্যম্ভাবী

বাংলার বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি ইতিপূর্বে আর-একটি জনসভায় বলিয়াছিলাম যে ইহা কোনো সমস্যাই নয়. কেননা এ মন্ত্রী-সভার পতন হইতে বাধ্য। আমি আজও তাহারই পুনরাবৃত্তি করি। মাত্র একটি উপায়ে এ মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারেন এবং তাহা হইল মন্ত্রীদের সংখ্যা ১৩৩ জনে বৃদ্ধি করিয়া।

আমি ইহাও ঘোষণা করিতে চাই যে বর্তমান মন্ত্রীসভার পতনের পর বাংলায় যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে তাহাতে কংগ্রেসসেবীরা থাকুন বা না থাকুন তাহাতে এমন সব লোক রাখিতে হইবে যাঁহারা এই প্রদেশের জনগণের স্বার্থ সম্প্রসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জনগণের প্রকৃত সেবক। এইরূপ মন্ত্রীসভার প্রধান-মন্ত্রী হইবেন একজন মুসলমান এবং এ মন্ত্রীসভা পুরাপুরি মুসলমানদের দ্বারা গঠিত হইলেও আমাদের আপত্তি হইবে না অবশ্য যদি তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প, অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ মানুষ হন এবং জনগণের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতিকে কার্যে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন।

একটি সাবধানবাণী

এই প্রসঙ্গে বাংলার জনগণকে বর্তমান পরিস্থিতির একটা কলঙ্কজনক দিকও লক্ষ করিতে হইবে। ইহাতে আমার মাথা লজ্জায় অবনত হইয়া যায় এবং আমার বিশ্বাস যে এই প্রদেশের জনগণও আমার এ অনুভূতির অংশীদার। যখন দেখি যে এমন-কি কংগ্রেসের মধ্যেও এমন লোক আছেন যাঁহারা বাংলার বর্তমান মন্ত্রী-

সভার পতন চান না— তখন লজ্জায় মাথা নত হয়। ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যখন আইন-সভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। এই বিপদের কথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে স্যার জন অ্যান্ডার্সনের আমলে বাংলা ভয়াবহ নির্যাতনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতনে ভুগিয়াছিল মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম। মেদিনীপুরে জনগণ এমন-কি নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতেও ভয় পাইতেন। কিন্তু আমি ইহা দেখিয়া আনন্দিত যে বর্তমানে এই দুইটি জেলার জনগণের মন হইতে ভীতি ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের ভাব কাটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের মনে আবার পূর্বেকার আস্থা ও আশা সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাহা দেখিয়া শঙ্কিত তাহা হইল এই যে কংগ্রেসের মধ্যে ও একদল লোকের মনে এমন ভাবের সংস্কার হইতেছে তাহাকে কোনোক্রমেই প্রগতিশীল বলা যায় না। দেশ এখন ভালো বুঝিতে পারিতেছে যে বর্তমানে জাতীয় আন্দোলন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যখন কংগ্রেসসেবীদের আর শুধু অতীতের সেবা ও লাঞ্ছনা-ভোগের রেকর্ড লইয়া অহংকার করিলে চলিবে না। এই ধরনের লোকদের এখন বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা যদি প্রগতিশীল না হন এবং যদি যুগের সহিত তাল মিলাইয়া না চলিতে পারেন তাহা হইলে দেশ তাঁহাদের সহ্য করিবে না। তাঁহারা যদি অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকান তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ভারতীয় জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকের ভাগ্যেও কী ঘটিয়াছিল। যুগধর্মের সহিত তাল রাখিয়া না চলিতে পারার দরুন সুরেন্দ্রনাথের মতো বিরাট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা যদি ঘটিয়া থাকিতে পারে, তবে অনুরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদের পরিণতি কী হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

এখনও যাঁহারা দুই দিকে মুখ করিয়া চলার প্রয়াস করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণের সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে যখন আমাদের স্পষ্ট করিয়া এই-সব লোককে বলিতে হইবে: 'আপনারা একসঙ্গে দুই প্রভুর সেবা করিতে পারেন না'। সময় আসিয়াছে যখন এই-সব লোককে দেশের সেবা এবং প্রগতিশীল শক্তির সহিত মিলন— এই দুইটি পথের একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমি স্যার হরিশংকর পাল ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কার্য-কলাপের উল্লেখ করিতে চাই।

স্যার হরিশংকর পালকে একটি পথ বাছিয়া লইতে বলিতে হইবে। একই

সঙ্গে মন্ত্রীসভা, ইউরোপীয় সমিতি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দেশসেবার দাবি করা— 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এ খেলাও চলিবে না। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দীর্ঘকাল ধরিয়া এই নীতি চালাইয়া আসিয়াছে কিন্তু দেশ আর ইহা সহ্য করিতে রাজি নয়। এই প্রসঙ্গে 'ব্যক্তিগত আক্রোশে'র কথা উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত উপাদান কোথায়?

রাজনীতির সর্বাধিক প্রাথমিক নীতি এই যে 'যিনি আমাদের সঙ্গে নন তিনি আমাদের বিরোধী' এবং আমরা এই নীতি ভুলিতে পারি না। ইহা ব্যক্তি লইয়া বিরোধ নয়— নীতি লইয়া বিরোধ। জাতীয় আন্দোলন এখন এমন একটা পর্যায়ে উপনীত যখন যাঁহারা প্রগতিশীল হইতে পারিবেন না এবং যাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সমঝোতা রাখিয়া চলিবেন তাঁহাদিগকে জনগণ কোনো প্রকারে সহ্য করিবেন না। যতই বেদনাদায়ক হউক-না কেন যাঁহারা প্রগতির লক্ষ্যে আমাদের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ বলিয়া প্রমাণিত হইবেন তাঁহাদিগকে আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল হইতে 'ঐক্যের নামে একটা মিথ্যা আওয়াজ উঠিয়াছে। কিন্তু কাহার সহিত ঐক্য? প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য কী করিয়া সম্ভব? সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব কে কমাইতে পারে? কিন্তু যাঁহারা যুগধর্মের সহিত চলিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যের কথা আমরা কোনোক্রমেই কল্পনা করিতে পারি না। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না যাইবার জন্য পৌনঃপুনিক অনুরোধ সত্ত্বেও মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের পর স্যার হরিশংকর পাল মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেন কী করিয়া? আমার ব্যক্তিগত অনুরোধেও স্যার হরিশংকর কান দেন নাই। স্যার হরিশঙ্করের উপর যাঁহাদের কিছু প্রভাব আছে তাঁহাদিগকে আমি এই প্রভাব বিস্তার করিতে অনুরোধ করি এবং তিনি যাহাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সংযোগ না রাখেন সে ব্যবস্থা তাঁহারা করুন। কিন্তু স্যার হরিশঙ্করকে এই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও তিনি যদি বর্তমান মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ না করেন তাহা হইলে আমরা নিরুপায় এবং তাঁহাকে আমাদের বর্জন করিতে হইবে।

নিজেদের এখানকার কুকীর্তির পাপ ক্ষালনের জন্য কিছু লোকের ওয়ার্ধার নিকটবর্তী একটি স্থানে রাজনৈতিক তীর্থযাত্রায় যাওয়া একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই ধরনের লোকদের নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে তাঁহারা যদি

ভাবিয়া থাকেন যে অন্যত্র অন্যায় ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কুকীর্তির দরুন নিন্দা এড়াইতে পারিবেন তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। আমি যতদিন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিব ততদিন অন্তত এই-সব কলা-কৌশলে কোনো কাজ হইবে না।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

আসামে নতুন মন্ত্রীসভা

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক প্রচারিত বিবৃতি।

এ মাসের ১৩ তারিখে সাদুল্লা মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন এবং সেইদিন সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ পাইয়া কংগ্রেস আইন-সভা দলের নেতা শ্রীগোপীনাথ বরদোলই মহামান্য গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীবরদোলইকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলা হইলে তিনি তাহা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সময় চাহিয়াছিলেন, কেননা তিনি বিশেষ করিয়া এ ব্যাপারে কংগ্রেস সংসদীয় সাব-কমিটির সহিত পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন। এ মাসের ১৭ তারিখ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটের সময় শ্রীবরদোলই গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যদের পাঁচটি নাম পেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবরদোলইকে জানাইয়াছিলেন যে এ মাসের ১৯ তারিখ সোমবার হয় সকালে নয়তো বিকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

১৭ তারিখ সন্ধ্যায় সেই মুহূর্ত পর্যন্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আমি একটি যুগ্ম-বিবৃতি দিয়াছিলাম। এই বিবৃতির সংগে আমার একটি ছোটো বিবৃতি পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ১৮ তারিখ মুদ্রিত হইয়া শিলং-এ বিতরিত হইয়াছিল। এই পরবর্তী বিবৃতিতে আমি বলিয়াছিলাম যে শ্রীবরদোলই-এর পেশ করা নামগুলি গভর্নর-কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং এই মাসের ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

যদৃচ্ছ গুজব

এই কারণে আমি এই বিবৃতি দিয়াছিলাম যে শহরে এই মর্মে যদৃচ্ছ গুজব রটানো হইয়াছিল যে শ্রীবরদোলই-এর পেশ-করা নামগুলি গভর্নর গ্রহণ করেন

নাই এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে আমার শিলং-এ আসার পর হইতে কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি এই মর্মে অবিচ্ছিন্নভাবে গুজব রটাইয়া যাইতেছে যে কংগ্রেস দল ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং আবার সাদুল্লা মন্ত্রীসভাকে ক্ষমতাসীন করা হইবে। কংগ্রেস কোয়ালিশন দলে যোগ দিতে আগ্রহী বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে এরূপ কয়েকজন আইন-সভা সদস্যকে কড়া পাহারায় রাখা হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া ভীতি প্রদর্শনও চলিতেছে। যাঁহারা কংগ্রেস কোয়া-লিশন দলে যোগ দিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গত কয়েক দিন ধরিয়া শিলং-এ বহু সংখ্যক বাহিরের লোক আমদানি করা হইয়াছে। এই বহিরাগতদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্পীকার এবং সরকারী কর্মচারীদের কাছে অভিযোগও করা হইয়াছে।

গতকাল বিকালে কয়েকজন মুসলমান আইন-সভা সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মুদ্রিত একটি প্রচারপত্র শিলং-এ বিতরিত হইয়াছিল। গভর্নর শ্রীবরদোলই কর্তৃক পেশ করা মন্ত্রীদের নামগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মাসের ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ হইবে— আমার এই ঘোষণা এই প্রচারপত্রে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। এই ছাপানো প্রচারপত্র দেখিয়া শ্রীবরদোলই ইহার একটি গভর্নরকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াও জানাইয়াছেন যে গভর্নর ১৭ তারিখে তাঁহার পেশ-করা নামগুলি অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং গভর্নর তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে সোমবার ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ হইবে। শ্রীবরদোলই এ-বিষয়ে গভর্নমেন্টের নিকট হইতে সমর্থন দাবি করিয়াছেন। গভর্নরের নিকট হইতে কোনো উত্তর আসে নাই; কিন্তু আজ সকালে বেলা প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটের সময় লাটভবনে শ্রীবরদোলইকে আহ্বান করা হইয়াছিল এবং গভর্নর তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার নামগুলি অনুমোদিত হইয়াছে ও বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে নূতন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ হইবে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তি

আজ বেলা ১১টার সময় স্পীকার শ্রী বি. কে. দাসের সভাপতিত্বে আইন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু অধিবেশনের আগে একটি 'অতিরিক্ত গেজেট' (গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারী) প্রচার করিয়া তাহাতে বলা হইয়াছিল যে "মহামান্য গভর্নর ১৯৩৮-এর ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীতে শ্রীগোপীনাথ বরদোলই,

শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস, শ্রীরামনাথ দাস, শ্রীকামিনীকুমার সেন ও শ্রীরূপনাথ ব্রহ্মকে সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই ভদ্রলোকেরা আজ অপরাহ্ন ১২টা ৩০ মিনিটে শপথ গ্রহণ করিবেন এবং তাহার পর নিজেদের কর্তব্যের দায়ভার গ্রহণ করিবেন।”

একই সংগে দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া কিছু সংখ্যক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইয়াছে।

আজ যখন বেলা ১১টার সময় আইন-সভার অধিবেশন বসিয়াছিল তখন মাননীয় স্পীকার কংগ্রেস দলের নেতার নিকট হইতে বর্তমান পরিস্থিতি জানিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীবরদোলই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন এবং আরো বলিয়াছিলেন যে নূতন সরকার প্রশ্ন, বিল ও প্রস্তাবের ব্যাপারে ভূতপূর্ব সরকারের নীতি মানিবেন না এবং তাঁহারা আইন সভার-তালিকাভুক্ত কার্য আরম্ভ করার পূর্বে স্থিতিলাভ করিতে ও নীতি প্রভৃতি প্রণয়ন করিতে চান। সেইজন্য তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি জানান। ইহা লইয়া আলোচনার শেষে স্পীকার ঘোষণা করেন যে এই সভার অধিকার-রক্ষক হিসাবে তিনি সভার কার্য মুলতুবি রাখিতে চান। তাঁহার পক্ষে সর্বোত্তম উপায় হইল অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতুবি রাখা। তিনি পরে প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া দিন স্থির করিবেন এবং আইন-সভার কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু গভর্নর যদি সভা স্থগিত রাখার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সভার বর্তমান কার্যতালিকা অর্থহীন হইয়া পড়িবে এবং ইহা মহামান্য গভর্নরের এক্তিয়ারভুক্ত ব্যাপার।

বরদোলই-গভর্নর সাক্ষাৎকার

তাঁহাদের যথাস্থানে পৌঁছিবার পর তাঁহাদিগকে জানানো হয় যে গভর্নরের আসিতে বিলম্ব হইবে। কয়েক মিনিট পরে তাঁহাদিগকে মুখ্য সচিব জানান যে গভর্নর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিয়াছেন এবং তিনি শ্রীবরদোলইকে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। শ্রীবরদোলই তৎক্ষণাৎ গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আলোচনা প্রসংগে গভর্নর স্পীকার-কর্তৃক আইন-সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবরদোলই বলিয়াছিলেন যে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইবার কর্তা তো

স্পীকার। গভর্নর আরো বলিয়াছিলেন যে স্পীকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত করিবার পূর্বে সাংবিধানিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান। যেভাবে মন্ত্রীগণের সহিত আচরণ করা হইয়াছে শ্রীবরদোলই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে সম্ভাব্য সকল দিক বিবেচনা করিয়া গভর্নরের শপথ গ্রহণের সময় নির্ধারিত করা উচিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে আইন-সভা মুলতুবি রাখার সঙ্গে শপথ গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নাই।

রাজকর্মচারীদের দুর্বোধ্য উদ্যোগ

লক্ষ্য করার দিক হইতে ইহা অত্যন্ত মজার ব্যাপার যে ইঁহাদের শপথ গ্রহণ স্থগিত থাকার পর গেজেটের যে অতিরিক্ত সংখ্যায় ভূতপূর্ব মন্ত্রিগণের পদত্যাগ গ্রহণের নির্দেশ ও নূতন ৫ জন মন্ত্রী নিয়োগের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সকল সংখ্যা এবং মন্ত্রীগণ-কর্তৃক পদ গ্রহণের অনুষ্ঠানের বিবরণমূলক বিজ্ঞপ্তির সকল সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করার জন্য স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ উন্মত্ত প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই-সব চমকপ্রদ ঘটনার পিছনে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ তাহা হইল এই যে আসামে কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন ব্যর্থ করার জন্য মুসলমান গোষ্ঠী ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তি আছে। এই গোষ্ঠীগুলি রবিবার একটি যুক্ত বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং সোমবার মুসলমান ও ইউরোপীয় আইন-সভা সদস্যগণ কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে প্রস্তাব অবশ্য মন্ত্রীগণ পদাভিষিক্ত হইবার পূর্বে আনীত বলিয়া বিধিবহির্ভূত বিষয় হিসাবে নাকচ হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া মুসলমান ও ইউরোপীয়— উভয় গোষ্ঠীর আইন-সভা সদস্যগণ গত কয়েকদিন ধরিয়া ঘন ঘন গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎকারে খুব বেশি ব্যস্ত আছেন।

এই-সব ঘটনায় গভর্নরের ভূমিকা সম্বন্ধে পরে আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন হইতে পারে। এই পর্যায়ে আমি শুধু ইহাই বলিব যে তাঁহার আচরণ গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং গভর্নর নিজের অবস্থা পরিষ্কার করিতে না পারা পর্যন্ত এই বিভ্রান্তি থাকিতে বাধ্য।

শিলং, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট প্রেরিত বিবৃতি।

শেষ পর্যন্ত আসামের মহামান্য গভর্নরের উপর সদ্‌বুদ্ধির প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে এবং গতকাল বেলা ২টা ৩০ মিনিটে নূতন মন্ত্রীসভার সদস্যগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীরূপে স্যার মহম্মদ সাদুল্লার পদত্যাগের ফলে এই নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। এই মাসের ১৩ তারিখে মাত্র স্যার সাদুল্লা বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দলের সংখ্যাশক্তি কমিয়া গিয়াছে এবং আইন-সভায় আর তাঁহার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। সুতরাং স্যার সাদুল্লার পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে কয়েকজন মুসলমান আইন-সভা-সদস্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিকৃত তথ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, বিরোধী দলের একটি মুসলমান গোষ্ঠী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি পদ-ত্যাগ করিলে মুসলমান সদস্যরা সকলেই তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবেন এবং তিনি তাহার ফলে পদত্যাগ করেন। এই মাসের ১৩ তারিখে মাত্র মহামান্য গভর্নর মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য বিরোধী দলের নেতাকে আহ্বান করিয়া সঠিক কাজ করিয়াছেন।

একটি ধাঁধা

স্বাভাবিক অবস্থায় বিরোধী গোষ্ঠীর মুসলমান আইন-সভা-সদস্যগণ মন্ত্রীসভা গঠনে বিরোধী দলের সহিত হাত মিলাইতেন। তাঁহারা কেন তাহা করেন নাই, কেন তাঁহারা স্যার সাদুল্লার মন্ত্রীসভার পতনের পর তাঁহার দিকে গিয়াছেন— ইহা একটি ধাঁধা বিশেষ এবং একমাত্র তাঁহারাই এ-ধাঁধার সমাধান করিতে পারেন। দেখা যায় যে সাদুল্লা মন্ত্রীসভার পতনের অব্যবহিত পরেই, চা-করদের প্রতিনিধি আইন-সভার ইউরোপীয় ব্লক কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে মুসলমান গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি চুক্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা গভর্নরের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছিলেন এবং একটা পর্যায়ে মনে হইয়াছিল যে তাঁহাদের উদ্যম সফল হইবে, কেননা ইহা ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা এ মাসের ১৯ তারিখের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্বে গভর্নর শ্রীযুক্ত বরদোলইকে বলিয়াছিলেন যে রাজার সরকার পরিচালনার জন্য ইউরোপীয় গোষ্ঠী রহিয়াছেন। এই উক্তির দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন করিবেন। শ্রীযুক্ত বরদোলই নিজের দলের প্রকৃত শক্তির কথা গভর্নরকে জানাইয়াছিলেন এবং তাহা শোনার পরও গভর্নর তাঁহাকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় গভর্নরের পরবর্তী চাল আমাদের সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। আমাকে যাহা সর্বাধিক বিস্মিত ও বেদনাহত করিয়াছিল তাহা হইল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মনোভাব। প্রথমেই নূতন মন্ত্রীসভা গঠন ব্যাহত করিতে তাঁহাদের সংকল্প কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভারতের আর কোথাও ইউরোপীয় ব্লক এরূপ অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আসাম আইন-সভায় ইউরোপীয় ব্লক যাহা করিতেছেন তাহার তাৎপর্য তাঁহারা বুঝেন কিনা আমি জানি না। আসামের কংগ্রেস দল আজ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত এবং এই দল চা-কর সমিতি-সহ সকল সংখ্যালঘুদের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণে ও ন্যায় বিচারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই দল আইন-সভার সকল গোষ্ঠীর প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

এই সদিচ্ছার পরেও যদি আসামের ইউরোপীয়গণ বিনা প্ররোচনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ফলাফলের পূর্ণ দায়িত্ব হইবে তাঁহাদের। আর এ-ব্যাপারে কংগ্রেস যতটা সংশ্লিষ্ট তাহাতে বন্ধুত্বের প্রস্তাব এরূপ অশালীনভাবে প্রত্যাখ্যাত হইলে কংগ্রেস যেরূপ সঠিকভাবে ইহার জবাব দেওয়া উচিত সেইরূপ জবাব দিবে। ইহা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবে এবং রাজকীয় মর্যাদায় যুদ্ধ করিবে। আসামের চা-কর সমিতি কী চান? আমি তাঁহাদিগকে ধীরভাবে চিন্তা করিতে বলি এবং তাঁহারা যেরূপ চান সমস্ত দেশের ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে তাঁহারা সেইরূপ কাজ করিতে বলুন। এখন ইউরোপীয় ও মুসলমান গোষ্ঠীগুলি যাহাই করুক-না কেন, আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবিশেষ আশাবাদী। নূতন মন্ত্রীসভা টিঁকিয়া থাকিবার জন্য গঠিত হইয়াছে এবং ইহার সম্মুখবর্তী অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও ইহা নিজের কৃতিত্বের উত্তম পরিচয় দিবে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

সমস্যার সমাধান

১৪ অক্টোবর ১৯৩৮ বোম্বে সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রসঙ্গে বক্তব্য।

আমি যদি লীগের সাম্প্রতিক প্রস্তাবের অর্থ বুঝিয়া থাকি, তবে তাহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, লীগ নিজেকে নিজে যে মর্যাদা দিয়াছে কংগ্রেস তাহা মানিয়া না নেওয়া পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় অগ্রসর হইতে ইহা ইচ্ছুক নয়। আমার জ্ঞান অনুসারে ১৯১৬ সালে যখন কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হইয়াছিল তখন লীগের কোনো বিশেষ মর্যাদা কংগ্রেসকে দিয়া স্বীকার করানোর কোনো প্রয়াস লীগ-কর্তৃক করা হয় নাই। মুসলিম লীগের পদমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন না তুলিয়া যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ আজ থাকিতে পারে, আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ সে-সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় অগ্রসর হইতে চান কিনা সে-সিদ্ধান্ত এখন তাঁহাদেরই করা উচিত। এ-ব্যাপারে আমরা যতটা সংশ্লিষ্ট, সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ ও ন্যায়সম্মত ব্যবহার করিয়া চলিব এবং কোনো বিভেদ থাকিলে কিংবা অতঃপর উদ্ভব হইলে সর্বদা তাহা আলোচনার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকিব। ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের কোনো কোনো সদস্যের প্রলাপোক্তি সত্ত্বেও আমরা এমন-কি বাঁধা পথের বাহিরে গিয়া বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছার হাত প্রসারিত করিয়া দিব। বন্যভাষা একমাত্র দুর্বলতার পরিচায়ক কিন্তু যাহারা তাহাদের শক্তি ও ন্যায়বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন তাহাদের জন্য বাক্‌সংযম ও কাজ অবশ্যকর্তব্য।

এই পর্যায়ে আমার পক্ষে কংগ্রেস কিংবা এমন-কি ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে বিবৃতি দেওয়া কঠিন। আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিতে পারি।

আমার নিজের মত এই যে, যদি বৃটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার একটা সমাধান চান, তবে কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠন যাহা সমস্যার সমাধান করিতে পারে—এইভাবে কংগ্রেসের সহিত আচরণ করার জন্য তাঁহাদের প্রথমে মনস্থির করিতে হইবে।

যদি আপনারা গোলটেবিল বৈঠক বলিতে সেন্ট জেমস্ প্যালেসে সমবেত সেই বিচিত্র জনতার কথা বুঝাইতে চান, তাহা হইলে আমি অন্তত এইরূপ সমাবেশে যোগ দিতে অস্বীকার করিব। আর পক্ষান্তরে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বারা যদি আপনারা বৃটিশ প্রতিনিধিদের ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের

সম্মেলন বুঝেন, তাহা হইলে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা কেন এরূপ সম্মেলনে যোগ দিবেন না তাহার কারণ আমি দেখি না, অবশ্য বৃটিশ সরকার যদি প্রকৃতই ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান চান। অবশ্য আমি মনে করি যে কংগ্রেস কর্মীদের উচিত গোলটেবিল বৈঠকের কথা চিন্তা না করিয়া অব্যাহতভাবে কাজ করিয়া যাওয়া এবং কংগ্রেসের সেই-সব কার্যক্রম গড়িয়া তোলা যাহাতে আমরা অনিচ্ছুক হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইতে পারি।

ইউরোপীয় মনোভাব

বাংলার আইন-সভায় অনাস্থা প্রস্তাবের পর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমি কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য মিঃ পি. জে. গ্রিফিথ্‌স্‌-এর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করি। সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারগুলি সম্বন্ধে ইউরোপীয় মনোভাবের ক্ষেত্রে উক্ত বক্তৃতার বৃহত্তর সংশ্লেষ ও প্রয়োগ আছে। ভীতি প্রদর্শনের কোনো প্রশ্ন নাই। তাঁহাদের নীতি আইন-সভাগুলিতে ইউ-রোপীয়দের প্রচলিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। মিঃ গ্রিফিথ্‌স্‌ যদি ইহাকে ভীতি প্রদর্শন বলিয়া থাকেন, তবে তাহা 'অপরাধী-বিবেকে'র পরিচায়ক। মিঃ গ্রিফিথ্‌স্‌ যদি ঘটনাস্থলে আসিয়া না পৌঁছাইতেন তাহা হইলে আসাম আইন-সভার ইউরোপীয় গোষ্ঠী অন্য নীতি অনুসরণ করিতেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর আইন-সভাকে এড়াইয়া যাইবার অভিপ্রায় ছিল না এবং মাঝে পূজা ও রমজানের ছুটি না পড়িলে স্পীকার-কর্তৃক আইন-সভা আহূত হইত। অবশ্য পদত্যাগী মন্ত্রীসভা যে-সব সরকারী কাজ ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন সেগুলির সম্মুখীন হইয়া নূতন মন্ত্রীদের নীতি উদ্ভাবনের জন্য কিছু সময়েরও প্রয়োজন ছিল।

পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তব রূপ পরিগ্রহণে অন্তত চার মাস সময় লাগিবে। ইত্যবসরে কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া চলিবে এবং রিপোর্ট রচনা করিবে। কমিশন যখন কাজ আরম্ভ করিবে তখন এগুলি তাহার সম্মুখে পেশ করা হইবে। কমিটির সদস্যগণ স্বয়ংসিদ্ধভাবে কমিশনের সদস্য হইবেন। আমার বিশ্বাস কমিটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলিয়া ইহার অবদান আরো বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ হইবে। তাঁহারা আরো সদস্য গ্রহণ করিতে এবং বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা লইতে পারিবেন। কমিশনের কাজ হইবে অর্থনৈতিক উজ্জীবনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

কেন্দ্রীয় সরকার জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত পুরাপুরি এই পরিকল্পনার রূপায়ণ আমি প্রত্যাশা করি না। তৎসত্ত্বেও পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অব্যবহিত প্রয়োজন, কারণ ইহা প্রাদেশিক সরকারগুলির শিল্প বিভাগকে যথোচিত নেতৃত্ব ও নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এই রূপ নির্দেশ ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলোপাতাড়িভাবে কাজ হইবার ও কাজের অপ্রয়োজনীয় দ্বিত্বকরণের সম্ভাবনা থাকিবে। ইহা ছাড়া তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলিতে কোন্ কোন্ ভারী শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া প্রাদেশিক সরকারগুলি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবেন। ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিতে গিয়া ভারতকে একটি অর্থনৈতিক একক হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং ভারতকে অর্থনীতির মৌলিক আইন সাপেক্ষে নিজের প্রধান প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে স্বয়ংনির্ভর করিয়া তোলা হইবে।

কাজটি নিঃসন্দেহে সুকঠিন হইবে, কেননা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা না-ও পাওয়া যাইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও আমি আশা করি যে প্রাদেশিক সরকারগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সাহায্যে এই দেশের শিল্পগত উজ্জীবনের ইতিহাসে শিল্প-সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশন হইবে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের বলিতে চাই যে বোম্বাই সরকার ইতিমধ্যে এই কমিশনের জন্য একজন সর্বসময়ের সচিব দিতে চাহিয়াছেন।

গত নির্বাচনের পর হইতে শৃঙ্খলার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 'কংগ্রেসের উপর অধিকতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছিল' বলিয়া শৃঙ্খলার উপর অধিকতর জোর দেওয়া ঠিক হইয়াছিল। কংগ্রেসকে যদি নিজের কাজের ভালো পরিচয় দিতে হয় তাহা হইলে নিজের কর্মীদের মধ্যে তাহার শৃঙ্খলা বিধান করিতেই হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ক্ষমতার স্বাদ পাইবার ফলে সংগঠনের মধ্যে শৈথিল্য, শৃঙ্খলাহীনতা এবং এমন-কি দুর্নীতি ঢুকিবার বিপদও বিদ্যমান। কাজেই সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নৈতিক মান সংরক্ষণের প্রশ্নে কংগ্রেসের সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ড. খারে সম্বন্ধে বলা যায় যে ডক্টর খারে ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইতেছিলেন এবং ইহা ছাড়া তাঁহার অনেক কার্যকলাপকেই কংগ্রেস-বিরোধী আখ্যা দেওয়া চলে। তিনি একই সঙ্গে এই-সব কাজ চালাইবেন ও কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কংগ্রেসের মনোবল ভাঙিয়া দিবেন—ইহা করিতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁহাকে যখন তাঁহার আচরণের ব্যাখ্যা

করিতে বলা হইয়াছিল তিনি রূঢ়তম ভাষায় উত্তর দিয়াছিলেন। আর এই উত্তরে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন। আইন-সভা হইতে পদত্যাগ না করার তাঁহার সর্বশেষ চাল হইতে বুঝা যায় শৃঙ্খলাহীনতার মনোভাব তাঁহাকে কতদূরে লইয়া গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ অপ্রীতিকর কর্তব্য হইলেও কংগ্রেসের স্বার্থে তাহা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব কোনোক্রমে প্রতিশোধগ্রহণমূলক ছিল না। ড. খারে যদি এখনো তাঁহার কর্মপদ্ধতির ভুল বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটিও যথোপযুক্তভাবে তাহাতে সাড়া দিবে— এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

স্বাধীনতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম

২৯ অক্টোবর ১৯৩৮ শিলং-এর পোলো মাঠে প্রদত্ত ভাষণ।

কংগ্রেসকে স্বাধীনতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে। আমরা স্বাধীনতার পথ ধরিয়া চলিতেছি এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমরা যাহা লাভ করিব তাহা আমাদিগকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে আমরা দেশবাসীদের সেবা করিতে পারি এবং একই সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারি।

৫০ বৎসরের বেশি সময় ধরিয়া স্বরাজের সংগ্রাম চলিয়াছে। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের ও প্রতিটি জাতির জন্মগত অধিকার। আর ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে একটি জাতি নিজের প্রভু হইতে চাহিবে। আর-একটি কারণ আছে যেজন্য ভারত স্বাধীনতা চায়। আমরা গত ১৫০ বৎসর ধরিয়া বিদেশী শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বৈদেশিক প্রভুত্ব কী তাহা আমরা জানি। আমরা ইহার আস্বাদ পাইয়াছি এবং আমাদিগকে স্বাধীনতা ও মানুষের প্রাথমিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যে দেশ একদা ধনী ছিল তাহা এখন দরিদ্র। ভারতীয় জনগণের যে ধনাঢ্যতা ও সমৃদ্ধির কাহিনী বিদেশে পর্যন্ত যাইত তাহা আর এখন নাই। তাহা অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা বেকারত্ব, ব্যাধি এবং অনশন সমস্যারও সম্মুখীন। দারিদ্র্যের সঙ্গে আসে ব্যাধি, নিরক্ষরতা

ও অনশনের সমস্যাগুলি। ১৫০ বৎসর পরে ভারতীয় জনগণ বৈদেশিক প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার না করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীনতায় বঞ্চিত হওয়া বেদনাদায়ক ব্যাপার হইলেও দাসত্ব মানিয়া লওয়া ও তাহার কাছে নতি স্বীকার বৃহত্তর বেদনাদায়ক ব্যাপার।

সারা ভারত ব্যাপিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য আবেগের নবজাগরণ ঘটিয়াছে। ইহা আর এখন শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সীমিত নয়— এমন-কি দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম ব্যক্তির গৃহেও ইহা প্রবেশ করিয়াছে। কৃষিজীবী, কারখানা শ্রমিক এবং কৃষিকর্মীরাও একইভাবে নবজাগরণের সারা অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা অনুভব করেন যে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবন বাঁচিয়া থাকার যোগ্য নয় এবং জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান হইতে পারে না। যে বিদেশীরা ২৫ বৎসর আগে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এখন আমাদের জনগণের বিরাট পরিবর্তন দেখিয়া গভীরভাবে বিস্মিত হন। আমরা শুধু স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিয়া চলি নাই, আমাদের জনগণের দুর্দশা নিবারণেও যথেষ্ট অগ্রগতি সম্পাদন করিয়াছি।

১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা রহিয়াছে, আসামে আছে একটি কংগ্রেস-কোয়ালিশন সরকার এবং সিন্ধুতে আছে কংগ্রেস-সমর্থিত একটি সরকার। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হইল ভারতের দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের উন্নতি-সাধন। ভারতে কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠন যাহা জাতি-বর্ণের কোনো বিভেদ দেখে না। কংগ্রেস ভারতে একমাত্র জাতীয় সংগঠন এবং ভারতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিটি পুরুষ ও নারীর কাছে কংগ্রেসের দরজা খোলা'।

কংগ্রেসের লক্ষ্য

আমি আমাদের দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন। বহিরাগতদের অপেক্ষা কংগ্রেস কর্মীরাই ইহা আরো ভালো করিয়া জানেন যে কংগ্রেসের মঞ্চই বিশালতম। আমরা সমগ্র জনসাধারণকে একত্রিত করার চেষ্টা করিতেছি। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল এবং নাম করার মতো একটি মাত্র জাতীয় সংগঠন হইল কংগ্রেস।

আপনারা যদি স্বাধীনতা ভালোবাসেন, আপনারা যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বাধীনতা চান, তাহা হইলে আপনাদের কংগ্রেসে যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এমন লোক আছেন যাঁহারা জনগণকে কংগ্রেস হইতে বিযুক্ত করার জন্য প্রচার চালাইতেছেন— কিন্তু তাঁহারা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কেননা আর কোনো সংগঠন আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে না।

আমি আপনাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং তাহা পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। মুসলমান বন্ধুরা সন্দেহের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের দিকে তাকান। বাংলা, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মুসলমানরা সহজেই কংগ্রেসে আসিতে পারেন। বাংলায় মুসলমানরা কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারেন। একবার তাঁহারা আসিয়া যোগ দিলে তাঁহাদের সন্দেহ বিলুপ্ত হইবে।

খাসিয়া জনগণের কাছে আবেদন

খাসিয়া জনগণের উচিত বহু সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করা। কংগ্রেস দরিদ্র জনগণের সংগঠন এবং সেইজন্য এই সংগঠনে যোগ দেওয়া তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। ধনীদের ইহা ছাড়াও চলিতে পারে কিন্তু দরিদ্রদের পক্ষে মানুষ হিসাবে বাঁচার মতো একমাত্র আশা হইল কংগ্রেসের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন, যে সরকার আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিবেন।

ভারত সরকারের যে আইন আমরা পাইয়াছি তাহাতে ক্ষমতার একাংশ মাত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। আমাদের লক্ষ্য হইল পূর্ণ স্বরাজ এবং একমাত্র প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ লইয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকার দখল করিতে হইবে।

ফেডারেশন ও আমাদের কর্তব্য

বৃটিশ সরকার আমাদের উপর ফেডারেশন চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কংগ্রেস ইহার বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প। আমরা বিদেশীদের দ্বারা রচিত সংবিধান গ্রহণ করিব না— আমরা ভারতীয় জনগণের বৈধ দাবি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী সংবিধান নিজেদের দেশবাসীদের দ্বারা নিজেরাই রচনা করিব।

ফেডারেশন যদি চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে আমাদিগকে অহিংসার দ্বারা এবং প্রয়োজন হইলে আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বারা ইহার বিরোধিতা করিতে হইবে। বর্তমানে আমাদের গোটা দেশকে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনিতে হইবে, যাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ করিতে এবং বৃহত্তর আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, কেননা স্বাধীনতার তো মূল্য দিতে হইবে।

জার্মানী যুদ্ধের জন্য পুরাপুরি প্রস্তুত এবং সেইজন্য সে বিনাযুদ্ধে তাহার দাবি পূরণ করিয়া লইতে পারিতেছে। সেইভাবে ভারতেরও উচিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং তাহা হইলে হয়তো তাহার পক্ষে কোনো সংগ্রাম না করিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল এবং শুধু সাময়িকভাবে যুদ্ধ এড়ানো গিয়াছে। বৃটিশ সরকারের পক্ষে অস্ত্রের দ্বারা প্রশাসন চালানো সম্ভব হইবে না।

২

৩১ অক্টোবর ১৯৩৮ গৌহাটি কটন কলেজে প্রদত্ত ভাষণ।

আজ অপরাহ্নে আমাকে আপনারা যে বিশেষ সাদর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন সেজন্য প্রথমেই আপনাদিগকে আমি অন্তরের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ জানাই। আমি সর্বদাই ছাত্রছাত্রীদের সভায় উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পাইলে আনন্দ বোধ করি। ইহা নিজেকে তরুণ ভাবিতে সহায়তা করে— অবশ্য এমন নয় যে আমি নিজেকে বৃদ্ধ মনে করি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই দেশে আমাদের মাঝে মাঝেই যৌবনের ইনজেকশন নেওয়া উচিত। সুতরাং আপনারা আমাকে স্বল্প সময়ের জন্য আপনাদের মধ্যে কাটাইবার এবং আপনাদের যৌবনের কিছুটা অংশ গ্রহণের যে সুযোগ আমাকে দিয়াছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাকে উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী দিতে বলা হইয়াছে। আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করিব এবং সে কথাগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ কিংবা অন্যরূপ তাহা বিচারের ভার আপনাদের উপর। প্রথমেই আমি যে কথাটি আপনাদের বলিতে চাই তাহা হইল এই যে আমরা যুগ-পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে বাস করিতেছি —শুধু ইহা সন্ধিক্ষণের সময় নয়, সংগ্রামেরও সময়। সংগ্রামের সময়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে এইরূপ একটা সংগ্রামের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। এইরূপ সংগ্রামের মধ্য হইতেই একটা জাতির পুনর্জন্ম হয়। আমরা সকলে জানি যে প্রতিটি জন্মের সংগেই জড়িত থাকে বেদনা। আজ আপনারা ভারতের যে পুনর্জন্ম দেখিতেছেন সে সম্বন্ধে সমানভাবে এই মন্তব্য খাটে। আজ একেবারে খাঁটি অর্থেই ভারতীয়

জাতির পুনর্জন্ম হইতেছে। এই পুনর্জন্মের পূর্ণ নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করা ভালো, কেননা তাহা হইলে একেবারে আমাদের চোখের সম্মুখে যে-সব পরিবর্তন ঘটিতেছে সেগুলির কিছুটা তাৎপর্য আমরা বুঝিব। আমার সন্দেহ নাই যে আমরা অনেকে, অর্থাৎ, আমাদের দেশবাসীদের অনেকে, ২০ বৎসর আগে বিশ্বাস করিতেন না যে আমরা আজ যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছি সেই পর্যায়ে কোনোদিন পৌঁছিতে পারিব। যাঁহারা নিজেদের পণ্ডিত ও বিজ্ঞ বলিয়া দাবি করেন তাঁহারা সময় সময় আমাদের বলেন যে প্রগতি অবশ্যম্ভাবীরূপে ধীরগতি। একমাত্র বিবর্তনের অগ্রগতির মাধ্যমেই একটি ব্যক্তি কিংবা একটি জাতি উন্নতি করিতে পারে। আমি স্বীকার করি যে বিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা জাতি নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। একই সঙ্গে আমাদের এই ঐতিহাসিক ঘটনা ভুলিলে চলিবে না যে এই বিবর্তন পদ্ধতিতে প্রায়ই আমরা যাহাতে আবশ্যিক-ভাবে জোরে চলিতে পারি তাহা নিহিত থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে জোরে চলা সামরিক সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় ও তাহার অন্তর্নিহিত— ইহা প্রতিটি বৃদ্ধিরই অন্তর্নিহিত, সেটা প্রকৃতির বৃদ্ধিই হউক, ব্যক্তির বৃদ্ধিই হউক কিংবা একটা জাতির বৃদ্ধিই হউক।

শিল্পে অগ্রগতি

সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই বরং ইহাই স্বাভাবিক যে কোনো জাতি এক সময়ে ৫ কিংবা ১০ বৎসরের সময়সীমায় যাহা করিতে পারে আর-এক সময় ১০১ কিংবা ২০০ বৎসরেও তাহা করিতে পারে না। একটা জাতির একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছিতে ২০০ বৎসর লাগিয়াছে বলিয়া অন্য একটি জাতিরও সেই পর্যায়ে পৌঁছিতে সমান সময় লাগিবে এমন কোনো কথা নাই। এই মন্তব্য সপ্রমাণ করিতে সহজেই অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। আপনারা এক মুহূর্তের জন্য একটা জাতির অর্থনৈতিক ও শিল্প-উন্নয়নের প্রশ্ন বিবেচনা করুন। আপনারা সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরান। ১৯১৮ সালে ইউরোপে সোভিয়েট রাশিয়া সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু নিজের আবশ্যিক জোরে চলার নীতির দরুন তাহা আজ তাহার বর্তমান অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং পৃথিবীতে একটা নতুন ভাবনা দিয়াছে— একটা গোটা জাতির জন্য অর্থনৈতিক ও শিল্পজাত পরিকল্পনার ভাবনা। আর আজ আমরা দেখি যে অন্যান্য দেশ, গণতান্ত্রিকই হউক আর স্বৈরতান্ত্রিকই হউক, উদারনৈতিকই হউক

কিংবা ফ্যাসিস্টই হউক— কার্যত পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশই আজ গোটা জাতির জন্য অর্থনৈতিক ও শিল্প-পরিকল্পনার ভাবনা গ্রহণ করিয়াছে। আমি এই ক্ষুদ্র উদাহরণটি ইহা দেখাইবার জন্য উল্লেখ করিতেছি যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী যে দেশ কিংবা জাতি অনুন্নত ছিল তাহা কিভাবে অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ভারতীয় জনগণ যদি সেইভাবে চিন্তা করেন, তাঁহারা যদি স্বপ্ন দেখেন এবং যদি তাঁহারা আশা করেন যে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারাও বিশ্বের জাতিপুঞ্জের প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইবেন তাহা হইলে আমি সেই চিন্তা, সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই স্বপ্নকে পরিপূর্ণ রকমে যুক্তিসংগত ও স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিব। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের ভাবী অগ্রগতি কেবল রাজনীতিতে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জ্যামিতিক প্রগতিতে হইবে এবং আগামী ১০ কিংবা ২০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের ও জনগণের অবস্থা কী হইবে তাহা দেখিবার মতো দূরদৃষ্টি আমাদের রাখিতে হইবে। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতের মুক্তির দিন নিকটে সমাগত। আর আমার কথা যদি বলেন, তবে আমি আমার চোখের সম্মুখে যেমন আপনাদের বসিয়া থাকা কিংবা দাঁড়াইয়া থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিত, তেমনই এ-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। আমার কাছে রাজনৈতিক মুক্তি আর কোনো বড়ো সমস্যা নয়। আমরা যে সমস্যার সমাধান প্রায় করিয়া আনিয়াছি এবং যেটুকু সমাধানের বাকি আছে তাহারও সমাধান পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে হইবে। কিন্তু আজ হইতে আমাদের যুবক-যুবতীদের যাহা ভাবিতে হইবে তাহা হইল এই যে আমরা যে-ক্ষমতালাভের জন্য এত বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছি তাহা যখন আপনারা লাভ করিবেন তখন কী করিবেন। আমি এ কথা বলিতেছি না যে রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমার যাহা বলার অভিপ্রায় তাহা এই যে সেই সংগ্রামের চূড়ান্ত সমাধান খুব দূরে নয় এবং আপনাদিগকে এখন হইতে কর্তব্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যাঁহারা তরুণ, যাঁহারা আদর্শবাদী ও কল্পনাপ্রবণ এবং যাঁহাদের আত্মবিশ্বাসবোধ আছে তাঁহারা ভবিষ্যতের কতকগুলি সমস্যা— আমি পুনর্গঠনের সমস্যার কথা বলিতেছি, —কল্পনা করার চেষ্টা করিলে ভালো করিবেন। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পনরুজ্জীবনের জন্য অর্থনৈতিক ও শিল্প-পরিকল্পনা প্রণয়নের যে উদ্যোগ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে করা হইতেছে, তাহার কথা আপনারা গত কয়েক সপ্তাহের

পত্রিকায় পড়িয়া থাকিতে পারেন। আমরা যাহা চাই তাহা কেবল অর্থনৈতিক ও শিল্প-পরিকল্পনা নয়, আমরা জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা চাই। সেই পরিকল্পনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা পড়িবে। আপনারা আপনাদের চোখের সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে এমন নূতন জাতি দেখিতেছেন যাহাদের পুনর্জন্ম হইতেছে এবং যাহারা বিশ্বের জাতি-পুঞ্জের সম্মুখভাগে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। আমাদের সম্মুখেও সেই একই দৃশ্য এবং আমরা যদি সাফল্য অর্জন করিতে চাই তাহা হইলে আজ হইতে আমাদিগকে সকল সমস্যা, জাতিগঠনের সমস্যাবলী যেমন চিহ্নিত করিতে হইবে তেমনই তাহাদের সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

জাতিগঠনের কাজ

এই ক্ষুদ্র ভাষণে জাতিগঠনের সমগ্র বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা কোন্ কোন্ সমস্যার মুখোমুখি হইবেন তাহা আপনাদেরই ভাবিয়া দেখা উচিত এবং আপনারা যদি নিজেদের প্রবণতা ও প্রশিক্ষণ অনুসারে আপনাদের ভাবী জীবন সেবায় নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হন ও আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ কোনো বিভাগের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রের জন্য কাজ করিতে সংকল্প করেন তাহা হইলে আপনারা ভবিষ্যতের কাজ সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব পালন করিবেন। মানবিক ইতিহাসে আপনারা দেখিবেন যে কখনো কখনো পুনর্গঠনে কৃতিত্ব লাভ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর হইয়া উঠে। আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করিব তখন আমাদের কাজ কিংবা আমাদের ব্রত শেষ হইয়া যাইবে না। প্রকৃত কাজ তখনই আরম্ভ হইবে, কেননা তখন আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন অনুসারে জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করার ক্ষমতা পাইব। এমন লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে ক্ষমতা পাইবার সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলের কাজ শেষ হইয়া যাইবে ; কিন্তু আমি এ-ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করি এবং আমার নিশ্চিত অভিমত এই যে স্বাধীনতার জন্য যে দল সংগ্রাম করে ও জয়লাভ করে, জাতির জীবন পুনর্গঠনের দায়িত্ব সেই দলের গ্রহণ করা উচিত। আপনারা ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেখিবেন যে স্বাধীনতার জন্য যে দল সংগ্রাম করে সেই দল পুনর্গঠনেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এইরূপ দেশেই প্রগতির অবিচ্ছিন্নতা থাকিয়া গিয়াছে এবং জাতীয় পুনর্গঠন সম্পন্ন হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তুরস্ককে গ্রহণ করুন। সেখানে যে দল সুলতানের শাসন হইতে

মুক্তির জন্য প্রয়াস করিয়াছিল সেই দলই নূতন তুরস্ক গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়াস করিতেছে। প্রগতির একটা ধারা অবিছিন্ন রহিয়াছে এবং আপনারা ২০ বৎসর পরে নূতন তুরস্কের রূপ দেখিতে পাইবেন। পক্ষান্তরে স্পেনের উদাহরণ নেওয়া যাউক। সে দেশের করুণ অবস্থা তো আপনারা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছেন। আমি তাহার করুণ অবস্থার সব কারণ বুঝি বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ইহার মূল কারণ হইল যে দল ভূতপূর্ব অত্যাচারী শাসন-ব্যবস্থা অবসানের জন্য বহুলাংশে দায়ী সেই দল যথোচিতভাবে পুনর্গঠনের কাজ করে নাই। হয়তো সেখানে কোনো এক দল বিপ্লব আনে নাই, বিপ্লব আনিয়াছিল কয়েকটি দল। প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তুরস্ক কিংবা রাশিয়ায় যেমন দেখা যায় স্পেনে সেরূপ অবিচ্ছিন্নতা দেখা যায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ হইতেও অনুরূপ উদাহরণ দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমি যাহা জোর দিয়া বলিতে চাই তাহা এই যে আমাদের দেশবাসী ও দেশবাসিনীদের মধ্যে যাঁহারা জাতীয় সংগ্রামে, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে নিরত তাঁহাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কাজ শেষ হইবে না। পক্ষান্তরে তাঁহারা স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর প্রকৃত কাজ, হয়তো বা কঠিনতর কাজ আরম্ভ হইবে। ভারতীয় জাতির মতো এত বিরাট জাতির জীবন পুনর্গঠন সহজ কাজ নয়। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি নূতন জাতি গড়িয়া তোলার জন্য আমাদের সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল উৎসাহ এবং দৈহিক ও নৈতিক সকল শক্তির প্রয়োজন হইবে। এই সুবিশাল কাজের জন্য আমাদের আজ হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। আপনারা এখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান আহরণে নিযুক্ত। আমি আশা করি যে আপনারা এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিবেন যাহা শুধু আপনাদের বিদ্যালয়েই কাজে লাগিবে না, যাহা আপনাদের দেশের ও জনগণের সেবা ও উপকারে লাগিবে। আমাদের সম্মুখে বহু সমস্যা। লোকে যেরূপ বলে, যে দেশ একদা দুধে ও মধুতে পরিপূর্ণ ছিল সে দেশ আজ দরিদ্র ও শোষিত। ভারতের জনগণ আজ যে মৌলিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন সেগুলি হইল দারিদ্র্য ও বেকারত্ব। এই-সব সমস্যার সমাধান আমরা কিভাবে করিব? এত বড়ো একটা জাতির সমস্যার সমাধান আমরা কিভাবে করিব? আমরা কিভাবে ৩৫ কোটি মানুষের খাদ্য-সংস্থান করিব? এই একটি সমস্যা সমাধানের মানে আমাদের অসুবিধাগুলির শতকরা ৮০ ভাগের সমাধান। তার পর আছে আমাদের

নিরক্ষরতার সমস্যা। আমরা কিভাবে ধনীদের ও দরিদ্রদের কাছে শিক্ষা পেঁছাইয়া দিব ? আমরা তাঁহাদের কী ধরনের শিক্ষা, কী শ্রেণীর শিক্ষা দিব ? আমরা পুরাতন কেতাবী শিক্ষা-পদ্ধতিই অনুসরণ করিব, না, যে-শিক্ষা দেশের কাছে আমাদের কাজের মানুষ করিয়া তোলে, সেইরূপ নূতন কোনো ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিব ? ইহা ছাড়া আর-একটি সমস্যা আছে। ইহা হইল ব্যাধির সমস্যা। আমরা প্রতিষেধক ও নিরাময়মূলক এই উভয় প্রকার চিকিৎসার ক্ষেত্রে কী করিয়া ব্যাধি-সমস্যার মুখামুখি হইব ? ভারত সর্বপ্রকার ব্যাধির আকর। পৃথিবীর প্রগতি-শীল দেশগুলি ম্যালেরিয়া, প্লেগ, টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধিগুলির হাত হইতে মুক্তি পাইতেছে। ভারতবর্ষকে সব ব্যাধির পক্ষেই অতিথিপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই ব্যাধি-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং একই সঙ্গে জাতির দেহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ কাজ যে কত কঠিন তাহা আপনারা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। তার পর আছে আমাদের কৃষিজীবীদের সমস্যা, করভার এবং কৃষিঋণের ভার। আমার মনে হয় কোনো-একজন ইংরাজ কবি যেন একদা বলিয়াছিলেন যে কৃষকরা একটা জাতির গর্বের বিষয়। আমরা এই কৃষকদের কিভাবে কর ও কৃষিঋণের বোঝা হইতে মুক্তি দিব ?

শ্রমিকদের সমস্যা

তাহার পর আছে আমাদের শ্রমিকদের সমস্যা তাহা সে ক্ষুদ্র শিল্পেই হউক কিংবা বৃহৎ শিল্পেই হউক। আমরা তাঁহাদের বাঁচিবার মতো বেতন কিভাবে দিব ? আমরা সকলেই আজ বেকার-সমস্যার সম্মুখীন। এমন কোনো প্রদেশ নাই, জনসংখ্যার এমন কোনো বিভাগ নাই যাহা এই বেকার-সমস্যার হাত হইতে মুক্ত। আমাদের এই বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কৃষির দিকে ফেরা ও অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষির উন্নয়ন কি যথেষ্ট হইবে অথবা আমা-দিগকে শিল্প-উন্নয়নের জন্য সময় ও উদ্যোগ নিয়োগ করিতে হইবে ? আমরা কি আমাদের পুরাতন খেলা 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' লইয়া মত্ত থাকিব কিংবা নূতন নূতন শহর গড়িয়া তুলিব ? এ-বিষয়ে আমার অন্তত সন্দেহ নাই যে ভারতের বেকার-সমস্যার সমাধান গোটা দেশের শিল্প-রূপায়ণ ব্যতীত সম্ভব নয়। আমি জানি যে সমস্যাটি খুব জটিল। আমরা যাহাকে মানবিক ইতিহাসের প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব স্তর বলি ভারত এখনো সেই স্তরে রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে, বিশেষ করিয়া ইউরোপে, শিল্প-বিপ্লব বহু স্থানচ্যুতি ঘটাইয়াছে, বহু যন্ত্রণার

ও বহু বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। যন্ত্রণা, স্থানচ্যুতি এবং বিরোধ ব্যতীত কোনো বিপ্লব সম্ভব নয়। তবু আমাদের দেশের ভাবী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদিগকে ভারতে শিল্প-বিপ্লব আনিতে হইবে। আমরা যে মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পাইব সেই মুহূর্তে আমাদের কতকগুলি সমস্যার মুখামুখি হইতে হইবে। আমি আপনাদিগকে স্বাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় আপনারা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইবেন এবং যেগুলির সমাধান আপনাদের করিতে হইবে তাহার চিত্র কল্পনা করিতে বলি। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়াস করার কর্তব্য পালন করিতে করিতে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের বৃহত্তর সমস্যা-গুলির জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আজ আমরা আমাদের দেশের সম্মুখে দেখিতে পাই যে কংগ্রেসের মধ্যে দ্বিবিধ প্রয়াস চলিয়াছে। কংগ্রেস আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে নিরত। সে সংগ্রাম এখনো শেষ হয় নাই। একই সঙ্গে কংগ্রেস জাতির উপকারের জন্য সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করিতেছে। শহরেই হউক কিংবা জেলাতেই হউক কিংবা প্রদেশেই হউক কিছুটা ক্ষমতা জনগণকে হস্তান্তর করা হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষমতার যথোচিত সদ্ব্যবহার করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে এই গঠনমূলক উদ্যোগের দ্বারা আমরা কেবল জনগণের সেবা করিব তাহা নয়, আমরা কেবল নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিব তাহাও নয়, আমরা ভবিষ্যতে বৃহত্তর দায়িত্বগুলির জন্যও নিজেদিগকে তৈয়ারি করিয়া তুলিব। আর আপনারা এ ব্যাপারে যতটা সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে আমি বলিতে চাই যে প্রথমত এই দেশের নাগরিক হিসাবে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী আপনাদের ভূমিকা পালন করুন। কিন্তু যখন আমরা পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইব এবং যখন আপনাদের শিক্ষা-জীবন শেষ হইয়া যাইবে তখন আপনাদের যে-সব সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইবে তাহার জন্য আপনাদের প্রস্তুত হইতেই হইবে। আমার সংশয় নাই যে ভারতের ছাত্র-সম্প্রদায় যদি এই পদ্ধতিতে চিন্তা করেন এবং এই পদ্ধতিতে নিজেদের প্রস্তুত করেন তাহা হইলে আমরা বিরাট আশা ও বিরাট আস্থা লইয়া ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারিব।

আমি আর আপনাদের অধিক সময় লইতে চাই না। আজ এখানে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিবার এবং পূর্বেই আমি যেরূপ বলিয়াছি, আপনাদের যৌবনের কিছুটা অংশ গ্রহণ করিবার যে সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়াছেন

সেজন্য আপনাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই। আপনারা যে চমৎকার সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা আমাকে দিয়াছেন সেজন্যও আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রদেশে সম্প্রতি নূতন সরকার ক্ষমতায় বসিয়াছে। এই পরিবর্তন সংগত হইয়াছে কিনা তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব প্রদেশের জনগণের। আমার এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে যদি নূতন যে-দলটির জন্ম হইয়াছে সেটি যদি এই প্রদেশের জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে এই দল ভারতের স্বার্থে অনেক কিছু করিতে পারিবে। এই দল শুধু আসাম প্রদেশের জনগণেরই সহায়তা করিবে না, ভারতের সমগ্র জনগণেরও স্বার্থ পরিপূরণে সহায়তাও করিবে। সর্বোপরি আমরা একই মানবগোষ্ঠী ও একই জাতি। আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে আমরা একই মানবগোষ্ঠী এবং এক জাতি হিসাবে আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে। এই চিন্তা ও এই স্বপ্নের মধ্য হইতে এবং যে উদ্যোগের প্রয়াস আমরা করিতেছি তাহার ফলে যে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইবে ভাবী ভারতের ভিত্তি।

সেবার মনোভাব গড়িয়া তোলো

৩১ অক্টোবর ১৯৩৮ শিলং ফেডারেল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন গঠনকল্পে শিলং অপেরা হলে প্রদত্ত ভাষণ।

শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা দেওয়া নয়। অবশ্য মানুষকে ভালোভাবে বাঁচিবার জন্য উপার্জন করিতে হইবে যাহাতে সে অপরের সেবা করিতে পারে। স্বার্থপরের মতো বাঁচিয়া থাকা যেমন জীবনের লক্ষ্য নয় তেমনই ইহা শিক্ষারও লক্ষ্য নয়। আমরা সাধারণভাবে যে শিক্ষা পাই তাহা আমাদের হৃদয়কে প্রসারিত করে না, আমাদের মানসিক দিগ্বলয় বিস্তারিত করে না, সেবার মনোবৃত্তি সঞ্চারিত করে না, জাতীয় আত্মসম্মান জাগায় না—সংক্ষেপে ইহা জাতীয় চরিত্র উন্নয়নে সাহায্য করে না। ইহা আমাদের মধ্যে প্রকৃত নাগরিকের গুণগুলি বিকশিত করে না। শিক্ষার নৈতিক দিক পুরাপুরি-ভাবে অবজ্ঞাত হয়। একমাত্র প্রয়াসের দ্বারা ও আপনাদের সংগঠনের দ্বারা আমরা এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার পরিপূরণ করিতে পারি। আপনাদের সংগঠনের মাধ্যমে

আপনারা আপনাদের সম্প্রদায়কে, আপনাদের দেশকে ও আপনাদের জাতিকে সেবা করিতে শিখিবেন।

আপনারা সকলেই এ সভার উদ্দেশ্য জানেন। এই শহরে একটি ছাত্র ফেডারেশন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। আমি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই। আমি মনে করি যে শিলং-এর ছাত্রদের ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতী নির্বিশেষে একত্রিত হইবার এবং নিজেদের একটি সংগঠন গড়িয়া তোলার সময় আসিয়াছে। আপনারা সকলেই জানেন যে ভারতের ছাত্রছাত্রীরা এখন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের আওতায় সংঘবদ্ধ। এই সর্বভারতীয় সংস্থার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে শাখা-সংগঠন আছে এবং প্রতিটি প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আওতায় আছে জেলা সংগঠনগুলি ও অধস্তন সংগঠনগুলিও। বৎসরে একবার নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করে এবং সেই সম্মেলনে ছাত্র-সম্প্রদায়ের কল্যাণ সম্পর্কিত সমস্যাদি আলোচিত হয় এবং প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। এদেশে এমন লোক থাকিতে পারেন যাঁহারা যুবকদের কিংবা ছাত্রদের নিজেদের সংগঠনে সংঘবদ্ধ দেখিতে চান না ; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই ধরনের একটা মনোভাব কিংবা এই ধরনের অভিমত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। একমাত্র স্বাবলম্বনের সাহায্যে এবং আপনাদের নিজেদের সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা নিজেদের উন্নত করিতে পারেন ও নিজেদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চার করিতে পারেন এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বৃহত্তর দায়িত্বের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতে পারেন। এখন ছাত্র-ছাত্রীরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন সেগুলি কী? প্রথমত ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য মানুষের মতো নিজেদের অধিকার চান— তাঁহারা আত্মসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তির মতো জীবনযাপন করিতে চান। কখনো কখনো সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং এমন-কি সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি একমাত্র সংঘবদ্ধ হন, যদি তাঁহারা শৃঙ্খলাপরায়ণ হন তবেই তাঁহারা সামগ্রিকভাবে নিজেদের অধিকার আদায় করিতে পারেন এবং নিজেদের আত্মসম্মানের দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। তাহা না হইলে তাঁহারা পুরাপুরি কর্তৃপক্ষের দয়ার উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠেন। আমরা সকলেই অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে কোনো কোনো সময় শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ছাত্রদের প্রতি আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মতো আচরণ করেন না এবং এইরূপ অবস্থায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছাত্রদের

অবশ্য-কর্তব্য হইয়া উঠে। একমাত্র যদি আপনাদের নিজের সংগঠন থাকে তবেই এ অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া উঠিবে।

সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

আপনারা কেন নিজেদের ছাত্র ফেডারেশনের আওতায় সংঘবদ্ধ করিবেন তাহার অন্যান্য কারণও আছে। আমরা সকলেই খুব ভালোভাবে জানি যে আমরা যে শিক্ষা পাই তাহা সম্পূর্ণতা হইতে বহু দূরবর্তী। আমরা যে শিক্ষা পাই তাহা পুরাপুরি একপেশে। ইহা সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে না। ইহা একসঙ্গে দেহ ও মনের বিকাশে সাহায্য করে না। এখন আমরা এই শিক্ষাগত ত্রুটির মুখামুখি হইবার জন্য কী করিব? সহজতম উপায় হইল নিজেদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করা এবং আপনারা যে অবস্থায় নিজেদের দেখিতেছেন সেই অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করা। কিন্তু এই পথ আমাদের অনুসরণ করা উচিত নয়। আপনাদের নিজেদের উদ্যোগের দ্বারা আপনাদের শিক্ষার পরিপূরণ করা উচিত। অন্যান্য স্বাধীন দেশে যে-সব কর্তব্য রাষ্ট্র-কর্তৃক, শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক এবং এমন-কি পিতামাতা ও অভিভাবকগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয় সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদেরই করিতে হয়। আপনারা যদি তাহা না করেন তাহা হইলে আপনাদের শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও শরীর উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষ সাধারণত কী ব্যবস্থা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে উত্তর দিতে হয় কার্যত কিছুই না। কখনো কখনো চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে চেষ্টা পুরাপুরি অর্থহীন। ফল হয় এই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাস করে এবং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি নেয়। তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা জানি যেখানে খুব ভালো ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পায় যে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছে এবং তাহারা জীবনে সারবান কিছু করিতে সক্ষম নয় ও তাহারা যে অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহার সম্মুখীন হইতে তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বেকার সমস্যা

এখন আমি শিক্ষার আর-একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। আপনাদের শিক্ষা কি আপনাদের হস্তের শিখায়? ইহা কি আপনাদের জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে? ইহা কি আপনাদের ভদ্র জীবিকার্জনের জন্য

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয় ? না ; শিক্ষা আমাদের শুধু পরীক্ষা পাস করিতে ও ডিগ্রি লইতে সক্ষম করিয়া তোলে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি যখন দেখি যে আমাদের ছাত্রসমাজ যুবক-যুবতী দুইই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া নিজেদের বেকার সমস্যার সম্মুখীন দেখিতে পান। এখন আমি স্বীকার করি যে, কঠিন নয় এরূপ কারিগরি শিক্ষা বর্তমানে রাষ্ট্র, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনারা নিজেদের উদ্যোগের দ্বারা ছেলেমেয়ের নিজেদের হস্ত কর্মোদ্যমে প্রয়োগ শিখাইতে পারেন আর আপনারা যদি একবার কাজে লাগাইতে শিখেন, একবার যদি হস্ত-শ্রমের মর্যাদা শিখেন, আমার মনে হয় আপনারা অস্তিত্বের সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার জন্য অধিকতর উপযুক্ত হইয়া উঠিবেন। স্বভাবত যাহা ঘটে তাহা হইল এই যে আমরা দৈহিক শ্রম করিতে পারি না। এই-সব ভ্রান্ত ধারণা আপনারা নিজেদের প্রয়াসের দ্বারা নির্মূল করিতে পারেন। আপনারা যদি নিজেদের হস্ত কর্মে প্রয়োগ করিতে শিখেন, আপনারা যদি শ্রম করিতে শিখেন, এবং যদি অন্যদের শ্রম করিতে শেখান তাহা হইলে আপনারা শ্রমের মর্যাদা কী তাহা শিখিবেন। কাজ যতই কঠিন হউক আপনারা তাহা হইতে সরিয়া আসিবেন না, কোনো দৈহিক শ্রমে আপনারা কুণ্ঠিত হইবেন না।

চরিত্র গঠন

অতঃপর আসুন আমরা শিক্ষার আর-একটি দিক বিবেচনা করি। শিক্ষা কি আপনাদের চরিত্র গঠনে সক্ষম করে ? সর্বোপরি শিক্ষার উদ্দেশ্যই বা কী ? আমরা যাহাতে আমাদের জীবন আমাদের দেশের সেবায় এবং শেষ পর্যন্ত মানবতার সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি সেইজন্য আমাদের উন্নততর পুরুষ ও নারীতে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার লক্ষ্য একমাত্র জীবিকার্জন শেখানো নয়। অবশ্য মানুষ যাহাতে অন্যদের সেবা আরো ভালোভাবে করিতে পারে সে উদ্দেশ্যে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য তাহার উপার্জন করা আবশ্যক। স্বার্থপরের মতো বাঁচিয়া থাকা জীবনের লক্ষ্য নয় কিংবা ইহা শিক্ষারও লক্ষ্য নয়। আমরা সাধারণভাবে যে শিক্ষা পাই তাহা আমাদের হৃদয়কে প্রসারিত করে না, সেবার মনোবৃত্তি সঞ্চারিত করে না, জাতীয় আত্মসম্মান জাগায় না— সংক্ষেপে ইহা জাতীয় চরিত্র উন্নয়নে সাহায্য করে না। ইহা আমাদের মধ্যে প্রকৃত নাগরিকের গুণগুলি বিকশিত করে না। শিক্ষার নৈতিক দিক পুরাপুরি অবজ্ঞাত

হয়। একমাত্র প্রয়াসের দ্বারা ও আপনাদের সংগঠনের দ্বারা আমরা এই ত্রুটি-পূর্ণ শিক্ষার পরিপূরণ করিতে পারি। আপনাদের সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সম্প্রদায়কে, আপনাদের দেশকে ও আপনাদের জাতিকে সেবা করিতে শিখিবেন। আপনাদের মানসিক দিগন্ত বিস্তারিত করার উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে হৃদয় প্রসারিত করিতে হইবে। আপনারা যদি তাহা করিতে পারেন একমাত্র তবেই আপনারা নিজেদের পুরাপুরি শিক্ষিত নরনারী বলিতে পারিবেন। শিক্ষার যে নৈতিক দিক এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে তাহা অবজ্ঞাত এবং আপনাদের সে শিক্ষার পরিপূরণ করিতে হইবে। ওই সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা প্রথমে আপনাদের ছাত্র-ছাত্রী-বন্ধুদের ও পরে সমাজের ও জাতির সেবা করিতে পারিবেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনারা নিজেদের মানব-সমাজের সেবার জন্য দক্ষ করিয়া তুলিতে পারিবেন।

বুদ্ধিবাদী শিক্ষা

এখন আসুন আমরা শিক্ষার আর-একটি দিক অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী দিকের প্রতি দৃষ্টি ফেরাই। যদিও স্কুল ও কলেজে শিক্ষার বুদ্ধিবাদী দিকের উপর 'সর্বাধিক জোর দেওয়া হয় তবু সেখানেও আমাদের শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের কতকগুলি বই মুখস্থ করিতে হয়। কখনো কখনো অর্থ বই মুখস্থ করিতে হয় যাহাতে আমরা পরীক্ষার হলে প্রবেশ করিয়া কোনোমতে তাহা বমন করিয়া দিতে পারি। আর পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব-কিছু ভুলিয়া যাই এবং মন আবার শূন্য হইয়া পড়ে। কেন এমন হয়? তাহার কারণ এই ধরনের শিক্ষায়তনে জ্ঞান সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় না। আর অপরের মনে জ্ঞানের কামনা ও তৃষ্ণা কে জাগাইতে পারে? জাগাইতে পারেন একমাত্র তাঁহারা যাঁহাদের নিজেদের জ্ঞানতৃষ্ণা আছে। অন্যদের মনে কে জ্ঞান সঞ্চারিত করিতে পারে? একমাত্র স্বাবলম্বনের দ্বারা এবং নিজেদের মধ্যে ফেডারেশন গঠন করিয়া আমরা এই-সব ত্রুটি সংশোধনের প্রকৃত প্রয়াস করিতে পারি। আমাদের নিজে-দিগকে চিন্তা করিতে শিখিতে হইবে যাহাতে পরে আমরা যে-সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে চাই সেই-সব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হইল আমাদের মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা ও মৌলিক গবেষণার আকাঙ্ক্ষা জাগানো, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ হইবার পর

গবেষণার কাজ শুরু করা যায় এবং একমাত্র তখনই প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। আমরা স্কুল ও কলেজে যাহা শিক্ষা করি তাহা হইল সত্য সন্ধানের একটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র। যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাস করিয়া বাহির হই তখন আমাদের শিক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে ইহা কি আমাদের ভাবা উচিত? পক্ষান্তরে আমি বলি যে যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ হয় তখন আমাদের প্রকৃত শিক্ষাজীবনের আরম্ভ হওয়া উচিত এবং মৌলিক গবেষণা ও মৌলিক অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞানানুসন্ধিৎসা লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমি বলিতে চাই যে বর্তমান ব্যবস্থায় এমন-কি শিক্ষার বুদ্ধিবাদী দিকও সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিপূর্ণ।

সর্বোত্তম সাহায্য

আপনারা স্বাবলম্বন শিখিলে এই-সব ত্রুটির প্রতিকার হইতে পারে। আপনারা যদি নিজেদের ফেডারেশনে সংগঠিত করেন, তবে আপনারা এই-সব ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রকৃত উদ্যোগ করিতে পারেন। প্রথমত আপনারা দৈহিক অনুশীলনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আপনারা পাঠচক্র ও বিতর্ক ক্লাব গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং সেখানে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে। আপনাদের সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা প্রথম ছাত্র-সমাজের ও পরে বৃহত্তর সমাজের অর্থাৎ জাতির সেবা করিতে শিখিবেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা ভালো করিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটিগুলি জানিবেন। আজ আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি হইল শৃঙ্খলার অভাব। আমরা সাধারণত দল হিসাবে কাজ করি না। আপনারা ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ইহা শেষ পর্যন্ত জাতীয় ঐক্যে পরিণত হইতে পারে। আপনাদের শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। এই ফেডারেশনের মাধ্যমে আপনারা দল হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি জাতির অংগ সে উপযুক্ত হইলে জাতি উপযুক্ত হইতে পারে। আপনারা যখন এই কাজ আরম্ভ করিবেন তখন আপনাদের উপর বিশাল দায়িত্ব পড়িবে। আমি আপনাদের কার্যের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

বিবৃতি

টিটাগড় চটকল অঞ্চলের পরিস্থিতি লইয়া 'ইউনাইটেড প্রেস' মাধ্যমে প্রচারিত।

আমি টিটাগড়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সংবাদে খুবই উদ্বিগ্ন। সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামির ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে ও অনেকে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। এই গুরুতর পরিস্থিতি জনগণের এবং দায়িত্বশীল হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের মনোযোগ দাবি করে।

প্রাপ্ত বিবরণগুলি হইতে জানা যায় যে এই মাসের ১১ তারিখে স্ট্যান্ডার্ড জুট মিলস কর্তৃপক্ষ ছয় জন কর্মীকে সরাসরি বরখাস্ত করিয়াছিলেন। বরখাস্তের যে-সব কারণ দেখানো হইয়াছিল তাহার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল যে এই কর্মীরা মিলের অভ্যন্তরে অযৌক্তিক এবং অসংগত বিক্ষোভের সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কর্মচ্যুতির পর সাধারণ কর্মীগণ একযোগে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগগুলি প্রমাণ করার অনুরোধ জানান এবং ইত্যবসরে পদচ্যুত কর্মীগণকে পুরানো পদে বহাল করার কথা বলেন। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় টিটাগড়ের সকল জুটমিলের প্রায় ৩০০০০ কর্মী ১২ নভেম্বর হইতে ধর্মঘট করেন।

জুট অর্ডিনান্সের প্রতিধ্বনি

মন্ত্রীগণের সুপারিশক্রমে গভর্নর যে জুট অর্ডিনান্স প্রচার করিয়াছেন তাহার ফলে বিভিন্ন মিলের প্রায় পঁচিশ হাজার কর্মী কর্মচ্যুত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট চটকল কর্মীদের উপার্জন অনেক কমিয়া গিয়াছে। চটকল কর্মীদের কাছে এই অর্ডিনান্স সার্বজনীনভাবে নিন্দিত। চটকল কর্মীদের পক্ষ হইতে এই অর্ডিনান্সটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়ন সরকারের কাছে এবং মিল মালিকদের কাছে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। কিন্তু এই স্মারকলিপি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লওয়ার আগেই কোনে কোনা জায়গায় জুট মিল মালিকগণ ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীদের শাস্তি দিয়া শ্রমিকদের মনোবল ভাঙিবার কাজে হাত দিয়াছেন। টিটাগড়েই একমাত্র ক্ষেত্র নয়। রাজগঞ্জে ন্যাশনাল জুট মিলসের কর্তৃপক্ষও সম্প্রতি ইউনিয়নের শতাধিক শ্রমিককে বরখাস্ত করিয়াছেন।

টিটাগড়ে ধর্মঘট ভাঙার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ধর্মঘটের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমান সংঘাতগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দু কিংবা মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে কোনো দলবদ্ধ সংঘর্ষ

হয় নাই এবং কেবল গুপ্ত আক্রমণ হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে ধারণা জন্মে যে সাধারণ শ্রমিকগণ এখনো দলবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দালালদের ফাঁদে পা দেন নাই। এই দালালরা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করিতে, হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক আরো খারাপ করিয়া তুলিতে এবং এইভাবে শ্রমিকদের বিভক্ত করিয়া ধর্মঘট ভাঙিতে চায়।

আমরা জুট মিলস কর্তৃপক্ষকে এবং বাংলা সরকারকে অনুরোধ করি যে শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মীরা যাহাতে কাজে ফিরিয়া যান ও সেইভাবে স্বাভাবিক অবস্থা যাহাতে ফিরিয়া আসে সে-ব্যবস্থা তাঁহারা যেন করেন। যদি মিল মালিকগণ মনে করেন যে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করার কারণগুলি ন্যায়সংগত তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বিষয়টি একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির কাছে তুলিয়া দিতে এবং তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অনুরোধ করিব।

আমি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলির, ট্রেড ইউনিয়নগুলির, জনসাধারণের এবং বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের কাছে এ-আবেদনও জানাই যে তাঁহারা যেন সাম্প্রদায়িক প্রচারে উত্তেজিত না হইয়া উঠেন। ইহা মনে হয় যে এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও জুট অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রামকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্য প্রয়োগ করা হইতেছে। আমি আশা করি যে দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার ও স্থাপন করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিবেন।

১৯ নভেম্বর ১৯৩৮

নিখিলভারত প্ল্যানিং কমিটি

১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮ নিখিলভারত প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে ১৯২১ সাল হইতে নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্পসংঘের উদ্যোগে যথাক্রমে খাদি উৎপাদন ও কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য যে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে তাহার উপর শিল্প সম্পর্কিত পরিকল্পনায় আমাদের উদ্যোগের সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে কোনো কোনো মহলে আশংকা দেখা দিয়াছে। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে দিল্লীতে আমার উদ্বোধনী ভাষণে আমি ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলাম যে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনো বিরোধ নাই। বস্তুত আমি শিল্পকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলাম— কুটির, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প এবং আমি এমন পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলাম যাহা এই প্রতিটি শ্রেণীর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। আমরা জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনে নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের একজন প্রতিনিধির জন্য আসন সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতেও অনুরূপ একটি আসন রাখা যাইতে পারে। যদি এমন কথা বলা হয় কিংবা এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয় যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের প্রবক্তারা কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ক্ষতি করিতে চান তাহা হইলে আমাদের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হইবে। প্রত্যেকেই জানেন কিংবা প্রত্যেকের জানা উচিত যে এমন-কি ইউরোপ ও এশিয়ার সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন জার্মানীতে কিংবা জাপানে, প্রভৃত কুটির শিল্প আছে এবং সেগুলির অবস্থা বেশ ভালো। তবে কেন আমাদের দেশের বেলায় আমরা এরূপ আশংকা করিব?

আমি এখন কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য যোগ করিতে চাই। বৃহৎ পরিধির শিল্পগুলির মধ্যে মূল শিল্পগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেগুলির লক্ষ্য হইল উৎপাদনের উপায় প্রস্তুত করা। তাহারা দ্রুততর ও স্বল্পতর মূল্যের পণ্য উৎপাদনের জন্য কারিগরদের হাতে তুলিয়া দেয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা বারাণসী শহরে বিদ্যুৎচালিত তাঁত সহ প্রতি ইউনিট অর্ধ আনা হারে বিদ্যুৎ শক্তি দিতে পারিতাম তাহা হইলে কারিগরদের পক্ষে নিজেদের বাড়িতে বসিয়া বর্তমান উৎপাদন হার অপেক্ষা প্রায় পাঁচ কিংবা ছয়গুণ বেশি হারে শাড়ি এবং সূচিকার্য

করা বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হইত। ইহাতে তাঁহারা একই ধরনের বিদেশ হইতে আমদানি করা পণ্যের সহিত সফলভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। একটি ভালো বিপণন সংগঠন ও কাঁচামাল সরবরাহের সংগঠনের সাহায্যে এই কারিগররা বর্তমানে যে দারিদ্র্য ও দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা যায়। আমি দিতে পারি এরূপ উদাহরণ ইহাই একমাত্র নয়। যদি জাতির কল্যাণের জন্য বিদ্যুৎ শিল্প ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শিল্প রাষ্ট্র-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে এই দেশে কারিগর-শ্রেণীর লোকেরা ইউনিট হিসাবে পরিবারকে লইয়া হালকা ধরনের বহু শিল্প— যেমন সাইকেল, ফাউন্টেন পেন ও খেলনা— তৈয়ারি শুরু করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই জাপানে করা হইয়াছে। সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করে এই ঘটনার উপর যে বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতি ভীষণ রকম সস্তা এবং জাপানী সরকার কাঁচামাল সরবরাহ ও যথোচিত বিপণনের জন্য পর্ষদ গঠন করিয়াছেন।

আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের তাঁতশিল্প ও রেশমশিল্পকে পনরুজ্জীবিত করার ইহাই একমাত্র উপায়। যে-কোনো সুস্থ শিল্প পরিকল্পনায় মূল শিল্পগুলির উচিত কুটির শিল্পগুলিকে সরবরাহের দ্বারা পুষ্ট ও উন্নত করিয়া তোলা। এই মূল শিল্পগুলিকে বিদেশী সংস্থার হাতে রাখা চলে না এবং যতটা সম্ভব রাষ্ট্রের হাতে এগুলির থাকা উচিত, যদিও মূল শিল্পগুলির অধস্তন শিল্পগুলিকে ছাড়িয়া দিতে হইবে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মুখামুখি হইতে হইবে এরূপ সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির উল্লেখ এখন আমি করিতে চাই। কমিটির প্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে মূল শিল্পগুলির দিকে অর্থাৎ সেই-সব শিল্প যেগুলি অন্যান্য শিল্পকে সাফল্যের সঙ্গে চালায়; যেমন বিদ্যুৎ শিল্প, ধাতু উৎপাদনের শিল্প, ভারী রসয়ান শিল্প, যন্ত্রপাতি এবং রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতি যোগাযোগ শিল্প। অন্যান্য শিল্পে প্রসার দেশের সঙ্গে তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহে ভারত অনগ্রসর। বিশেষ করিয়া বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসরতার পরিমাণ বুঝা যায় যখন আমরা দেখি যে ভারতে যেখানে বর্তমানে মাথা-পিছু সাত ইউনিট বিদ্যুৎ আছে সেখানে মেক্সিকোর মতো অনগ্রসর দেশেও মাথা-পিছু ছিয়ানব্বই ইউনিট বিদ্যুৎ আছে আর জাপানে তো আছে মাথা-পিছু প্রায় পাঁচশ ইউনিট। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে এ দেশের সরকার শুধু অর্থের অপচয় করিয়াছেন। অন্য দেশে অনুরূপ একটি পরিকল্পনায় যে ব্যয় হয়, সরকার

সে ব্যয় অপেক্ষা দশ গুণ বেশি টাকা খরচ করিয়াছেন মাণ্ডি পরিকল্পনার পিছনে।

আমি দাবি জানাই যে যুদ্ধের দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হইলে আমাদের সরবরাহ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ব্যবস্থার একটা তদন্ত হওয়া উচিত। যাঁহারা বলেন যে ভারতে উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা যায় না তাঁহাদের সঙ্গে আমি একমত নই— কারণ ভারতে কাঁচামালের অভাব যেমন নাই তেমনই অভাব নাই ফোরম্যান ও কারিগর শ্রেণীর মানুষের।

অন্যান্য যে-সব মূল শিল্পে তদন্ত হওয়া উচিত সেগুলি হইল জ্বালানি শিল্প, ধাতু উৎপাদন শিল্প ও ভারী রসায়ন-শিল্প। এই-সব ক্ষেত্রে দেশের সম্পদ যথোচিতভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয় নাই এবং সামান্য যাহা-কিছু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বিদেশীদের দ্বারা এবং তাহার ফলে প্রভূত অপচয় ঘটিতেছে। জ্বালানি শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ করিয়া সত্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পর্ষদ গঠন করা উচিত এবং জাতীয় ভিত্তিতে জ্বালানি গবেষণার জন্য একটি গবেষণা সংস্থা গড়িয়া তোলা উচিত।

ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত করিয়া তুলিতে হইলে ধাতুর উৎপাদন দশ হইতে বারোগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য এই যে এখানে সকল শ্রেণীর ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র লৌহ এবং কিছু পরিমাণে তাম্র ব্যতীত অন্যান্য ধরনের ধাতু সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কাজ করা হয় নাই।

যে অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্প বর্তমানে পুরাপুরি বৈদেশিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে সে বিষয়েও তদন্ত হওয়া উচিত। শেষ শিল্পটি হইল পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্প এবং ইহাদের আওতায় পড়ে রেলওয়ে, জাহাজ, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, বেতার প্রভৃতি। বর্তমানে রেলওয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় রেলওয়ে পর্ষদ কর্তৃক এবং এই পর্ষদ পুরাপুরি ইউরোপীয় পরিচালনাধীন। রেলওয়ের প্রয়োজনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এই দেশে তৈয়ারি হইয়া থাকে। বাষ্পীয় পোতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমুদ্রোপকূলের জাহাজ ছাড়া পুরা জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা অযৌক্তিক সুবিধাভোগী অ-ভারতীয়দের হাতে। বেতার সম্বন্ধে ইহার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করিয়া দেখার জন্য একটি বিশেষ সাব কমিটি নিযুক্ত করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

দেশের শিল্প-রূপায়ণ প্রসঙ্গে গবেষণা চালাইবার জন্য সরকারী গবেষণা-

সংস্থা, বৈজ্ঞানিক কৃত্যক, শিল্প বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-গুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব হওয়া উচিত। আমাদের কতকগুলি বৈদেশিক কৃতির পরিকল্পনাও রচনা করিতে হইবে যাহাতে নির্দিষ্ট ও বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানকল্পে পড়াশুনার জন্য বিদেশে দলে দলে ছাত্র পাঠানো যায়।

সর্বশেষে আমাদের শিল্প-রূপায়ণে পরিকল্পনার জন্য আমাদিগকে প্রয়োজনীয় মূলধন ও ঋণ পাওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে আমাদের সকল পরিকল্পনা কাগুজে পরিকল্পনা হইয়াই থাকিবে এবং শিল্প প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা কোনো অগ্রগতি করিতে পারিব না।

ফেডারেশনের বিরোধিতা

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮ বোম্বাই সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা।

বাংলার প্রতিটি কংগ্রেসকর্মী হক-মন্ত্রীসভার বিরোধী। দুইজন অতিরিক্ত-মন্ত্রী গ্রহণের পূর্বে হক-মন্ত্রীসভার যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা আজ অনেক দুর্বল-তর। আজ অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ফেব্রুয়ারি মাসে আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে এই মন্ত্রীসভার পতন যদি না ঘটে তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব।

ফেডারেশনের বিরোধিতা প্রসঙ্গে এই পর্যায়ে আমি কেবল ইহাই বলিতে পারি যে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আমরা প্রতি দিক হইতে বিরোধিতা করিব। আমরা যদি মনে করি যে মন্ত্রীদের ক্ষমতায় থাকায় আমাদের সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহা হইলে ইহা খুবই সম্ভব যে আমরা তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে নাও বলিতে পারি।

ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত আইন-সভায় নির্বাচন হইলে তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না, এমন-কি, যদি কংগ্রেস ফেডারেশন সম্বন্ধে আপস-হীন বিরোধিতার মনোভাব গ্রহণ করে।

ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে যে-সব সমস্যা বিবেচিত হইবে সে-গুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হইবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন। মুসলমানগণ

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহার প্রতিটি দফা বিবেচিত হইবে এবং বৈধ অভিযোগগুলির প্রতিকার করার চেষ্টা করা হইবে।

দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি কংগ্রেসের নীতি হইল এই যে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজারা যাহাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন তাহা কংগ্রেস দেখিবে। বাহিরের সাহায্যে কোনো কৃত্রিম আন্দোলন সৃষ্টি দেশীয় রাজ্যের জনগণের সহায়ক হইবে না এবং সেই কারণেই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে দেশীয় রাজ্যের জনগণ যাহাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ফেডারেশন সম্বন্ধে বলা যায় যে ১৯৩৫-এর ভারত সরকারের আইনে ফেডারেশনের যে পরিকল্পনা আছে কংগ্রেস-কর্তৃক তাহার বিরোধিতা করা হইবে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মনীতি ও আদর্শ অনুসারে, অর্থাৎ অসহযোগিতার মাধ্যমে। এই অসহযোগিতা কী আকার গ্রহণ করিবে, এই অসহযোগিতা ফেডারেশনের আইন-সভা নির্বাচনের পর্যায়ে হইবে, না নির্বাচনের শেষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর্যায়ে হইবে তাহা খুঁটিনাটি বিবেচনা ও রণকৌশলের বিষয় এবং ইহা সংশ্লিষ্ট সময়ের অবস্থানুসারে স্থিরীকৃত হইবে।

এই পর্যায়ে আমি শুধু ইহাই বলিতে পারি যে যদি সংগ্রাম হয় তবে আমরা প্রতি দিক হইতে ইহার বিরোধিতা করিব। আমরা যদি মনে করি যে মন্ত্রীদের ক্ষমতায় থাকায় আমাদের সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহা হইলে ইহা খুবই সম্ভব যে আমরা তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে নাও বলিতে পারি। পক্ষান্তরে আমরা যদি মনে করি যে তাঁহাদের পদত্যাগের ফলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহা হইলে আমরা সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিব।

এমন-কি যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশীয় রাজ্য ফেডারেশনে যোগ দিতে সম্মত হয় তবু বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারতের বিরোধিতা ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিক্ষোভের দরুন ফেডারেশন চালু করিতে পারিবেন না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে অন্তত কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ ফেডারেশন গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফেডারেশন চালু করা সম্ভব হইবে না।

ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত আইন-সভায় নির্বাচন হইলে তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না, এমন-কি যদি কংগ্রেস ফেডারেশন সম্বন্ধে আপসহীন বিরোধিতার মনোভাবও গ্রহণ করে। কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইবে কিনা তাহাই হইবে বিচারের মাপকাঠি। ফেডারেশন

সম্পর্কে ভাবী কার্যক্রম এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে বিবেচিত হইবে।

একটি সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রশ্নটি এখনো সজীব অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে আছে এবং ওয়ার্কিং কমিটি বর্তমানের মতো নিজেদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়িয়া তোলার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির হাতে বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়াছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমন্বয়ের প্রশ্ন পরে উঠিবে।

নরিম্যান প্রশ্নের দুইটি দিক আছে। আসন্ন পৌর-নির্বাচনের সমস্যাটি আছে। সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। কোনো পৌর-নির্বাচনের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ওয়ার্কিং কমিটি স্বাভাবিকভাবে একটি সাধারণ বোঝাপড়া সৃষ্টিতে আগ্রহী হইবে কিন্তু সেই অবস্থা সৃষ্টি করা যাইবে কিনা তাহা এত শীঘ্র বলা সম্ভব নয়। অবশ্য এইরূপ একটি বোঝাপড়া যদি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে তদপেক্ষা অধিকতর প্রীতিকর আর কিছু হইবে না।

একমাত্র বর্তমান মন্ত্রীসভার পতন হইলেই বাংলায় মন্ত্রিত্ব বদলের প্রশ্নটি উঠিবে। বিষয়টি লইয়া জল্পনা-কল্পনার পাকা সময় আসে নাই।

আজ সমস্যাটি কম-বেশি তাত্ত্বিক ধরনের। আমাদের ক্ষেত্রে কোয়ালিশনের নীতি ইতিপূর্বেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মানিয়া লইয়াছে। বাংলা ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি বাস্তব হইয়া উঠিবে একমাত্র যখন বর্তমান মন্ত্রীসভাগুলির পতন ঘটিবে। সিন্ধুর মতো যে-কোনো প্রদেশে ক্ষমতায় না আসিয়া কংগ্রেসের পক্ষে বাহির হইতে যে-কোনো নূতন ও প্রগতিশীল মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করা সম্ভব। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে সিন্ধুর সূত্র কিংবা আসামের সূত্র প্রযুক্ত হইবে তাহা নির্ভর করিবে তখনকার অবস্থার উপর।

যদি বাংলার কংগ্রেসসেবীরা দৃঢ়ভাবে মনে করে যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের পক্ষে সহায়ক হইবে তাহা হইলে তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে সেই প্রস্তাব করিবেন ও ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন চাহিবেন। ওয়ার্কিং কমিটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার বিরোধিতার পূর্বতম নীতি হইতে ইতিমধ্যে সরিয়া আসিয়াছে। ইহা কোনো একটি প্রদেশে কোয়ালিশন অনুমোদন করিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে সেই সময় সেই প্রদেশের সামগ্রিক অবস্থার উপর।

বাংলার প্রতিটি কংগ্রেসকর্মী হক-মন্ত্রীসভার বিরোধী। দুইজন অতিরিক্ত

মন্ত্রী গ্রহণের পূর্বে হক-মন্ত্রীসভার যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা আজ অনেক দুর্বলতর। আজ অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ফেব্রুয়ারি মাসে আইন-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে এই মন্ত্রীসভার পতন যদি না ঘটে তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব। মন্ত্রীত্বের যে-কোনো রদবদলের জন্য বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দায়ী হইলেও সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকিবে কংগ্রেস সংসদীয় সাব-কমিটির ও ওয়ার্কিং কমিটির। বাংলার কংগ্রেসকর্মীরা যে অভিমত ও উপদেশ দিবেন তাহা আপনাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রূপদানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

সং যো জ ন

জাতীয় শিক্ষার কথা

সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ, শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকমণ্ডলী, সোদরপ্রতিম ছাত্রবৃন্দ, বাংলার এই দুরূহ সমস্যার দিনে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিয়া আমাদের চিন্তাশক্তিকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যখন ভাবপ্রবণ বাঙালীর যুক্তি-তর্ক, অনুভূতিকে ক্লিস্ট করিয়া একমাত্র প্রশ্ন উঠিতেছে : "কঃ পন্থা ?" তখন "জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে" আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর সভাপতির ভার অর্পণ করিয়া আমাকে যে কী গুরুদায়িত্বের মধ্যে ফেলিয়াছেন তাহা আমি নিজের অক্ষমতা বোধের সংগে মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। যেখানে 'সৃষ্টির' কথা 'গঠনের' কথা সেখানে আমার সৃষ্টির অহংকার আছে, গঠনের আনন্দও আছে। সেইজন্যই আমার প্রতিদিনকার জীবন যাপনের মধ্যে অপূর্ণতা আছে জানিয়াও আমি আপনাদের সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই।

'দীন আমি তোমাদের কী করিব দান
তবু ভালোবেসে মোর বাড়ালে সম্মান,
কিছু নাই তাও জেনে
বুকে যে নিয়েছ টেনে
সেই গর্বে আজি মোর ভরিয়াছে প্রাণ।'

জীবনের কোনো এক শুভ মুহূর্তে, হৃদয়ের সমস্ত কর্ম-প্রণোদনা জাগ্রত হইয়া বলে 'আত্মানং বিদ্ধি' ; তখন মানুষের পক্ষে ভাবা সহজ হয় যে এ-জগতের মধ্যে সে এমন একটা কিছু করিতে আসিয়াছে যাহা সে ছাড়া আর কেহ পারিবে না। শক্তির স্পন্দন সেদিন তাব সারা দেহে সাড়া দিয়া বলিয়া যায় : 'তুমি বীর', অনুভূতির প্রাবল্য মনকে জাগাইয়া বলে : 'তুমি মানুষ'।

আমার মনে হয় আমাদের জীবনে এই শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। আজ এই যে আমরা একটা সৃষ্টি করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি, আসন্ন সিদ্ধির আনন্দে পাগল হইয়া উঠিয়াছি ইহার কারণ কি ? কোন্ বস্তুর আশায় আজ আমরা গতানুগতিক কর্মপদ্ধতি হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া নবপর্যায়ে জীবকারম্ভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি ?

আমরা বুঝিয়াছি যে জীবনটা মান্ধাতার আমলের একখানি প্রস্তর খণ্ড নয় যে তার গতি নাই প্রাণ নাই। জীবনটা যে একটা অখণ্ড সত্য বস্তুর সার সমষ্টি তাহা আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা মানুষ, আমাদের প্রাণের মধ্যে

অগ্নি-স্ফুলিংগে আছে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, আছে, ঝটিকার প্রাবল্য আছে, বিদ্যুতের গতি আছে। জীবনের তো সবই গতি, সবই শক্তির চঞ্চলতা, আমরা স্থাণু নই। তাই বলিতেছি যে আমরা আজ জীবনের গতিবেগ-প্রাবল্যের মধ্যে, শক্তি-বিকাশের চাঞ্চল্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছি। আমরা আজ মানুষের শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করিতে চাই। আমরা নিজেকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য আজ জাগ্রত হইয়াছি। আমরা আজ আপন অভিজ্ঞতায় দেশজননীকে বলিতে পারি—

'সাতকোটি সন্তানের, হে মুগ্ধ জননী,—
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।'

আমরা আজ মানুষ হইতে চাই। এবং সংগে সংগে মনুষ্যত্বের সমস্ত অধিকার লাভ করিতে চাই। আজ আকাশের দেবতা বাতাসকে তাঁহার অগ্রদূত করিয়া পাঠাইয়াছেন— তাঁহার অমোঘ আহ্বান— 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। তাই আজ এ তদিনের ছক্‌-কাটা বন্ধনী-দাগের বাহিরে আসিয়া আমরা শুধু দাঁড়াইয়া নাই — আমরা চলার পথে গান গাহিয়া চলিয়াছি—

'আগে চল আগে চল ভাই'

সত্যকে আমরা চাই, ধ্রুব আমাদের লক্ষ্য— আমরা তাই এখানে সমবেত হইয়াছি। সমপ্রাণের অভাব বেদনায় সমস্বরে বলিতেছি, 'সত্যকে লভিতে চাই, অসত্যরে দলি পদতলে'।

যুগে যুগে মানুষ আপনার শিক্ষাদীক্ষায় সত্যকে পরমাশ্রয় করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে— আমরা কিন্তু মিথ্যা শিক্ষায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি; সত্যকে দূরে সরাইয়া মিথ্যাকেই এতদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আজ সত্যকে ফিরিয়া পাইতে হইলে মানুষ হইতে হইবে এবং মানুষ হইতে হইলে প্রকৃত শিক্ষা চাই।

যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহাকেই আমরা 'জাতীয় শিক্ষা' বলি। জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথমত, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আদর্শ, জাতীয় ধর্ম ও সমাজ নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নূতন প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে যেরূপ দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্য যাহাতে দূর করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশের ছাত্রদের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষার প্রণালীই আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি যে-সকল বই পড়িয়াছি— তাহাতে এই সমস্যার মনের মতো মীমাংসা আমি এ পর্যন্ত কোনো পুস্তকে পাই নাই। আমার মতে জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষণ কী তাহা আমি সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব। জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আমাদের দেশে আমাদের দেশবাসী কর্তৃক উদ্ভাবিত হওয়া চাই। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে যে শিক্ষা-প্রণালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোনোমতেই জাতীয় শিক্ষা হইতে পারে না। আজ যদি গভর্নমেন্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্বন্ধ না থাকিত তবুও আমি ঐ বিদ্যালয়কে কোনোমতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারিতাম না। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন— "বিজ্ঞানে কোনো জাত নাই।" তার উত্তরে ঔপন্যাসিকপ্রবর শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন— "বিজ্ঞানে জাত নাই বটে, কিন্তু culture-এর জাত আছে।" আমরা আর একটু আগাইয়া বলিতে পারি যে শুধু culture-এ কেন, শিক্ষা-প্রণালীতেও জাত আছে। কারণ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যে শিক্ষা-প্রণালী এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে শিক্ষা-প্রণালী কখনো সার্থক বা ফলদায়ক হইতে পারে না।

তাই আমি বলিতেছিলাম যে জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আমাদের নিজেদেরই ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়া ক্রমশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। Froebel, Montessore প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণ যে নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে বহু সময়, উদ্যম ও অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব বড়ো একটা ফল না পাইলে হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই।

প্রথমত শিক্ষা-প্রণালী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ও জাতীয় আদর্শের উপযোগী হওয়া চাই। আমাদের দেশে যে পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী ছিল তাহার সহিত আমাদের এই নূতন প্রণালীর যোগ স্থাপন করিতে হইবে। ইংরাজের অধীনে যে শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা এ-দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং জাতীয় শিক্ষার আদর্শের ধারার সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। তাহার ফলে আজকাল স্কুল-কলেজের জন্য সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা মিছামিছি ব্যয় হইতেছে, আদর্শ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষায় আমাদের বিশিষ্ট আদর্শকে চরিতার্থ করিতে হইবে। চরিত্রবত্তায়, জ্ঞানমহিমায়, বুদ্ধিবৃত্তিতে আমাদের মানুষের মতো মানুষ হইতে

হইবে, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে আর-একটি কথা আমাদের মনে পড়ে —সেটি হইতেছে শিক্ষাক্ষেত্রের কথা। শিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ, বিভিন্নতার মধ্যে যে অনর্থের উৎপত্তি হইবে তাহাতে আমাদের সমস্ত সাধন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাজেই "শিক্ষার ক্ষেত্র স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপনার সকল সন্তানকে যেন ঐকান্তিক স্নেহের সঙ্গে আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে। সেখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, নির্ধন, কাঙাল সকলেই যেন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমান স্থান পায়।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণ নিজধর্মের বিশিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিবেন, তাঁহাদের ধর্মগত পৃথক ধারাকে বজায় রাখিয়া তাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইবেন কিন্তু যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে কূলে কূলে মঙ্গল পরিবেশন করিয়া আপন গন্তব্যপথ ধরিয়া একই সাগরাভিমুখে বহিয়া চলে, তেমনি নানা ধর্মের, নানা ছাত্র আপনার সাধনার পথ ধরিয়া, দেশের মঙ্গল বিধান করিতে করিতে পথশেষে একই বিধাতার চরণতলে যাইয়া উপস্থিত হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিরোধী ভাবের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না— এই সার্বজনীন শিক্ষাক্ষেত্রের উপর আমাদের অন্তরের সমস্ত যত্ন-অধ্যবসায় এবং সৃষ্টিকৌশল নিয়োগ করিয়া আমাদের এক অভিনব জাতির সৃষ্টি করিতে হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রের নায়কগণ হইবেন জীবন্ত, জাগ্রত মানুষ— অর্থাৎ বক্তৃতায় নয়, অধ্যাপনায় নয়, তর্কে নয়, যুক্তিতে নয়— আপনার জ্বলন্ত চরিত্রের মূর্ত উদাহরণের দ্বারা শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে সাহসী, সত্যবাদী, স্বদেশপ্রেমিক, স্বার্থ-ত্যাগী— এককথায় চারিত্র্য মাহাত্ম্যে অতুলনীয় করিয়া তুলিবেন।

প্রতি মুহূর্তের প্রলোভন হইতে, দুর্বলতা হইতে, কাপুরুষতা হইতে— সবার উপর নিরন্তর মনুষ্যত্বের অপমান হইতে, ছাত্রগণকে রক্ষা করিবে— গুরুর জীবনাদর্শ!

আমাদের দেশের অনেকের মতে আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক প্রাচীন আশ্রমের অনুরূপ হওয়া উচিত।— আমরা সংযমে, দৃঢ়তায়, সাহসে ও জিজ্ঞাসায় প্রাচীন আশ্রমকে অনুসরণ করিব কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্ব-সাধারণের শিক্ষাস্থান করিবার পক্ষে আমাদের যেন উদারতর দৃষ্টি ও গভীরতর সহানুভূতিকে আশ্রয় করিতে পারি।— ধর্মের নামে, দেশের নামে বা রাজনীতির

নামে কোনো প্রকার গোঁড়ামি যেন আমাদের শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

দ্বিতীয়ত— শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধের মধ্যে এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে শুধু Cultural training (অর্থাৎ সংস্কৃতি-মূলক শিক্ষা) বা শুধু practical training (অর্থাৎ অন্ন-সংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষা) লইয়া মানুষ হওয়া যায় না। ইহার যে-কোনো একটিকে একান্ত করিয়া ধরিলে একদেশদর্শিতার দোষে আমাদের শিক্ষা বিকল হইবে।

মনোবৃত্তির বিকাশ শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষার সংগে হইবে, শুধু এইরূপ শিক্ষার প্রবর্তনে এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা যাইবে। বাঙালিকে যদি মানুষ করিতে হয় তবে শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিয়া চাকুরিজীবী বাঙালিকে চাকুরির হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহা যদি আমরা না করিতে পারি তবে আমাদের বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক ছাত্র পড়িতে আসিবে না। কিন্তু এ কথাও আমাকে বলিতে হইবে যে practical training-এর দ্বারা ছাত্রদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কলিকাতার Bengal Technical Institute, যেখানে ছেলেদের practical training হয় এবং বেশ ভালোই হয়, সেখান হইতে বড়ো বড়ো Engineer বড়ো বড়ো Mechanic হইয়া ছেলেরা বাহির হয়। কিন্তু তাহারা মানুষের বিভিন্ন দিকের সংস্কৃতিমূলক পাথেয় যে কতখানি সংগ্রহ করে তাহা ভাবিবার সময় এখন আসিয়াছে।

এই যে শিক্ষা ইহা তো কলের শিক্ষা! কিন্তু মানুষের জীবনটি তো Machine (যন্ত্র) নয়— তাহার জীবন একটা Organic whole; নানা দিকের বৃত্তিগুলি যদি কলের চাপে নিষ্পেষিত হইয়া পড়ে, মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি কলের ধোঁয়ায় অংকুরেই শুকাইয়া যায় তবে সে শিক্ষা যে আমাদের জীবনকে শুধু আংশিকভাবে ব্যর্থ করিবে তাহা নহে আমরা তাহাতে বিশ্বের দরবারে চিরদিনই কাঙাল হইয়া থাকিব। আমাদের দৈন্য, আমাদের অভাব, আমাদের দুঃখ কোনো-দিনই ঘুচিবে না।

এই কলের শিক্ষায় মানুষ বড়ো বড়ো কল গড়িতে পারে— কিন্তু মানুষ গড়িতে পারে না। শিক্ষার্থী আপনার কৃতিত্বে বৃহদায়তন factory-তে কাজ করিতে পারে কিন্তু আমরা কি এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য যন্ত্র-জীবনের পুনরাভিনয় করিব? যে দুর্বহ "যন্ত্র-জীবন" হইতে মুক্তিলাভের

জন্য আমরা শিক্ষা-বিধানের আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছি, আমরা কি তাহাকেই আমাদের মতিভ্রমে শ্রেয়জ্ঞান করিব ?

এই factory হইতে জীবনের যে হলাহল দিবারাত্র উত্থিত হইয়া বর্তমান সভ্যতাভিমানী সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে— আমরা কি তাহাই আবার আকণ্ঠ পান করিব ?

তাহা ছাড়া আমাদের দেশে Factoryর সংখ্যা খুব অল্প। শত শত ছাত্র যদি ফ্যাক্টরির উপযোগী শিক্ষা পাইয়া শিক্ষা-মন্দির হইতে বাহির হয় তবে তাহারা কাজ পাইবে কোথায় ? বহু ফ্যাক্টরি গঠন করা ব্যয়সাপেক্ষ— আমাদের দরিদ্র দেশে তাহা সম্ভবপর নহে। আর-এক কথা— আমরা যদি ফ্যাক্টরির বিধিবদ্ধ কর্মপদ্ধতির নিকট আত্মবিক্রয় করি— সে ঘড়ির কাঁটায় নিয়ন্ত্রিত সময়ের বন্ধনে দাসত্ব করি, ধনীদের কৃপাদত্ত পুরস্কার এবং রোষদৃপ্ত বিরাগের কাছে আত্মসম্মান বিকাইয়া দিই, তবে আমাদের দাসভাব ঘুচিল কোথায় ?

কাজেই আমার মনে হয়— এ-সব ধারণা পরিত্যাগপূর্বক যাহাতে ছাত্রগণ অতি অল্প মূলধন লইয়া আপন আপন গৃহে বা গ্রামে আপনার কর্তৃত্বে গৃহ-শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে আমাদের শিক্ষালয়ে সেইরূপ practical training-এর প্রবর্তন হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে— পথ কোথায় ? উপায় কী ?— পথ আমাদিগকেই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, পাথেয় আমাদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমার বলিবার কথা এই যে— এই গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে স্থানীয় অবস্থার উপর। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা নির্ভর করিবে প্রত্যেক স্থানের আবহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের উপর। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক কৃষি-বিভাগ— যে স্থানে আখের চাষ প্রভূত পরিমাণে হয়— সেখানে চিনি প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী শিখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের একটা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে, যেখানে রেশমের চাষ হয়, সেখানে ২।৪টা করিয়া রেশমের কারখানা করা, নানা রকমের কাপড় প্রস্তুত এবং রঙ করা ইত্যাদি ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ভিজাগাপটম অঞ্চলে নাক্সভোমিকা গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই-সব গাছ সদ্য সদ্য বিদেশে রপ্তানী হয়, সেখানে তাহার নির্যাস হইয়া ঔষধাকারে আমাদের দেশে আসে— আমরা দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে তাহা ক্রয় করি। যদি এই-সব স্থানে ছোটো ছোটো ল্যাবরেটরি বা বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষাগার খোলা যায় এবং নারকেলের ছোবড়া কাজে লাগিয়ে উপকারে আসে এমন কৌশল প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি

পরীক্ষাগার খোলা যায় এবং নাক্স-ভূমিকার নির্যাস প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি শেখানো যায় তাহা হইলে সহজেই ছাত্রদের অন্নসংস্থানের একটা উপায় হইতে পারে। আপনারা বোধ হয় লক্ষ করিয়াছেন যে প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় মৃত গো-মহিষ ফেলিবার একটা বাগাড় (পতিত জমি) বা ভাগাড় আছে। সেখানে রাশিকৃত হাড়-শিং পড়িয়া থাকে— বিদেশী বণিকদের অর্থে পুষ্ট ব্যাপারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই-সব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান দেয়। কিন্তু এই শিং হইতে চিরুনি, বোতাম এবং পরিত্যক্ত অংশে সিরিষ প্রস্তুত হইতে পারে। এ-সব স্থানীয় ব্যাপার—স্থানীয় লোকেরা এই-সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের কুসংস্কার ইহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী— সমাজপতি হয়তো রোষকষায়িত লোচনে গোরুর হাড় বা শিং সংগ্রহকারীকে কঠোর শাস্তি দিবেন। কিন্তু এই-সব অন্ধ বর্বরতাকে আমল দিলে চলিবে না।

তার পর যে-সব স্থানে নারিকেল অধিক পরিমাণে জন্মায় সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। Central Jail-এ দেখিয়াছি জনৈক আন্দামানী রাজনীতিক বন্দী নারিকেল ছোবড়া হইতে সুন্দর চেন, মালা প্রভৃতি কারুকার্য করিতে পারিতেন। নারিকেলের মালা হইতে বোতাম তৈয়ারি, শাস হইতে তৈল উৎপাদন করিবার প্রণালী অনায়াসে তাঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছোটো ছোটো শিল্পাগার থাকিলে, ছাত্রেরা সাহিত্য, চারুকলা সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে। এইরূপ পিন, নিব, ক্লিপ, কলম, পেন্সিল, কালি প্রভৃতি অনেক ছোটো ছোটো সামগ্রী প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি আমরা ছাত্রদের শিখাইতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা সহজেই করিতে পারিব। ছোটো ছোটো শিল্পাগার ও কারখানায় স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া অবশিষ্ট সময়ে মনোবৃত্তির উৎকর্ষের জন্য ধর্ম, সাহিত্য, চারুকলা, সমাজ-নীতি প্রভৃতির চর্চা ও গবেষণায় মানুষ আপনাকে নিয়োজিত করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে।

জাতীয় শিক্ষার আর-একটি অঙ্গ হইবে ছাত্রগণের সৎ প্রবৃত্তির সাহচর্য করা ও উৎসাহ প্রদান করা। যে ছাত্রের মনের গতি যেদিকে তাহাকে সেই দিকে অগ্রসর করিয়া লইবার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন— যথা, আর্তের সেবাশুশ্রূষার জন্য সমিতি গঠন, দরিদ্রের সাহায্যকল্পে অনাথ ভাণ্ডার, দৈহিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন, অর্থনীতি শিক্ষার জন্য সমবায় প্রথায় ছোটো ছোটো কাজের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য শিক্ষালয়ে ছাত্রগণের উপর তাহাদের সম্পর্কিত নানা কাজের ভার অর্পিত থাকে, ইহাতে স্বাধীনভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে বিকশিত হয়। তাহাদের ক্লাব, পাঠাগার, পুস্তকালয় প্রভৃতি ছাত্রসংঘের যাবতীয় অনুষ্ঠানের ভারই তাহাদের হাতে, ভবিষ্যতে তাহারা যখন নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে তখন কোনো মতেই কোনো কাজের দুরূহতা তাহাদের বাধা দিতে পারে না— অধিকৃত কর্মকুশলতায় তাহারা প্রত্যেক কঠিন কাজে সাফল্য লাভ করে।

মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছাত্রগণ যাহাতে হাতের কাজের নিপুণতা শিক্ষা করিতে পারে এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে করুন আপনার ছাত্রটি মনের উৎকর্ষ লাভ করিল— তাহার মানস চক্ষে একদিন প্রকৃতির এক অতি রমণীয় দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠিল— তরুণ প্রাণের মধ্যে এই নয়নাভিরাম দৃশ্যটি এক অভিনব অনুভূতির সঞ্চার করিল— ছাত্র যদি এই সময় আপনার হাতে চিত্রকলার দ্বারা নিজের মনোভাবকে আকার দিতে পারেন, তবে আহার অপেক্ষা অধিক আনন্দ তিনি বোধ হয় আর কিছুতেই পাইবেন না। মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা যদি হাতের কাজ (manual training) না শেখেন তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষা কখনোই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। হাতের কাজের শিক্ষা বা manual training খুব সহজ উপায়ে হইতে পারে। তাঁরা যদি কোনো জিনিস প্রস্তুত করিতে শিখেন তাহা হইলে সৃষ্টি করিবার যে আনন্দ সে আনন্দ তাঁহারা পাইতে পারেন।

এইবার শিক্ষাপ্রণালীর কথা কিছু বলিতে চাই।

"আমরা শিক্ষাব্যাপারে এতদিন শুধু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করিয়া আসিতেছি, প্রাচীন ভারতবর্ষকে আমরা এতদিন কোনো প্রকার আমল দিই নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষকে লক্ষ্য করিয়া যে আমি অনুকরণের কথা বলিলাম তাহা যেন কেহ মনে না করেন। পাশ্চাত্য আপনার প্রকৃতি, প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যকে সম্মুখে রাখিয়া আপনার শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বভাবে, প্রয়োজনে ও আদর্শে সম্পূর্ণ বিভিন্ন— অথচ আমরা সে কথা না বুঝিয়া আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া শুধু অবিদ্যাকে শিক্ষা করিয়াছি। সেইজন্য পাশ্চাত্যের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দ মনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে, তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধ মাত্র বেত হজম করিতেছে; মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মসলা মিশানো নাই।

"তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি. এ., এম. এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।— তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না। তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত, কথাবার্তা, আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই··· আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণ-শক্তি, ধারণা-শক্তি, চিন্তা-শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।

কিন্তু এই মানসিক শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে।" (রবীন্দ্রনাথ)

কী করিয়া শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সংযোগ বিধান করিতে পারা যায় ইহাই এখন শিক্ষা-ধুরন্ধরগণের সর্বপ্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কী উপায়ে শক্ত জিনিস বোঝানো যায়; কী উপায়ে বোকা ছেলেদের বোঝানো যায়, বুঝাইবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় কী, স্মৃতিশক্তি কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যায় এই-সব প্রশ্নের সমাধান পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই-সব চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার ফলে কিন্ডারগার্টেন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, এই-সব চেষ্টার ফলে Froebel Montessori প্রভৃতি শিক্ষাধুরন্ধরগণ শিক্ষার নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

অন্যদিকে Experimental Psychology (পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান) নির্ণয় করিতেছে— কী উপায়ে সারাদিনের কাজগুলি একটির পর একটি করিয়া পর্যায়ভুক্ত করিলে কর্মশক্তি বাড়ে— অথচ অবসাদ আসে না— শ্রেণী বিভাগের নৈপুণ্য কী করিয়া কাজের সময় বৃদ্ধি করা যায়, কোন্ ছাত্রের কতখানি পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, কাহার কোন্ কাজে মতি বেশি— এই-সব গবেষণার ফলে শিক্ষা-সমস্যার একটা মীমাংসা হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য আমার মনে হয় আমাদের দেশের প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া এবং দেশের আদর্শ, আশা, আকাঙ্ক্ষার

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আমাদেরও নূতন প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে।

কোন্ প্রণালী আমাদের দেশের উপযোগী হইবে ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বোলপুর ও গুরুকুল বিদ্যালয়ের মতো বাংলার পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্ব-স্ব প্রধান ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করুন, একদিন বাংলায় এই-সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত যে-কোনো প্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া গৃহীত হইবে।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি এখনো বলিতেছি আমাদের এতদিনের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে, জীবনের অর্ধেক সময় গেল বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে, আর নোট মুখস্থ করিতে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতবেগে দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া ডিগ্রি লাভ করিয়া যখন সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাই তখন দেখি ডিগ্রির সঙ্গে অনেক জিনিসের বেসাতি করিয়াছি, প্লীহা যকৃৎ চক্ষুরোগ অম্লদোষ সব লইয়া আত্মচিন্তা করিতে করিতে পিছনে তাকাইয়া দেখি এতদিন উলুবনকে সাগর ভাবিয়া বৃথাই মনকে প্রবোধ দিয়াছি। শুষ্ক মাটির উপর সাঁতার কাটিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, বুকে হাঁচড়াইয়া যেটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে লাভ তো কিছু হয়ই নাই উপরন্তু বুকে হাঁটার মজুরি পর্যন্ত পোষায় নাই।"

কার্যক্ষেত্রে গিয়া দেখি আমার মূল্য সেখানে দিনে ৫ পয়সাও নয়— নিজের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাবের সহিত যে যুদ্ধ করিব সেটুকু শক্তিও আমার এ শিক্ষায় লাভ হয় নাই! দেহের দৈন্য, মনের দুর্বলতা সংসারের মধ্যে শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিক্ষোভ আনিয়া দেয়! আর-একদিকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ শিক্ষার ফলে জীবনে প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস সহ্য করিতে হয়। "যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারি অতি কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে" ছেলেদের শিক্ষা হয়। "ইহাতে কি সে ছেলেদের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্ত কালে নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?" (রবীন্দ্রনাথ)

বাস্তব জীবনের সঙ্গে যেমন আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর কোনো সম্বন্ধ নাই, —সেইরূপ প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে আমাদের তেমন সদ্ভাব নাই, তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বালকের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনি তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভূমির আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত, সৌম্য, গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রসের বিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জে পুঞ্জে সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানাবর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও!"

তাহা হইলে দেখিবে নবজীবনের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে অবসাদ ও নিরানন্দ স্থান পাইবে না— আমরা সত্যকেই শুধু দেখিব— আনন্দকেই অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিব। আমরা যেন সর্বদা মনে রাখিতে পারি— আমাদের এখানকার কর্ম শুধু সত্যকে লাভ করিবার জন্য— বিশ্ববিধাতার বিশ্বকর্মে এ একটি অঙ্গ মাত্র, তাহা হইলে তাঁরই কল্যাণ-আলোকে আমাদের সকল সৎকর্ম সমস্ত মঙ্গল অনুষ্ঠান উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

আমাদের এই শিক্ষায় যে মানুষ গড়িয়া উঠিবে, সে সত্যকে আশ্রয় করিবে, আনন্দকে লাভ করিবে, প্রকৃতিকে মাতৃপদে বরণ করিবে, দেশকে ভালোবাসিবে— বিশ্বমানবকে পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে।

এই সর্বমঙ্গলের আসন্ন আবির্ভাবের সময় আমাদের দেবতা অসীম আকাশতলে তাঁর আশীর্বাদী নির্মাল্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন— মাভৈঃ।

'উপাসনা'
বৈশাখ ১৩৩০

দেশবন্ধু ও জাতিগঠন

দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে— অনেক কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু লেখবার ও বলবার কথা অনেক বাকী আছে। বোধ হয় আসল কথাগুলিই বলা হয় নি। আমি আজ তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের একটা দিকের উল্লেখ করব— যেটার অভাব আমরা সকলেই আজকাল খুব বেশি অনুভব করছি।

দেশবন্ধুর অপরিমেয় মানসিক তেজ ও শক্তি ছিল। তাঁর কর্মজীবনে যত প্রতিকূল শক্তি সামনে এসেছিল— সবই তাঁর অপ্রতিহত বীর্যের নিকট পরাভব স্বীকার করেছিল। তিনি তাঁহার বিজয়-বাহিনী দুর্বার বিক্রমে যথেচ্ছা পরিচালিত করতে পারতেন। এ-সব কথা আমরা জানি— কিন্তু আজ জানবার প্রয়োজন হয়েছে— কী করে তিনি ওই অলৌকিক শক্তি লাভ করলেন। যে শক্তি দেখে— কী দেশবাসী, কী ইংরাজ— সকলেই চমকিত হতেন, সে শক্তি কি আজন্মলব্ধ না সাধনা-প্রসূত ?

সব শক্তিই সাধনা-প্রসূত— অন্তত আমার বিশ্বাস তাই— এবং যাহা আপাত-দৃষ্টিতে আজন্ম-লব্ধ বলে মনে হয়, তাও পূর্বজন্মের সাধনার ফল। দেশবন্ধু যখন বিলাত থেকে ফিরে কলকাতায় ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন তখন তিনি এক-রকম নিঃসম্বল ছিলেন এবং পিতৃ-ঋণের বোঝার চাপে তিনি অবসন্নপ্রায়। তাঁর সম্বল ছিল একটি মাত্র— সেটি অন্তরের সম্বল। প্রাণমন ঢেলে কাজ করবার শক্তি তাঁর ছিল। সেই পাথেয় নিয়ে তিনি দুস্তর সাগরে জীবন-তরী ভাসিয়ে-ছিলেন। তাঁর প্রথম সুযোগ এল— আলিপুর বোমা মোকদ্দমার সময়ে। মোকদ্দমা হাতে নিয়ে তাঁর আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। দিনরাত তো খাটতেনই —সংসার খরচ চালাবার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ধার করতেন এবং যতদিন মোকদ্দমা চলেছিল ততদিন নিজের সংসারের খোঁজখবর আর রাখতেন না। তিনি আগে থেকে বলে রেখেছিলেন যেন সংসারের কোনো কথা নিয়ে কেউ তাঁকে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না করেন এবং সে সময়ে পুত্রকন্যার কঠিন পীড়া হলে একটিবারও দেখতে যান নি। এরূপ আত্যন্তিক অনন্যমনা নিষ্ঠার ফল তিনি হাতে হাতে পেলেন। মোকদ্দমায় তাঁর আর্থিক ক্ষতি হলেও সাফল্যের গৌরবে তিনি মণ্ডিত হলেন এবং সাফল্যের ফলস্বরূপ তাঁর যথেষ্ট পসার আরম্ভ হল। তার পর থেকে প্র্যাকটিসের জন্য আর তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি।

সারা জীবন দেশবন্ধু যখন যে কাজের ভার নিতেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাতে

আত্মনিয়োগ করতেন। সে ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আর অন্য কোনো চিন্তা থাকত না। যাঁরা তাঁর সমগ্র কর্মজীবন দেখেছেন— তাঁরা এই কথার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন। এই আত্মনিমজ্জনের দ্বারাই তিনি অপরিমিত শক্তি লাভ করতেন। জীবন না দিলে কখনো জীবন পাওয়া যায় না। সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে ষোলো-আনা আত্মদান করে, যে ব্যক্তি কাজ করে— তার চিত্তের মধ্যে এক অজানিত দ্বার উন্মুক্ত হয়— এক অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে যায়। সে তখন নিজেই বুঝতে পারে না এত শক্তি তার কোথা হতে এল! ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম বা নামকীর্তনের দ্বারা যে অনুভূতি মানুষ সব সময়ে পায় না ও যে সম্পদ সব সময়ে তার ভাগ্যে জোটে না— সে তা সহজে লাভ করিতে পারে যদি নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ষোলো-আনা বিলিয়ে দিতে পারে।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে দেশবন্ধুর সংগে যখন আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হল, তিনি তখন ভোগ ও ঐশ্বর্যের রাস্তা ছেড়ে সপরিবারে ত্যাগ ও নিবৃত্তির মার্গ অবলম্বন করেছেন। বাহিরের লোকেরা তখনো সন্দেহ করতেন তিনি শেষ পর্যন্ত ওই পথে চলতে পারবেন কি না এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করতে শুরু করলেন তখন তাঁহার শত্রুপক্ষরা এই কথা প্রচার করতে লাগলেন যে দেশবন্ধু এখন "পুনর্মূষিকো ভব" নীতি আশ্রয় করেছেন। কিন্তু আমরা— যাঁরা তাঁর অন্তরের পরিচয় কতকটা রাখতাম— জানতাম যে তাঁর কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনের নামান্তর নয় এবং তিনি অসহযোগের ও ত্যাগের যে পথ একবার গ্রহণ করেছেন তা হতে আর কোনোদিন ভ্রষ্ট হবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সাময়িক প্রভাবের জন্য অসহযোগী সাজেন নি। ১৯২১-এর পূর্বেই তিনি মনে মনে এতটা বিরাগী হয়েছিলেন যে তাঁর নিকট প্র্যাক্‌টিস ত্যাগ করা মোটেই কষ্টকর বোধ হয় নি; তিনি অন্তরের "স্বধর্মের" প্রেরণায়ই ঐশ্বর্যের পথ ছেড়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিবেদন করেছিলেন। সেইজন্যই প্র্যাকটিস ছাড়ার পর ঋণের চাপে ক্লিষ্ট হলেও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার পারিশ্রমিকের (fees-এর) প্রলোভন সহজে পায়ে ঠেলতে পেরেছিলেন। গয়া-কংগ্রেসের পর সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন তাঁর শূন্য থলি ভরল না তখন তাঁর অনুচরদের মধ্যে কেহ কেহ বলতেন যে লোকের দ্বারে ভিক্ষা করে লাঞ্ছিত না হয়ে তিনি যদি এক-আধটা মোকদ্দমা করেন তবে আমাদের সব অভাব মিটে যায়। কিন্তু সে-কথায় তিনি

কর্ণপাত করেন নি; কারণ টাকা অপেক্ষা আদর্শ ছিল তাঁর কাছে বড়ো এবং অসহযোগ নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা তখন ছিল আমাদের সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য। বস্তুত টাকার অভাব মানুষে মিটাতে পারে কিন্তু মানুষের অভাব টাকায় কখনো মিটে না। টাকার অভাব সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা যে-কাজ হয়, বহু অর্থের দ্বারা তাহা হয় না। সব দেশে ও সব কালে আদর্শের স্থান টাকা অপেক্ষা অনেক উঁচুতে। আদর্শের দ্বারাই মানুষ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের দ্বারাই অর্থ সংগৃহীত হয়— কিন্তু শুধু অর্থের দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয় না বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় না। এতটা আদর্শবাদী না হলে দেশবন্ধু তাঁর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অগ্রাহ্য করেও পূর্বেকার সকল সহকর্মী ও বন্ধুদের ত্যাগ করে অপরিচিত কর্মীদের নিয়ে অসহযোগের অজানা পথে চলতে সাহসী হতেন না এবং অবলীলাক্রমে রাজসম্ভোগ ছেড়ে সপরিবারে তাপসের বেশ ধারণ করতে পারতেন না।

কর্মজীবনের এই আত্যন্তিক আত্মদান ও আদর্শপ্রীতি ধর্মজীবনে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরাধার (আরাধনা করে এই অর্থে রাধা) আপন-ভোলা আত্মহারা কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। তাই মহাশক্তিশালী কর্মবীর দেশবন্ধু ছিলেন ধর্ম-জগতে বৈষ্ণব। আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না যে, যে-ব্যক্তি এত বড়ো ব্যারিস্টার, এত বড়ো তার্কিক, এত বড়ো বাগ্মী, এত বড়ো কর্মী,— সে কী ক'রে প্রেমিক বৈষ্ণব হয়। কিন্তু আর কেউ জানুক বা না জানুক— বাঙালী মাত্রেই জানে যে পণ্ডিত কুলাগ্রগণ্য, তর্কচূড়ামণি, অখিল-শাস্ত্রপারংগম জগন্নাথ-নন্দনই প্রেমাবতার গৌরাঙ্গে পরিণত হয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপাদ দর্শনে তাঁর প্রেমাশ্রু-বন্যায় সাংখ্য ও ন্যায়শাস্ত্র ভেসে গিয়েছিল। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি কী কারণে, কী উপায়ে, কী কৌশলে দেশবন্ধু এত বড়ো তার্কিক, বাগ্মী ও ব্যবহারজীবী হতে পেরেছিলেন তা হলেই বুঝতে পারব তাঁর পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করা কী করে সম্ভবপর হল।

তাঁর জীবনের স্রোত একবার কোনো দিকে ফিরলে আর উজান বইত না। জীবনে যখন যে-আদর্শ গ্রহণ করতেন প্রাণের সহিত তা গ্রহণ করতেন এবং সমস্ত জীবনটাকে সে আদর্শের দ্বারা ভরে নেবার চেষ্টা করতেন। কোনো জায়গায় তাঁর মধ্যে ফাঁকি বা মেকি কিছু ছিল না। এই অকৃত্রিম সারল্য, সত্য-প্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধিৎসার দরুনই তিনি নাস্তিকতা ও agnosticism-এর মোহ কাটিয়ে মায়াবাদের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

বিশ্বপ্রেমের আদর্শ সামনে রেখে তিনি দেশ-সেবার মধ্য দিয়ে প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়ে গেছেন যে "কর্মকান্ড জ্ঞানকান্ড পরম বিষের ভান্ড" এই উক্তি বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব নয়; কর্মের মধ্যে দিয়েও প্রেমের সাধনা সম্ভবপর এবং যে-ব্যক্তি সদাসর্বদা কর্মের মধ্যে ডুবে থাকে সেও ভগবানের লীলা উপভোগ করতে পারে যদি "আগুনের পরশ-মণি" তাঁর হৃদয়কে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে দৈনন্দিন জীবনে তিনি যখন যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতেন তখন তার মধ্যে আত্মহারা হতেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আমরা দেখেছি যে তিনি সপরিবারে ইংরাজের কোপানলে আহুতিস্বরূপ ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পাগল হয়েছিলেন। যতদিন আইন-অমান্যের আন্দোলন (civil disobedience) চলেছিল ততদিন তাঁর আর অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। তার পর ঐ আন্দোলনের অবসানে কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি প্রচার করতে যখন আরম্ভ করলেন তখনো তাঁর সেই চিরাভ্যস্ত সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল। গয়া-কংগ্রেসের সময়ে ভারতবর্ষের জনমত বিশেষভাবে তাঁর নীতির বিরোধী ছিল। কিন্তু বাংলার তথা ভারতের, অধিকাংশ পত্রিকা তাঁর প্রতিকূল হলেও তিনি অমানুষিক পরিশ্রমের দ্বারা ধীরে ধীরে জনমতকে তাঁর অনুকূল করে নিলেন। প্রচন্ড গ্রীষ্মের মধ্যে তাঁকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বহুস্থানে ভ্রমণ করে তাঁর নীতি প্রচার করতে হয়েছিল। আমরা জানি যে তাঁর কাউন্সিল প্রবেশ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলের কাজ অচল করা এবং মন্ত্রী নিয়োগে বাধা দেওয়া। বাংলা কাউন্সিলের অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা বিস্মিত হন কী করে তিনি উপর্যুপরি মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব নাকচ করলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি কয়েক মাস অহোরাত্র কিরূপ কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন তা বোধ হয় স্বরাজ্য দলের সভ্যরা ভিন্ন আর-কেহ জানেন না। দেশের সেবায় তিনি নিজের মানও জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর পাদস্পর্শ করবারও যোগ্য নন তেমন লোকের পায়ে হাত দিয়ে দেশের নামে কোনো কিছু ভিক্ষা করতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন না। (চলিত কথায় বলে— লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। দুঃখের বিষয় এই যে এ অভাগা দেশে এমন কুলাঙ্গারও আছে যাদের মন তাতেও টলে নি) শেষবার মন্ত্রীদের বেতন নিয়ে যে ভোটযুদ্ধ হয় তার অব্যবহিত পূর্বে তিনি যখন পাটনায় বিশ্রাম করছেন তখন কলকাতা থেকে স্বরাজ্য দলের কয়েকজন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন— আসন্ন ভোটযুদ্ধের জন্য কী করা

দরকার তার পরামর্শ করতে। সে সময়ে এক দেশবন্ধু ভিন্ন প্রায় সকলেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন— সকলেই ভাবছেন আর বুঝি মন্ত্রীত্ব ঠেকানো গেল না। তখন প্রাণের পূর্ণ আবেগ ও আগ্রহের সংগে তিনি তাঁদের সম্বোধন করে বললেন— "এবার যদি তোমরা সরকারকে হারাতে না পার তবে আর আমি বাংলাদেশে ফিরব না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করে নাও যে প্রাণপণ করে আবার লাগবে এবং সরকারকে পরাজিত করবেই করবে।" তাঁর এই আন্তরিকতাপূর্ণ ওজস্বিনী কথায় নিরাশ হৃদয়ে আশা ও শক্তি ফিরে এল। তাঁরা সকলে কলকাতায় ফিরে কোমর বেঁধে দিবারাত্র খাটতে লেগে গেলেন। কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু নিজেও নামলেন এবং অবশেষে কেল্লা ফতে হল।

দৃষ্টান্তের শেষ নেই— আর দৃষ্টান্তের অধিক প্রয়োজনই বা কী? তাই আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে ক্ষান্ত হব। আমি দেশবন্ধুর নিকট-আত্মীয় ও সহকর্মীদের নিকট শুনেছি যে আমাদের গ্রেপ্তারের পর রাজবন্দীদের মুক্তির কথা তাঁর সারা মনকে গ্রাস করেছিল। তাঁর একজন নিকট-আত্মীয় সেদিন আমায় লিখেছেন— "তোমাদের নিয়ে যাবার পর যে-কয়টি মাস বেঁচেছিলেন কী তাঁর অন্তরের জ্বালা! যে কাছে এসেছে সেই তার তাপ অনুভব করেছে। ব্যর্থ রোষে, ক্ষোভে দুঃখে যেন ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। তাই অনেক সময়ে ভাবি— তাই বুঝি চলে গেলেন সইতে পারলেন না!··· আজ কয়েকদিন থেকে ভাবছি তিনি যদি না অসময়ে চলে যেতেন তবে তোমাদের এতদিন বন্দীজীবন কাটাতে হত না।··· বাংলাদেশের এতগুলি ছেলে এতগুলি ঘর অন্ধকার করে এতগুলি গৃহের সুখ শান্তি ভগ্ন করে আজ এত কষ্ট পেত না। তিনি কখনোই স্থির থাকতে পারতেন না— একটা কিছু উপায় হতই।" এ কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্ডিন্যান্স আইন যখন বাংলা কাউন্সিলে পেশ করা হয় তখন দেশবন্ধু রোগগ্রস্ত ও অতি দুর্বল থাকায় স্ট্রেচার-এ (strecher) করে কাউন্সিলে উপস্থিত হন। তাঁর চিকিৎসক ও আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর শরীরের প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে[১] তাঁকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে যদি তাঁর যাওয়া বন্ধ করবার জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত না করা হয় তবে তিনি পদ-ব্রজেই রওনা হবেন— পথে যা ঘটে ঘটুক। শেষে যখন সবাই বুঝলেন যে তাঁকে ঠেকানো যাবে না এবং তিনি সেদিনকার সভায় উপস্থিত হবার জন্য কৃত-সংকল্প— তখন যাবার বন্দোবস্ত করা হয়। হয়তো সেদিন এতটা অত্যাচার না

১. তখন জনসাধারণ জানতেন না তাঁর শরীরের কী সাংঘাতিক অবস্থা।

করলে তাঁর স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ভালোই হ'ত। কিন্তু তিনি রাজবন্দীদের দুঃখ এমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে না যাওয়াটাই অসম্ভব ছিল। মানুষের হৃদয়টা যত বড়ো হয়, তার দুঃখ কষ্টও তত বেশি হয়। তাঁর অনুচর ও সহকর্মীদের প্রতি এত গভীর স্নেহ ও সমবেদনা ছিল বলেই তিনি এত বড়ো শান্তি-সেনা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং নিজে বাংলার মুকুটহীন রাজা হতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের বর্তমান দুর্দশার কথা ভাবলে মনে এই প্রশ্নই উদয় হয়—দেশবন্ধুর সেই অসীম ভালোবাসা ও সমবেদনার কতটা তাঁর আসনের উত্তরাধিকারীরা পেয়েছেন? নেতা যিনি হবেন— তিনি যদি নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিতে না পারেন তবে তিনি অনুচরদের হৃদয়ে অচলা ভক্তি ও নিষ্ঠা কী করে জাগাবেন?

এক-একটা cause নিয়ে এমনভাবে পাগল হতে পারতেন বলেই তিনি অফুরন্ত শক্তি পেতেম। অন্তরের প্রেরণায় জীবনটাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে না পারলে মানুষ কখনো অমৃতের সন্ধান পেতে পারে না। আমি শুনেছি যে তিনি অনেক সময়ে হাসতে হাসতে বলতেন— আমার জন্য অন্য কোনো স্মৃতি-মন্দির (memorial) রচনা না করে একটা শিলার উপর এই কয়টি কথা লিখে দিয়ো "বাংলার একজন পাগল এখানে বিশ্রাম করছে।"[২] এই কথাগুলি তাঁর অন্তরের প্রতিবিম্বস্বরূপ। জীবদ্দশায় তাঁকে অনেকে পাগল বলতেন। আমারও ইচ্ছা হয় তাঁকে পাগল বলতে—কারণ অনেক সময়ে পাগলের লক্ষণ না থাকলে মানুষ বড়ো হতে পারে না। পুরামাত্রায় sanity (স্থির মস্তিষ্কতা) পাওয়া যায় সেখানে— যেখানে আছে শুধু dull mediocrity।

আজ আমাদের সব চেয়ে বেশি দরকার হয়েছে আপন-ভোলা পাগল-করা নিষ্ঠা। জাতিগঠনের মূলে আগে চাই খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ হতে হলে আদর্শে গভীর নিষ্ঠা চাই। স্বদেশ সেবাকে সাময়িক বৃত্তি বা কালযাপনের উপায় স্বরূপ বিবেচনা করলে চলবে না। স্বদেশ সেবায় বক্তৃতার বা লেখনী চালনার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু সবার অধিক প্রয়োজন আছে— জীবনের শিক্ষার। যে-ব্যক্তি নিজে খাঁটি নয়, তার বক্তৃতার মূল্য কী— রচনার দাম কী? প্রাণই প্রাণকে জাগাতে পারে এবং সে বিশ্ব-বিজয়ী প্রাণ মানুষ লাভ করতে পারে না, যতদিন না সে সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত হয়েছে। যে ব্যক্তি ষোলো-আনা

---

২. কথাগুলি ঠিক না রাখতে পারলেও আমি আশা করি ভাবটা বজায় রেখেছি।

দিতে পারে শুধু সেই ব্যক্তিই ষোলো-আনা শক্তি ও প্রেম লাভ করতে পারে। মানুষ যে হতে চায় তাকে অন্তরের সঙ্গে বলতে হবে—

"এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।"

জাতির প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের একত্ব অনুভব না করতে পারলে দেশাত্মবোধ কী তা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জাতির জীবনের সহিত নিজের জীবন মিশিয়ে দেওয়ার ফলে যার মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জেগেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ও নূতন জাতি সৃষ্টি করতে পারে। সকল সাধনার গূঢ়তত্ত্ব একই— ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া ; জীবনে-মরণে শয়নে স্বপনে একই ভাবের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া। ভাবের সাধনা করতে করতে মানুষ যখন তদ্‌ভাব-ভাবিত হয়ে পড়ে ; মুহূর্তের জন্য যখন তার ভাবের অভাব হয় না— তখন সে সিদ্ধ বলে জগতে পরিচিত হয়। জাতি-স্রষ্টা যাঁরা হতে চান, তাঁদের এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। দেশমাতৃকার স্বরূপ উপলব্ধি করে আত্যন্তিক নিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সব-কিছু জাতির চরণে বিসর্জন দিতে হবে। এই আত্মদান সম্পূর্ণ হলে জাতির ভরা যৌবন ও সারা প্রাণ ব্যক্তির জীবনে ফুটে উঠে— হৃদয়ের মধ্যে অফুরন্ত ও অদম্য শক্তির উৎস খুলে যায়— আদর্শের পুণ্য-পরশে ব্যক্তির জীবন হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজের পরিবর্তন দেখে নিজেই অবাক হয়— ভাবে কী ছিলুম, কী হয়েছি।

দেশবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর এইভাবে সাধনা করেছিলেন— নিজের ষোলো-আনা এমনই ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বলতে তাঁর কিছু ছিল না— নিজের জন্য তাঁর ভাবনা-চিন্তাও ছিল না! জাতির দাবি, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ও প্রত্যেক স্থানটি দখল করেছিল। এক কথায় তিনি দেশাত্মবোধ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো জাতির উদ্দাম ও অপার শক্তি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রকট হয়েছিল এবং তিনি জনসমাজে দুর্জয় পুরুষ সিংহ রূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন।

আজ দেশবন্ধুর শরীর ইহলোকে নেই— কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা তো অমর হয়ে আছে ! সেই প্রবল ইচ্ছা শক্তি, সেই পূর্ণ আত্মদান, সেই গভীর সাধনা আবার অসংখ্য নরনারীর জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কুসুম কোরকের মধ্যে গন্ধ যেমন আত্মপ্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে, আজ ভারতের প্রাণ তেমনি প্রসুপ্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য।

জাতি একটা মনগড়া কাল্পনিক বস্তু নয় ; একটা বাস্তব সত্য। ব্যক্তি যেমন সত্য জাতিও সেরূপ সত্য। ব্যক্তি ছাড়া জাতি হয় না— জাতি ছাড়া ব্যক্তিও হয় না। জাতির একটা আত্মা (collective soul) আছে— একটা শিক্ষা (culture) আছে— একটা অতীত আছে— একটা ভবিষ্যৎ আছে। জাতির সুখ-দুঃখবোধ আছে— জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। এ কথা যে উপলব্ধি করেনি, সে জাতির স্বরূপ কিছুই বুঝে নি। দেশাত্মবোধ তার কাছে কথার কথা মাত্র।

প্রকৃত দেশাত্মবোধ যার মধ্যে জেগেছে সে ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে নবজাগ্রত জাতির জীবন্ত বিগ্রহরূপে জনসমাজে আবির্ভূত হয়। দেশাত্ম-বোধের প্রেরণায় সে নিজের জীবন দেশমাতৃকার চরণে বলি দিয়ে পূর্ণতর জীবন লাভ করে। নবজীবনের গৌরবে ভূষিত হয়ে সে তখন শির উন্নত করে ও বক্ষ বিস্তার ক'রে বিশ্বসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারে—

> "আমার জীবনে লভিয়া জীবন
> জাগো রে সকল দেশ।"

তরুণ বাংলাকে আমি বলি— মানুষ যদি হতে চাও— নূতন জাতি যদি সৃষ্টি করতে চাও— স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যদি ফলাতে চাও— তবে এসো আমরা সাধনায় ডুবে যাই।

'আত্মশক্তি'
১ জুলাই ১৯২৭

গ্রামে অন্তরীণ, বহিষ্কার ও শর্তসাপেক্ষে মুক্তিদান

বিনাশর্তে রাজবন্দীদের মুক্তিদান এড়াইবার জন্য গভর্নমেন্ট "গ্রামে বসতির", "বহিষ্কারের" এবং "শর্তসাপেক্ষে মুক্তির" (সরকার যাহা অ্যাসেম্বলিতে এবং বঙ্গীয় কাউন্সিলে "মুক্তিদান" বলিয়া প্রচার করিতেছেন) বিধান দিয়া লাঞ্ছনা লাঘব করা দূরে থাকুক, তাহাদের পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন। সরকারের এই নবতর পীড়নমূলক কৌশল সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।

এই শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের বিনাবিচারে আটক রাখিবার কোনো যুক্তিই নাই। কিন্তু পুলিস সর্বদাই দেশে এক বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের অজুহাত জাহির করিয়া থাকে। আরো তাজ্জবের বিষয় যখনই অ্যাসেম্বলিতে কিম্বা বঙ্গীয় কাউন্সিলে রাজবন্দীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয় সে-সময় রহস্যজনকভাবে পুলিস বোমা এবং ভাঙা রিভলবার আবিষ্কার করিয়া থাকে। উদ্ধার করা এই বস্তুগুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইলেও, জেল হইবার পক্ষে যথেষ্ট। উপরন্তু, গত কয়েক বৎসর যাবৎ পুলিস কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরবৃন্দ কৃত্রিমভাবে বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া গোয়েন্দাবিভাগের অস্তিত্বের সার্থকতা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছে। এই বিভাগ বিলোপ করিয়া দিবার জন্য 'বেঙ্গল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি' কয়েক বৎসর পূর্বে সুপারিশ করিয়া গিয়াছে। গোয়েন্দাদের তৎপরতার দরুন, ঘটনা এতদূর গড়াইয়া গিয়াছে যে পুলিস ইচ্ছা করিলেই রাজনৈতিক অপরাধ ঘটাইতে পারে এবং তাহাদের ইচ্ছামতো অস্ত্রের ও বোমার কারখানা আবিষ্কার করিতে পারে।

গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে লালবাজার ও ইলিসিয়াম রো'র পুলিসী ক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার ফলে, গত চার-পাঁচ বছর বাংলাদেশ 'পুলিসীরাজ'-এর পরিবেশ-এর মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে।

রাজবন্দীদের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া মুচলেকা সহি সাপেক্ষে তাহাদের মুক্তিদানের ভার দিয়া পুলিস অফিসারদের পাঠাইবার দুর্ভাগ্যজনক সরকারী নীতি তীব্রভাবে নিন্দনীয়। ইহা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবার সামিল।

গভর্নমেন্ট যদি সত্যই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে এবং জনসাধারণের তীব্র বিক্ষোভ প্রশমিত করিতে চান তাহা হইলে সাহসে ভর করিয়া বন্দীশালার দরজা উদারভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই ধরনের রাষ্ট্রনায়কোচিত নীতি গ্রহণ করিলে সেজন্য কখনো আক্ষেপ করিতে হইবে না। যতদিন পর্যন্ত ইহা

না করা হয়, কোনো নেতাকে— তিনি যত প্রভাবশালীই হোন-না কেন— বাংলাদেশের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সহযোগিতার প্রসংগ উত্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না।

রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত স্যার আলেকজান্ডার মুডিম্যান প্রদত্ত নীতি বাংলা গভর্নমেন্ট কার্যকর করিতে ইচ্ছুক— এ সম্পর্কে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়াছে। বাংলা গভর্নমেন্ট যাহাই করুক-না কেন, এই সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত পুনরায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

বিনাশর্তে রাজবন্দীদের মুক্তিদানের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য, সম্প্রতি পুলিস কর্তৃপক্ষ নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা বর্তমানে রাজবন্দীদের সহিত জেলের বাহিরে অস্বাস্থ্যকর সর্প-সংকুল দূরদূরান্তে কখনো বা বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপে সাক্ষাৎ করিতেছে, যেখানে উপযুক্ত খাদ্য-সংস্থান নাই, চিকিৎসা-ব্যবস্থা নাই, এমন-কি জনসাধারণের নিম্নতম প্রয়োজনের সংস্থানও নাই। এই ধরনের অন্তরীণ অবস্থাকে সরকারী পরিভাষায় 'গ্রামে বসতি' বা 'village domicile' বলা হয়। অ্যাসেম্বলি ও বঙ্গীয় বিধান পরিষদে ইহাকেই 'মুক্তিদান' রূপে বর্ণনা করা হয়, যাহা সত্যের অপলাপ মাত্র। রাজবন্দীদের প্রতিদিন কয়েক মাইল হাঁটিয়া নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিতে হয়। দিনমজুরদের পক্ষেও অকিঞ্চিৎকর এমন সামান্যতম ভাতা তাহাদের পীড়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র। জেলা শহরগুলি রাজবন্দীদের বাসস্থান হইতে বহুদূরে। জেলা-সদরের পুলিস কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের ফলে বিপদের সময়ও ইহাদের নিকট হইতে রাজবন্দীরা কোনোরূপ সাহায্য বা পরামর্শ পায় না। স্থানীয় জনসাধারণের সহিত রাজবন্দীদের মেলামেশা নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে গ্রামের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে রেফারির ভূমিকা গ্রহণের জন্য রাজবন্দী যতীন ভট্টাচার্যকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইয়াছিল। অসহনীয় অবস্থায় বাধ্য হইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াও যদি রাজবন্দী জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জানাইতে স্থান ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহাদের বিচারের জন্য চালান দিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রাজবন্দী পরমানন্দ দে'র ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছিল। এই-সকল কারণে বর্তমানে যে ধরনের অন্তরীণ ব্যবস্থা চলিতেছে জনমত তাহার কঠোরভাবে নিন্দা করে।

বহিষ্কারের নীতি

রাজবন্দীদের বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কারের নীতিও পুলিস গ্রহণ করিতেছে, যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের মুক্তির অনিবার্যতা রোধ করা যাইবে না এবং

তাহারাও মুচলেকা সহি করিয়া মুক্তি ক্রয় করিবে না। বহিষ্কৃত রাজবন্দীরা নামে মাত্র স্বাধীনতা ভোগ করে কারণ সর্বদা পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদ ও ছায়ার মতো অনুসরণের ফলে তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। পুলিসের তৎপরতার ফলে সাধারণ মানুষ তাহাদের সহিত মিশিতে সন্ত্রস্ত বোধ করে। আলমোরাতে বহিষ্কৃত রাজবন্দী জীবনলাল চ্যাটার্জির বেলায় যাহা ঘটিয়াছিল বহিষ্কৃত রাজবন্দীদের ভরণপোষণের ভাতা মঞ্জুর না করিয়া গভর্নমেন্ট তাহাদের দুর্ভোগ শতগুণ বৃদ্ধি করে। যেমন যাদুগোপাল মুখার্জির ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল, কারণ সর্বদা পুলিসের দুর্ভাগ্যজনক নজরের দরুন তাহাদের পক্ষে জীবিকা উপার্জন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

লর্ড লিটনের অজুহাত

যদি রাজবন্দীরা বিপজ্জনক এবং অবাঞ্ছিত জীব হইয়া থাকে, তবে বাংলা গভর্নমেন্ট অন্যান্য প্রদেশকে তাহাদের স্থান সংকুলানের জন্য বাধ্য করে কেন ? আমি জিজ্ঞাসা করি হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে মুলতুবি রাখিবার এবং বিচার না করিয়া নাগরিকদের বন্দী রাখিবার কী যুক্তি থাকিতে পারে ? তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নাই, সুতরাং গভর্নমেন্ট তাহাদের বিচার করিবে না। গভর্নর থাকাকালীন লর্ড লিটনের মুখেই আমরা শুনিয়াছি যে, নাগরিকদের বন্দী করা হইয়াছে, কোনো অপরাধ করিবার জন্য নয়, তাহারা যাহাতে কোনোপ্রকার অপরাধ না করিতে পারে সেজন্য। যাদুগোপাল মুখার্জির মতো রাজবন্দীর নিকট পুলিস কর্মচারীরা এই ধরনের বিবৃতি দিয়াছেন। সুতরাং অপরাধমূলক আইনের নূতন বিধান, অতঃপর, আমাদের শিক্ষা করিতে হইতেছে।

পুলিসের কারসাজি

আরো অধিককাল বিনাবিচারে আটকের যৌক্তিকতা সপ্রমাণে ব্যর্থ হইয়া বর্তমানে পুলিস বোমা ও ভাঙা রিভলবার উদ্ধারে লিপ্ত হইয়া বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণে উদ্যোগী হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে গত কয়েক বৎসর যাবৎ যখনই রাজবন্দীদের মুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, কিংবা যখনই বঙ্গীয় বিধান পরিষদ রাজবন্দীদের প্রশ্নটি আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছে অস্ত্রবহনকারী বিনম্র ভদ্রমহোদয়গণ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছেন এবং সহসা তথাকথিত বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কারখানাগুলিতে সাধারণত কিছু রাসায়নিক দ্রব্য

থাকে যাহা সচরাচর সর্বত্রই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এই কারখানায় পাওয়া রিভলবারগুলি লক্ষ্যবস্তুর চাইতে ব্যবহারকারীর পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় পুলিসের পক্ষের সাক্ষী এই মর্মে বিবৃতি দিয়াছিল। যে জিনিসপত্রগুলি উদ্ধার করা হইয়া থাকে বৈপ্লবিক ক্রিয়ার অনুপযুক্ত হইলেও কারাদণ্ড বিধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র আরো সপ্রমাণের জন্য অস্ত্র-আইনের সাধারণ মামলাগুলিকে পুলিস এবং 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান' পত্রিকা-গুলি রাজনৈতিক মামলারূপে প্রচারিত করে। সাম্প্রতিক এক নকল রাজনৈতিক মামলায় পুলিসের পুরানো এক গুপ্তচর রাজসাক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

গুপ্তচরদের নিযুক্তি

গত কয়েক বছর পূর্বে 'বেঙ্গল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি' যে গোয়েন্দা বিভাগের বিলোপের সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা সপ্রমাণের জন্য নিঃসন্দেহে পুলিস কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরদল গত কয়েক বছর যাবৎ বৈপ্লবিক আন্দোলনের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টিতে তৎপর রহিয়াছে। আমি পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া এই বিবৃতি দিতেছি এবং যদি কোনো নিরপেক্ষ কমিটির সম্মুখে রাজবন্দীগণ এবং জনসাধারণ বিনা বাধায় সাক্ষ্য দিতে পারে তাহা হইলে আমার অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্বও গ্রহণ করিতেছি।

অতি জঘন্য ব্যবস্থা

আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে সপারিষদ গভর্নর গুপ্তচর নিযুক্তির খেলায় কোনোভাবে জড়িত। অথবা সকল পুলিস অফিসারই ইহা সম্পর্কে অবগত আছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই জঘন্য ব্যবস্থা একটি বিজাতীয় উপাদান বিশেষ। গত মহাযুদ্ধের সময় বাংলায় যখন একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরোধিতায় পুলিস তৎপর ছিল, সে-সময়ও এই ধরনের ব্যবস্থা বাংলায় অজ্ঞাত ছিল। ইহা কতিপয় পুলিস অফিসারের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং পুলিস অফিসারদের অংশ-বিশেষ শুধু এই ব্যবস্থারই বিরোধিতা করেন নাই, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সেরও বিরোধিতা করিয়াছেন। ব্যবস্থাটি এখন এমন পাকা করা হইয়াছে যে পুলিস ইচ্ছা করিলেই রাজনৈতিক চরিত্রের অপরাধ দেখা দিতে পাবে। এবং তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী অস্ত্র এবং বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমাদের

কারাবাসকালে আমরা যখন পুলিসের কৌশল এবং কর্মপদ্ধতি প্রথম অনুধাবন করি আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র সপ্রমাণ করা চলিবে এবং ষড়যন্ত্রের ও অর্ডিন্যান্সের কার্যকাল অন্তিম দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং আমরা মুক্তির আশা ত্যাগ করিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি অদ্যাবধি কোনো মুক্তির আদেশ দেওয়া হইত না, যদি অকস্মাৎ দার্জিলিং-এর পরিমণ্ডলে কোনো জ্ঞাত কারণে পরিবর্তন না হইত।

বাংলায় পুলিসী রাজ

গত চার-পাঁচ বছর যাবৎ গভর্নমেন্ট হাউস, লালবাজার ও ইলিসিয়াম রো'র পুলিসী ক্ষমতার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করায় বাংলাদেশ পুলিসীরাজের এক অধ্যায়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছে। সিভিল সার্ভিসকে নাকে দড়ি দিয়া পরিচালনা করিয়া পুলিস ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী হইয়াছে। গভর্নর সমেত, উচ্চতম অফিসারদের মহলে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছিল কোনো কোনো ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। অন্যথা জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ভয় দেখাইয়া ত্রাসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

লর্ড লিটনের বিরুদ্ধে বাংলার অভিযোগ

লর্ড লিটনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ তিনি কেবলমাত্র পুলিসের কথায় কান দিতেন। উপযুক্ত বেসরকারী লোকের কথাও যেমন তিনি শুনিতেন না, তেমনি গভর্নমেন্টের দাসসুলভ বশংবদ নয় এমন কোনো ভারতীয়কে বিশ্বাস করিতেন না। অপরপক্ষে তিনি পুলিসের এমনভাবে খোলাখুলি প্রশংসা করিতেন, বিশেষভাবে বিশেষ বিশেষ পুলিস অফিসারের এমন অশোভন এবং অতিরঞ্জিত প্রশস্তি করিতেন, যাহা জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইয়াছে।

একটি শোচনীয় নীতি

রাজবন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহদের মানসিক অবস্থা নির্ণয়ের পর মুচলেকা সহি সাপেক্ষে তাহাদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। রাজবন্দীরা মনে করেন তাহারা কোনো অন্যায় করেন নাই এবং আমার মতো তাহারা অনুতপ্তও হন নাই। কখনো হইবেন না। এই মূল্যে মুক্তি ক্রয়ের সুযোগ

দান কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবার সামিল। আমি গভর্নমেন্টকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন রাজবন্দীদের এই অসম্মান হইতে রেহাই দেন।

অপরপক্ষে, রাজবন্দীদের মানসিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য পুলিস অফিসারদের পাঠানো বৃথা। কারণ রাজবন্দীরা মনে করেন তাহাদের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির জন্য পুলিসই প্রধানত দায়ী এবং কোনো পুলিস অফিসারকে দেখা মাত্র রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁহারা ধীর স্থির, তাহাদের মনও বিরক্তিতে ভরিয়া ওঠে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা জানি। সুতরাং আমার ধারণা এই ধরনের সাক্ষাৎকারের ফলে উভয়পক্ষের মনই বিষাক্ত হইয়া ওঠে।...

যদি গভর্নমেন্ট সত্যই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চান এবং জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রশমিত করিতে চান, তাহারা সাহসে ভর করিয়া জেলের দরজা যতটা সম্ভব খুলিয়া দিন। সেই ধরনের রাষ্ট্রনীতিবিদ্সুলভ নীতি গ্রহণ করিলে, তাহাদের কখনো অনুশোচনা করিতে হইবে না। ইহা না করা পর্যন্ত কোনো নেতা, তিনি যতই প্রভাবশালী হউন-না কেন, বাংলাদেশের কোনো রাজনীতি-সচেতন শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তাহাকে বাক্যস্ফুরণ করিতে দেওয়া হইবে না।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বঙ্গীয় বিধান পরিষদের অধ্যক্ষের নিকট পত্র

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু
বঙ্গীয় বিধান পরিষদ

সোমবার, ১৮ জানুয়ারি ১৯২৭

মহাশয়,

আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি এ জন্য নয় যে ১১ জুন, ১৯২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভা আমি সিদ্ধ মনে করি; কিন্তু আপনি নিজেকে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ বলিয়া দাবি করেন, ও তাই একমাত্র আপনার মাধ্যমেই পরিষদের সদস্যদের কাছে আমি আমার বক্তব্য পেশ করিতে পারি; তাই এই পত্র।

২. কলিকাতা উত্তর অমুসলমান কেন্দ্র হইতে আমি বঙ্গীয় বিধান

পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছি, কিন্তু পরিষদের সভায় আমাকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে আমি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইনাধীনে মান্দালয় কেন্দ্রীয় জেলে আটক আছি। কোনো আন্দোলনের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হই নাই। অতএব কলিকাতা উত্তর অমুসলমান কেন্দ্রের নির্বাচকমণ্ডলীর যথোচিতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভাগুলিতে যোগ দিবার সাংবিধানিক অধিকার আমার আছে।

৩. জানুয়ারির ১০ ও ১১ তারিখে একটি কেন্দ্রের (যথা, কলিকাতা উত্তর অমুসলমান কেন্দ্র) বিধিসংগত প্রতিনিধি আটক থাকার ফলে ওই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব বিধান পরিষদে হয় নাই— তবু ওই ওই তারিখে বিধান পরিষদের সভা কিভাবে অনুষ্ঠিত হইল ও কিভাবে কার্যনির্বাহ হইতে পারিল তাহা বুঝিতে আমি অক্ষম ইহা আমি স্বীকার করিতেছি।

বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ও ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত সরকার আইনের ৭২ক ধারার (২) উপধারায় ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে: "এই আইনের প্রথম তপশীলে যে সারণি আছে তদনুসারে প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সদস্য-সংখ্যা স্থিরীকৃত হইবে।" আমার মনে হয়, যদি বঙ্গ সরকারের কার্যনির্বাহী অফিসাররা একজন বিধিসম্মত প্রতিনিধিকে জেল-হাজতে আটক রাখিয়া বিধান পরিষদে যোগদানে তাঁহাকে বিরত থাকিতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে ভারত সরকার আইনের (Government of India Act) এই ধারা যথাযথভাবে ও সততার সঙ্গে পালন করা সম্ভব নয়। ইহা সুস্পষ্ট যে এরূপ বলপূর্বক বাধাদানের ফল হইল উপরোক্ত আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে বাতিল করিয়া দেওয়া।

৪. আমি আরো বলিতেছি যে, ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে মিডলসেক্স নির্বাচন কেন্দ্র হইতে জন উইলকিন্স এম.পি.-র নির্বাচন উপলক্ষে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স ও হাউস অব লর্ডসে লর্ড শেলবোর্ন, স্যার জর্জ সেভাইল প্রমুখ সাংবিধানিক আইনের স্বীকৃত বিশেষজ্ঞগণ যাহা বলিয়াছিলেন তদনুযায়ী বিধানমণ্ডলীর সভায় একজন বিধিসম্মত প্রতিনিধিকেও যোগদান হইতে বিরত থাকিতে জোর করিয়া বাধ্য করিলে ঐ বিধানমণ্ডলের কার্যধারা অসিদ্ধ হইয়া যায়।

৫. হাউস অফ কমন্সের সদস্যারা যে-সকল সুযোগ-সুবিধা পান আপনি তাহা জ্ঞাত আছেন। এই-সকল সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল হাউস অফ কমন্সের অধিবেশন চলার সময়, অধিবেশন আরম্ভ হইবার

চল্লিশ দিন আগে ও অধিবেশন শেষ হওয়ার চল্লিশ দিনের মধ্যে কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার, আটক বা নিপীড়ন করা যাইবে না।

৬. গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া ডোমিনিয়নগুলিতে যে-সকল বিধান-মণ্ডল আছে তাহাদের সদস্যগণ হাউস অফ কমন্সের সদস্যদের সমান সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত সরকার আইন ব্রিটিশ সংবিধানের আলোয় ও উহার মর্মানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভারত সরকার আইনে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হোক বা না হোক, ব্রিটিশ ভারতের বিধানমণ্ডল-গুলির সদস্যগণ ওই সুযোগ সুবিধাগুলি পাইবেন।

৭. মহাশয়, আপনি জ্ঞাত আছেন যে, সংসদীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যাপার লইয়া ব্রিটিশ ইতিহাসে রাজা ও সংসদ সদস্যদের কত তিক্ত লড়াই হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় হাউস অফ কমন্সের অধ্যক্ষগণ যথেষ্ট ঝুঁকি লইয়া, এবং কোনো কোনো সময় যথেষ্ট আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া, এই লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা লইয়াছেন। বার বার এই বিষয়টি উত্থাপিত হইয়াছে, যেমন, ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে টমাস থর্পের ক্ষেত্রে, ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে জর্জ ফেরারের ক্ষেত্রে, ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে স্যার জন এলিয়ট ও স্যার ডার্ডলি ডিগার্সের ক্ষেত্রে এবং ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে জন উইলকিন্সের ক্ষেত্রে। কখনো কখনো সরকারী দাবির প্রতি ভোট দিয়া সমর্থন জানাইতে অস্বীকার করিয়া, কখনো বা বন্দী সদস্যদের আটক অবস্থা হইতে মুক্ত না করা পর্যন্ত কাজ চালাইতে দিতে অসম্মতি জানাইয়া পার্লামেন্ট রাজাকে এই অধিকার মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে যে অধিবেশনের সময়, অধিবেশন আরম্ভ হইবার চল্লিশ দিন আগে হইতে ও অধিবেশন শেষ হইবার চল্লিশ দিন পর পর্যন্ত গ্রেপ্তার, আটক বা নিপীড়ন করা চলিবে না। আজ সদস্যদের সনাতন ও তর্কাতীত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা শুধু যে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া গণ্য হয় তাহাই নয়, বাহিরের কেহ ওই অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলে হাউস অফ কমন্স তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন।

৮. ডোমিনিয়নগুলির বিধানমণ্ডলও নিজেদের জন্য সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি লড়াই ছাড়াই ওই সুযোগ-সুবিধাগুলি তাহাদের দান করিয়াছে। ভবিষ্যৎই প্রমাণ করিবে ব্রিটেনের সংসদীয় ইতিহাস ভারতে পুনরাবৃত্ত হইবে কিনা অথবা এদেশে সংসদের বিকাশ ডোমিনিয়ন সুলভ শান্ত ধারায় ঘটিবে। যাহা হউক, আমার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এই যে ব্রিটিশ সংবিধানের আলোয় ভারত সরকার আইন কার্যকর করিতে

হইবে। বঙ্গীয় বিধান পরিষদের বর্তমান অধিবেশন কালে আমাকে অগৌণে মুক্তি দিতে হইবে। শুধু তাহা নয়, বাংলার মহামান্য গভর্নরের আদেশ বলে আহূত অধিবেশনে যোগ দিতে, সরকারের যে কার্যনির্বাহী অফিসাররা জেল-হাজতে আটক করিয়া আমাকে বাধা দিয়াছেন, বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সমক্ষে তাঁহাদের বিচারের জন্য আনিতে হইবে।

৯. সম্ভবত ইহা বলা হইবে যে যাহারা ষড়যন্ত্র, নরহত্যা বা শান্তি ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী তাহারা ব্রিটিশ সংবিধান অনুসারে গ্রেপ্তার, আটক বা নিপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের অধিকারী নয়। কিন্তু আমি বলিব কোনো আদালত আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে নাই বা কোনো আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে গ্রেট ব্রিটেনের বা ডোমিনিয়নগুলির সংবিধান মতে, যে ব্যক্তির উপরোক্ত কোনো অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে একমাত্র তাহার সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

১০. ইহা বলা হইতে পারে যে ভারত সরকার আইনে তো গ্রেপ্তার, আটক ও নিপীড়ন হইতে অব্যাহতি দিবার কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই ও ওই আইনে এরূপ অধিকারের কথা ভাবাই হয় নাই। জবাবে আমি বলিব যে সংসদীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা শুধু লিখিত আইনের উপর নির্ভর করে না। ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে এই-বিষয়ক আইন প্রথম লিখিত রূপ লাভের আগেই তো ওইসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বর্তমান ছিল। এবং পার্লামেন্ট প্রথম হইতেই ওইগুলিকে তাহার সনাতন ও তর্কাতীত অধিকার বলিয়া দাবি করিয়াছে এবং মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া রাজা সেই দাবি মানিয়া নিয়াছেন। উপরন্তু, ব্রিটিশ ভারতে সাধারণ ইংরেজ আইনের মূলসূত্রগুলি ও ল অফ ইকুইটি সাধারণ-ভাবে প্রযোজ্য হইয়া থাকে, যদি অবশ্য কোনো ক্ষেত্রে বিরুদ্ধার্থক সুনির্দিষ্ট আইন না থাকে। ব্রিটিশ সংবিধানের সাধারণ মূলসূত্র ও মর্মবস্তুর আলোতেই ভারত সরকার আইনের ব্যাখ্যা করিতে হইবে ও উহার প্রয়োগ করিতে হইবে—যদি অবশ্য ভারত সরকার আইনে বিরুদ্ধার্থক কিছু না থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে ইংরেজ আইনের প্রযোজ্যতার পক্ষে যুক্তির সমর্থনে আরো বলা যায় যে কলিকাতা একটি প্রেসিডেন্সি শহর ও আমার নির্বাচনকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ামে অবস্থিত হাই-কোর্টের আদি অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়াছে। আমার মনে হয় এই সংকটে বঙ্গ সরকারের কার্যনির্বাহী অফিসাররা কোন্ পথ অনুসরণ করিবেন তাহা অনেকাংশে নির্ভর করিবে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ কী মনোভাব অবলম্বন করেন তাহার উপর।

১১· এ কথা বলা হইতে পারে যে, আমি বিধান পরিষদের সদস্য হইবার বহু পূর্বে গ্রেপ্তার হইয়াছি ও আমার নির্বাচকমণ্ডলী আমাকে নির্বাচিত করার আগেই জানিতেন যে তাঁহারা একজন বন্দীকে ভোট দিতেছেন ; তাই বিধান পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের সময় আমাকে মুক্তি দিবার আমি যে দাবি জানাইতেছি তাহার পক্ষে যুক্তি নাই। কিন্তু ইহার জবাবে আমি বলিব যে আমি যখনই গ্রেপ্তার হইয়া থাকি-না কেন, যে মুহূর্তে আমি বিধান পরিষদের সদস্য হইয়াছি সেই মুহূর্তেই আমি একজন সদস্যের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছি। ফলে, বিধান পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার চল্লিশ দিন আগে হইতেই গ্রেপ্তার, আটক ও নিপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের অধিকার স্বভাবতই আমাতে বর্তিয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হইবার আগেই স্যার টমাস শার্লিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহাকে রাজা মুক্ত করিয়া দেন। কারণ তাঁহাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত হাউস অফ কমন্স অধিবেশনের কাজ শুরু করিতে দিতেই অস্বীকৃত হয়। উপরন্তু, আমার নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে এই আশা পোষণ করাও সম্পূর্ণ সংগত ও বিধিসম্মত যে আমার নির্বাচনের পর বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আসন্ন হইলে আমাকে সংসদীয় অধিকার বলে মুক্তি দেওয়া হইবে ও আমি পরিষদের কার্যধারায় অংশ লইতে পারিব। যদি সেই বিধিসম্মত প্রত্যাশা পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে সেজন্য আমার নির্বাচকমণ্ডলী নিশ্চয়ই দায়ী নয়।

১২· মহাশয়, আপনি সহজেই বুঝিবেন যে বংগীয় বিধান পরিষদের অধিবেশন চলাকালে আমাকে জোর করিয়া জেল-হাজতে আটক রাখার ফলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। সকল আধুনিক সংবিধানেই বিধানমণ্ডলের স্বাধীনতা বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছে ও সরকারের প্রভুত্ব হইতে বিধানমণ্ডলের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি মৌল আবশ্যকীয় উপাদান রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি সরকার নিজেদের খুশিমতো বিধানমণ্ডলের অধিবেশনের সময় উহার সদস্যদের গ্রেপ্তার করিতে পারেন তবে তাঁহারা দেশের সমগ্র আইন-প্রণয়নের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবেন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিনা-বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিবার আদেশ দিয়া সরকার বিচারবিভাগীয় বা আধা-বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা যদি আত্মসাৎ করেন তবে তাহা নিন্দনীয় ; কিন্তু যখন বিধানমণ্ডলের গ্রেপ্তারকরা সদস্যদের বিধানমণ্ডলের বিতর্কধারায় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া না হয় তখন তাহা অসহনীয় হইয়া ওঠে। কোনো যুক্তিশীল

মানুষ কি এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারে যে সরকারের আসল উদ্দেশ্য হইল বিধান-মণ্ডলে বিরোধী পক্ষকে আঘাত করা ? এবং মহাশয়, বিধানমণ্ডলকে দিয়া জন-নিন্দিত আইন পাস করাইয়া লওয়ার জন্য সরকার বিধান পরিষদের বহুতর সংখ্যক সদস্যকে গ্রেপ্তার করিলেই বা বাধা দিবে কে ? আইন-প্রণয়ন যদি সম্পূর্ণভাবে সরকারের ইচ্ছামতো হইতে পারে তবে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির এখনো যেটুকু দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব আমার বর্তমান আটকা-বস্থার ফলে শুধু সংসদীয় সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নই দেখা দেয় নাই তদপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ— বিধানমণ্ডলের স্বাধীনতার মৌল প্রশ্নটিও দেখা দিয়াছে। বর্তমান বিসদৃশ অবস্থার অবিলম্বে উন্নতি না ঘটিলে একটি অতিশয় কুৎসিত নজীর স্থাপিত হইবে। উহা জনগণের সাংবিধানিক স্বাধীনতার পথে একটি স্থায়ী বিপদ-স্বরূপ হইয়া দেখা দিবে।

১৩. তর্কের খাতিরে যদি এ কথা স্বীকারও করিয়া লই যে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন বা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় রেগুলেশন অনুসারে, যাঁহাকে খুশি গ্রেপ্তার করার ও আটক রাখার বৈধ অধিকার সরকারের আছে, তবু এ কথা সত্য নয় যে বিধানমণ্ডলের অধিবেশন চলাকালে উহার একজন সদস্যকে জোর করিয়া আটক রাখার ক্ষমতা সরকারের আছে। এক-মাত্র বিধানমণ্ডলে আইন বা প্রস্তাব পাস করাইয়াই সদস্যদের সুবিধা বাজেয়াপ্ত করা যায়। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে, অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে, হাউস অফ কমন্সের অধিবেশন চলাকালে পার্লামেন্টের সদস্য টমাস থর্পকে আটক রাখা হইয়াছিল। এই বিষয়টি আদালতে পেশ করা হইলে বিচারকরা রায় দেন যে পার্লামেন্টের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আদালত বিচার করিতে পারে না, একমাত্র পার্লামেন্টই উহা বিচার করার অধিকারী। বিচারকদের এই রায় যদি যথার্থ হইয়া থাকে তবে রাজার কার্যনির্বাহী অফিসাররা যে বিধানমণ্ডলের সদস্যদের অধিকার নির্ধারণ করিতে পারেন না ইহা আরো কত সত্য !

১৪. আমাকে বর্তমানে আটক রাখা যে অবৈধ তাহা এই তথ্য হইতে আরো সুস্পষ্ট হয় যে মহামান্য গভর্নরের আদেশক্রমে আমাকে বিধান পরিষদের অধি-বেশনে যোগ দিতে বলা হইয়াছে ; অথচ যে পরোয়ানা বলে আমি এখানে আটক আছি তাহা তাঁহার অধীনস্থ একজন রাজকর্মচারী জারি করিয়াছেন। আমি সুনিশ্চিত যে সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন যে সরকারের দুইজন সদস্য পৃথক পৃথক আদেশ জারি করিলে যদি একটির সঙ্গে আর-একটি আদেশের বিরোধ দেখা

দেয় তবে ঊর্ধ্বতন অফিসার যে আদেশটি জারি করিয়াছেন তাহাই বলবৎ হইবে। তাহা ছাড়া, ওই পরোয়ানা জারি হওয়ার বহু পরে মহামান্য গভর্নরের আদেশক্রমে বিধান পরিষদে যোগ দিবার সমনটি জারি হইয়াছে। অতএব আইন অনুযায়ী শেষোক্ত শমনটি পূর্বোক্ত পরোয়ানাটি অপেক্ষা বলবত্তর হইবে এবং উহা মান্য করিতে হইবে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে যখন ঐ সমনটি জারি করা হইয়াছে তখন আমি যাহাতে ঐ সমন মানিয়া লইয়া কাজ করিতে পারি সেজন্য আমাকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল।

১৫. আমাকে এখনো আটক রাখার একটি ফল হইল এই যে আমাকে রাজানুগত্যের শপথ লইতে বাধা দেওয়া হইতেছে। বঙ্গীয় নির্বাচকমণ্ডলী নিয়মাবলীর ২৫ নং নিয়ম বলিতেছে যে কোনো সদস্য যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করিলে তাহার আসনটি শূন্য বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে। এই নিয়ম নিশ্চয়ই আমার বেলাও প্রযোজ্য। কিন্তু পরিস্থিতি যে কতদূর করুণ তাহা ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে আমাকে আনুগত্যের শপথ লইতে বাধাদানের ব্যাপারে সরকার নিজেই দায়ী।

১৬. মহাশয়, আপনি জ্ঞাত আছেন যে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে হাউস অফ কমন্সের অধিবেশন চলাকালে টমাস থর্পকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইলে পার্লামেন্ট নির্ভীক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শুধু মুক্তই করে নাই, রাজার যে-সব অফিসার তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও আটক করার জন্য দায়ী ছিলেন তাঁহাদের শাস্তিবিধানও করিয়াছিলেন। ইংলন্ডের তৎকালীন রাজা অষ্টম হেনরি পার্লামেন্টের এই কাজের প্রশংসা করিয়া এই স্মরণীয় কথাগুলি বলিয়াছিলেন ঃ "পার্লামেন্টের এই সময়ের মতো আর কখনো রাজকীয় ক্ষেত্রে এত উন্নত মস্তকে আমরা দাঁড়াই নাই। সংসদীয় ব্যবস্থার শীর্ষে আমি রহিয়াছি, আপনারা আছেন সদস্য রূপে ; কিন্তু আমরা সম্মিলিতভাবে ও একত্রে একটি রাষ্ট্রকাঠামো রচনা করিয়াছি ; এখন যদি কেহ সংসদের সামান্যতম সদস্যেরও কোনো হানি ঘটায় তবে আমাদের সকলের হানি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিব। পার্লামেন্ট তাহার বিচার করিবে। পার্লামেন্টের এই বিচার করার অধিকার এত চূড়ান্ত যে (আমার সুবিদ্বান উপদেষ্টাও তাহাই বলিতেছেন) নিম্নতর অন্য যে-কোনো আদালতের বিচার বা আইন এ ক্ষেত্রে আপাতত স্থগিত থাকিবে ও পার্লামেন্টের রায়ই চূড়ান্ত হইবে।" এবং তারপর "প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড মণ্টাক্যুট রাজা যাহা বলিয়াছেন তাহা সবই সমর্থন করিয়া নানাবিধ যুক্তি দেখাইলেন ; অপর কেহই ইহার বিরুদ্ধে

বলিলেন না, সকলেই এই মত সমর্থন করিলেন।" আমার সন্দেহ নাই যে বর্তমান সাংবিধানিক সংকটে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ যদি তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন তবে তাঁহারাও আমাদের প্রদেশের প্রশাসনিক প্রধানের নিকট হইতে অনুরূপ প্রশংসাবাক্য লাভ করিবেন।

১৭. ভারত সরকার আইনে বলা হইয়াছে যে বঙ্গীয় বিধান পরিষদই উহার অধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন। আমি মনে করি, ভারত সরকার আইনেই যে বিধান-মণ্ডলের স্বাধীনতা কল্পিত হইয়াছে এই তথ্য তাহারই ইঙ্গিতবাহী।

১৮. আমার দৃঢ় মত এই যে, বঙ্গীয় বিধান পরিষদের বিচার-বিতর্কে আমাকে অংশ লইতে রাজনৈতিক কারণে বাধা দেওয়া হইবে কিনা তাহা পরিষদই বলিবেন, অপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা নয়। পরিষদ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ব্যবস্থা লইতে পারেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন উইলকিন্স এম. পি. মহাশয়ের ক্ষেত্রে যেমন ঘটিয়াছিল আমাকেও যদি তেমন ভাবে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ বহিষ্কার করিয়া দেন তবে বরং আমি তাহাও স্বাগত জানাইব— কিন্তু সরকারের ইচ্ছা বা আদেশ বলে আমাকে যে পরিষদে যোগদান করিতে দেওয়া হইতেছে না ইহা আমি মানিয়া লইব না। অবশ্য সরকারকে চিরতরে বিধানমণ্ডলের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

১৯. বঙ্গীয় বিধান পরিষদ উঁহার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কী ব্যবস্থা লইবেন তাহা আমার বলিয়া দিবার কথা নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার যথোচিত স্বীকৃতি দিতে সরকারকে বাধ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা বিধান পরিষদের আছে। হাউস অফ কমন্সের গৌরবজনক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সরকারী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে সদস্যরা অস্বীকার করিবেন, না, কোনো কাজ চালাইতেই তাঁহারা অস্বীকার করিবেন তাহা সদস্যরাই স্থির করুন। মহাশয়, প্রতিকারের অপর কোনো উপায় আপনাকে স্থির করিতে হইবে। যতক্ষণ না অন্যায়ের প্রতিকার করা হয় ও যথোচিত ত্রুটি শোধন না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত বারম্বার সভা মুলতবী ঘোষণার দ্বারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা আপনার উচিত।

২০. আমি বলিতে চাই যে সরকার যদি অবিলম্বে সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করিয়া না লন তবে আইন পাস করিয়া ওই-সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব। ভারতে এরূপ আইন-প্রণয়ন সম্ভব ও

ভারত সরকার আইনে এমন কিছুই নাই যাহা উহাতে বাধা দিবে বা উহাকে নিষিদ্ধ করিবে। মহাশয়, আপনি জ্ঞাত আছেন যে কেপ কলোনি ও নিউফাউন্ডল্যান্ডের সংবিধানে এই-সব সুযোগ-সুবিধার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। কিন্তু সাধারণ আইন পাস করিয়া তাঁহারা সেখানে সুযোগ-সুবিধাগুলি আদায় করিয়াছেন। উপরন্তু, ইহাও একটি সুপরিজ্ঞাত তথ্য যে কানাডার বিভিন্ন প্রদেশে, যথা, ওন্টারিও, কুইবেক, বৃটিশ কলম্বিয়া, ম্যানিটোবা, নোভা স্কোশিয়া, নিউ বার্নস-উইক, প্রিন্স এডোয়ার্ড আইল্যান্ড, অ্যালবার্ট ও সাসকাচেওয়ান আইন পাস করিয়া নিজেদের সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছে। যদিও ওই প্রদেশগুলির সংবিধানে সংসদীয় সুযোগ-সুবিধার কোনো উল্লেখই নাই তবু ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের সুবিখ্যাত ফীল্ডিং বনাম টমাস মামলায় বৃটিশ প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটি ঐ আইনগুলির যৌক্তিকতা চূড়ান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

২১. পরিশেষে আমি আশা করি যে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্যগণ বিষয়টির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফলাফল উপলব্ধি করিবেন ও তাঁহাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষাকল্পে তাঁহাদের ক্ষমতার মধ্যে যে-সব ব্যবস্থা লওয়া সম্ভব তাহা লইবেন। আমি মনে করি, ইহা সাংবিধানিক স্বাধীনতার মহান সংগ্রামের অংগীভূত একটি ঘটনা। মহাশয়, আমি আশা করি যে হাউস অফ কমন্সের বহু প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষের প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপনি এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিবেন। আপনার পরিচালনায় সদস্যরা যদি পরিস্থিতির যোগ্য ভূমিকা নেন তবে এক পবিত্র সংগ্রামের বীর রূপে তাঁহাদের নাম ভবিষ্যতে বন্দিত হইবে।

ইতি—

আপনার অনুগত সেবক
(স্বাক্ষর) এস. সি. বোস
(কলিকাতা উত্তর অমুসলমান
নির্বাচন কেন্দ্রের এম. এল, সি.)

'ফরওয়ার্ড'
১১ জুন ১৯২৮

দেশবন্ধুর জীবন

দেশবন্ধুর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে, তাঁহার সকল চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের মাঝে একই আদর্শ সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিত। যে আদর্শ, যে সত্য পরিণত বয়সে তাঁহার অবলম্বন হইয়াছিল— সে সত্যে পেঁাছিবার পূর্বে তিনি বিবিধ অনুভূতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই-সকল অনুভূতি তাঁহার বিভিন্ন সময়কার কবিতা ও রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যে বিরুদ্ধভাবের সন্নিবেশ হইয়াছে। কিন্তু সত্যের উপলব্ধি নির্ভর করে অধিকারীর মনের অবস্থার উপর। মানুষের মন স্বভাবত গতিশীল, এই গতিশীল মন, একটার পর একটা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণতর সত্যের দিকে আগুয়ান হয় ও বৈদান্তিক যেরূপ "নেতি", "নেতি" করিয়া পূর্ণ সত্যের দিকে ধাবমান হন, বৈষ্ণব-সাধকও তদ্রূপ "ইহ বাহ্য", "ইহ বাহ্য" বলিয়া চরম তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ শুধু যে মায়াবাদী বৈদান্তিক বাস্তব জগৎটাকে "মায়া" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, কিন্তু বৈষ্ণব-সাধক সৃষ্টিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া ভগবানের কোলে তাকে স্থান দিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সাধক যখন এক-একটি স্তর অতিক্রম করেন তখন মায়াবাদীর মতো তিনি সেটাকে অস্বীকার করেন না। সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর তাঁহার নিকট মিথ্যা বা মায়া নয়। তবে তিনি যখন চরম তত্ত্বে উপনীত হন, তখন নূতন আলোকে তাঁহার মন উদ্ভাসিত হয়। তাঁহার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন রূপান্তরিত হয়। তখন উপনিষদের ভাষায় সাধক বলিতে পারেন, "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। দেশবন্ধু তাঁহার "রূপান্তরের কথা" ও অন্যান্য প্রবন্ধে এই সাধনার প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

দেশবন্ধুর উদারতা, সার্বভৌমিক দৃষ্টি ও সমন্বয়ের ক্ষমতা তাঁহার সারা জীবনের সাধনার ফল, শুধু আজন্মলব্ধ বলিয়া ইহার কারণ নির্দেশ করিলে চলিবে না। তিনি যে-রকম তত্ত্বে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ; 'লীলা'র দ্বারা তিনি সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতেন। রস-মাধুর্য উপভোগ, প্রেম-আনন্দের আস্বাদই— তো জীবনের উদ্দেশ্য। "রসের" মধ্য দিয়া, প্রেমের ভিতর দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া— মানুষ চরম আদর্শে পেঁাছিয়া থাকে কারণ "রসো বৈ সঃ" —ভগবান রসময়। দেশবন্ধু যে রসের প্রেমের ও আনন্দের সাধক ছিলেন তাহা

বুঝা যাইত তাঁহার জীবন দেখিলে। তাঁহার মতো রসিক, প্রেমিক ও সদানন্দ পুরুষ কি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

চরম তত্ত্বে পেঁাছিবার পর তিনি জীবনের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার জীবনের রূপান্তর আরম্ভ হয়। ঐশ্বর্য তিনি ধূলিরাশির মতো দূরে নিক্ষেপ করিলেন— পূর্বজীবনের অভ্যাস মুহূর্তের মধ্যে বর্জন করিলেন। তাঁর সকল চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। বাহিরের ঐশ্বর্য বর্জন করিয়া তিনি অন্তরের ঐশ্বর্যে মহীয়ান হইলেন ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি যে শুধু প্রেমের সাধক ছিলেন তাহা নয় তিনি শক্তির সাধকও ছিলেন। "কালী-কৃষ্ণের" মূর্তির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের যে সমন্বয় বাঙালী করিয়াছে তাঁহার জীবনে এবং তাঁহার জীবনের সাধনায়ও সেই সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার তন্ত্র বাংলার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বাংলার নব্য ন্যায়ই বাংলার বৈশিষ্ট্যের প্রধান হেতু। দেশবন্ধুর জীবনে এই ত্রিবেণীসংগম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন তর্কে অজেয়, শক্তিতে দুর্নিবার ও প্রেমে অদ্বিতীয়। ন্যায়, তন্ত্র ও ভাগবত এই তিনের সমন্বয় না হইলে মানুষের জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর ও বৈচিত্র্যময় হইতে পারে না। বাঙালীর সভ্যতার মধ্যে এই সমন্বয় হইয়াছে বলিয়া বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বাংলার গৌরবের সম্পদ।

দেশবন্ধু ছিলেন আদর্শ বাঙালী। সভ্যতার তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রতীক-স্বরূপ। তিনি বাংলাকে বুঝিয়াছিলেন, বাংলাও তাঁহাকে বুঝিয়াছিল। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড়ো গর্ব ছিল এই যে তিনি বাঙালী। বাঙালীও তাই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছে। এমন নিবিড়ভাবে কি বাংলার হৃদয় কেহ কখনো অধিকার করিতে পারিয়াছে?

'বাঙ্গলার কথা'
১৬ জুন ১৯২৮

কলিকাতা কর্পোরেশনের দুইটি সমস্যা

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হইবার সুযোগ যখন আমার হইয়াছিল তখন হইতে সড়ক-দপ্তর সম্পর্কে আমার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট মতামত আছে। জনসাধারণ অবগত আছেন যে এই মহানগরীর রাস্তাঘাটের অবস্থা কিছুকাল যাবৎ অসন্তোষজনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মৌলিক প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। আসল কথা, এই নগরীর ক্রমপ্রসারের সঙ্গে তাল রাখিয়া আমাদের রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন করা হয় নাই। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বিদ্যুৎ দপ্তর ও নিকাশী দপ্তরের মতো সড়ক-নির্মাণ ও সড়ক-উন্নয়নের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সড়ক-দপ্তর আমাদের নাই। বর্তমানে জেলা ইঞ্জিনীয়াররা সরাসরি পথ-ঘাটের তদারক করেন। সড়ক-নির্মাণে দক্ষ কোনো সড়ক-ইঞ্জিনীয়ার আমাদের নাই। চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে সর্বাঙ্গীণ দক্ষতার অধিকারী বলিয়া গণ্য করা হইলেও অ্যাশফল্টের কাজ ভিন্ন প্রত্যক্ষভাবে সড়ক-দপ্তর সম্পর্কে তাঁহার আর কিছুই প্রায় করণীয় নাই। বছরে বছরে সড়ক-নির্মাণ ও সড়ক-উন্নয়নের কাজ দেখাশোনা করিতে পারে নিকাশী-দপ্তর। জেলা ইঞ্জিনীয়ারদের খামখেয়ালি ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের দাবি ও করদাতাদের প্রয়োজন অনুসারে এলোমেলোভাবে কাজ চালানো হইয়া থাকে। নীতির অভাববশত নগরীর সব অঞ্চলকে সকল সময়ে সমদৃষ্টিতে দেখা হয় না। বিভিন্ন প্রকার সড়ক-পৃষ্ঠ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত ল্যাবরেটরি নাই। ফল হইয়াছে এই যে যানবাহনের প্রকৃতি অনুসারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সড়ক-নির্মাণ করা হয় না।

একজন সড়ক-ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন

ইহা সুবিদিত যে পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ নগরীতেই সড়ক-নির্মাণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত ল্যাবরেটরি থাকে। সস্তা ও দীর্ঘস্থায়ী নূতন নূতন ধরনের সড়ক-পৃষ্ঠ যাহা ঐ অঞ্চলের বিশেষ ধরনের যানবাহনের পক্ষে উপযুক্ত— তাহা আবিষ্কার করার জন্য সড়ক-ইঞ্জিনীয়াররা সর্বদাই চেষ্টা করেন। যানবাহনও নানা রকমের হইয়া থাকে, যথা, ঠেলা, ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ি, লরি ইত্যাদি। একই সড়ক-পৃষ্ঠ সবরকম যানবাহনের অনুকূল নয়। আমরা যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সড়ক-নির্মাণের প্রশ্নটির সমাধান করিতে চাই তবে যানবাহনের

প্রকৃতি অনুসারে সড়কের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কের জন্য বিভিন্ন ধরনের সড়ক-পৃষ্ঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া নগরীর সকল অঞ্চলকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সড়ক-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত একজন সংরক্ষণের সড়ক-ইঞ্জিনীয়ার থাকিবেন। সড়ক-নির্মাণের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ হইবেন। সড়ক-দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ল্যাবরেটরি থাকিবে যেখানে প্রতিদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হইবে। প্রতিটি শ্রেণীর সড়কের জন্য সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সবচেয়ে সুবিধাজনক সড়ক-পৃষ্ঠ উদ্ভাবনের জন্য পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে হইবে।

এখন পর্যন্ত কর্পোরেশন বিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। সড়ক-দপ্তরটি তাহার ফলে দক্ষ বা বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিতে পারে নাই। রাস্তাঘাট ঠিক রাখিতে জলের মতো অর্থ ব্যয় হইতেছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সস্তা সরঞ্জাম আবিষ্কার করিতে বা সড়ক-পৃষ্ঠ নির্মাণের কম ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কোনো চেষ্টা করা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা আগাইয়া গিয়াছে। তাহারা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত ও কর্ম-পটু। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার উপযুক্ত ল্যাবরেটরিও তাহাদের আছে। বোম্বাই কর্পোরেশনের সড়ক-দপ্তরের কার্যকলাপ ভালো করিয়া জানার জন্য আমাদের সড়ক-দপ্তরের একজন অফিসারকে সেখানে পাঠানো হোক। অন্তত এই কাজটুকু আমরা করিতে পারি।

উপরোক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটি সমস্যার কথাও আমি এখানে বলিতে চাই। আমি কর্পোরেশনের নিকাশী দপ্তরের কথা বলিতেছি। বর্তমানে আমরা আবর্জনার কোনো সদ্ব্যবহারই করিতেছি না। কিন্তু ভারতের অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষভাবে নাগপুরে, কৃষির উন্নতিকল্পে আবর্জনা ব্যবহৃত হয়। নাগপুর পৌরপ্রতিষ্ঠানে একটি বিরাট এলাকা লইয়া আবর্জনায় চাষের পরীক্ষা চালানো হইতেছে। উহা হইতে নাগপুর পৌরপ্রতিষ্ঠান ভালো টাকা আয় করিতেছে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার এতদূর আশাবাদী যে তাঁহার ধারণা যে নিকাশী দপ্তরের যাবতীয় ব্যয় ঐ আবর্জনা-চাষলব্ধ মুনাফা হইতেই মিটানো যাইবে। পৌরপ্রতিষ্ঠান শুধু যে টাকা আয় করিতেছে তাহা নয়, নিজের খামার হইতে সবজি সরবরাহ করিয়া বোম্বাই নগরীর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার লাঘব করিতেছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবর্জনার রূপান্তর করার দরকার হয় না। একটি উচ্চ নিকাশী-প্রণালীর মাধ্যমে খামারে আবর্জনা লইয়া যাওয়া হয়, মাঝে

মাঝে কয়েকটি পয়েন্টে রিজার্ভয়ার থাকে, পচা জল খামারে গিয়া পড়ে ও উহাতে খামারে সেচের কাজ সম্পন্ন হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাপা এলাকা আছে। আবশ্যক হইলে আরো কিছু এলাকা সংগ্রহ করা যায়। এখন যে আবর্জনা নষ্ট হইয়া যায় উহার সাহায্যে ঐ এলাকাগুলির উন্নতি সাধন করিলে কর্পোরেশন অনেক টাকা আয় করিতে পারিবে ও তাহাতে করদাতাগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে।

ভারতের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের তুলনায় যে দুইটি বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন পিছাইয়া আছে আমি শুধু তেমন দুইটি সমস্যার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু আরো কয়েকটি সমস্যার কথা আমি বলিতে পারি। কলিকাতা কর্পোরেশন যদি ভারতের অগ্রণীতম কর্পোরেশন রূপে নিজের খ্যাতি বজায় রাখিতে চায় তবে নিজের জড়তা উহাকে অগৌণে ত্যাগ করিতে হইবে ও আধুনিক দক্ষ ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিভিন্ন পৌরসমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' ১৯২৮
রজত জয়ন্তী সংখ্যায় সংকলিত

ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের পঞ্চাশ বৎসর : ১৮৭৫-১৯২৫

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি হইল এই যে গত পঞ্চাশ বৎসরে কিংবা ইহার অধিক কাল ধরিয়া গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অব্যাহতভাবে কমিয়া আসিয়াছে, যদিও ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের প্রকৃত পরিমাণে খুব বেশি বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের অগ্রগতি আমাদের সমগ্র বাণিজ্যের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া চলে নাই। অন্যভাবে বলা যায় যে অ-ব্রিটিশ দেশগুলির সহিত বাণিজ্য গ্রেট ব্রিটেনের সহিত বাণিজ্যের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বাড়িয়াছে। উন-বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যত গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আমাদের বাণিজ্য উন্নয়নের সমার্থবোধক ছিল।

গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আমাদের যে বাণিজ্য তাহাকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে* প্রায় একচেটিয়া অধিকার দিয়াছিল তাহার আরম্ভ কিভাবে হইয়াছিল, সে বিবরণ দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের আওতার বাইরে। পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে আমাদের আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য ক্রমশ গ্রেট ব্রিটেন হইতে অন্যান্য দেশের দিকে প্রসারিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের দিকে, এবং তাহার ফলের কথা উপরে বলা হইয়াছে। নীচের সংখ্যাগুলি এই ঘটনার প্রমাণমূলক :

ভারতের বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা অংশ

১৮৭৫-৭৬	...	৬২ ২
১৮৮০-৮১	...	৫৮·৭
১৮৯০-৯১	...	৫০·৯
১৯০০-০১	...	৪৫·১
১৯০৫-০৬	...	৪২·৯
১৯১০-১১	...	৩৯·১

---

* ভারত-ব্রিটিশ প্রথম দিকের বাণিজ্য সম্বন্ধে ভালো বিবরণ পাওয়া যাইবে ডঃ বালকৃষ্ণ-র 'কমার্শিয়াল রিলেশনস বিটুইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড' ও অধ্যাপক সি. জি. হ্যামিল্টনের 'ট্রেড রিলেশনস্ বিটুইন ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া'তে।

১৯১৫-১৬	...	৪৭·৪*
১৯২০-২১	...	৪১·৮
১৯২৫-২৬	...	৩২·১

গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা অংশে এই হ্রাস আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে গ্রেট ব্রিটেনের অংশ সর্বদাই আমাদের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বাণিজ্যে অধিকতর হইয়াছে। রপ্তানির পরিমাণ বরাবর কম হইলেও ইহার হ্রাস তবু তুলনামূলকভাবে আমদানির হ্রাস অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পরিলক্ষিত। নীচের সংখ্যাগুলি তাহা প্রমাণ করিবে :

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা অংশ

	আমদানি	রপ্তানি
১৮৭৫-৭৬	৮৬·০	৪৮·৩
১৮৮০-৮১	৮২·৮	৪১·৬
১৮৯০-৯১	৭৬·৪	৩২·৭
১৯০০-০১	৬৫·৬	৩০·৭
১৯০৫-০৬	৬৮·৫	২৫·১
১৯১০-১১	৬২·১	২৪·৮
১৯১৫-১৬	৬০·৪	৩৮·১
১৯২০-২১	৫৮·৮	১৯·৪
১৯২৫-২৬	৫০·৯	২১·০

আমাদের আমদানিতে সমগ্র বাণিজ্যের অর্ধাংশের বেশি ছিল গ্রেট ব্রিটেনের এবং সে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছিল। তাহার পরে যে দেশটির স্থান ছিল অর্থাৎ জাপানের, ১৯২৫-২৬ সালে তাহার অংশ ছিল মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। কিন্তু ভারতীয় পণ্যের ব্যবহারক হিসাবে ব্রিটেন বহু পূর্বেই অনুরূপ অবস্থা হারাইয়াছিল। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা নিকট-অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ১৯২৫-২৬ সালে গ্রেট ব্রিটেন, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা অংশ ছিল যথাক্রমে ২১·০, ১৫·০ এবং ১০·৪ ভাগ।

---

* যুদ্ধকালে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য ভারতীয় কাঁচামাল বহুল পরিমাণ রপ্তানি হওয়ায় ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যে একটা সাময়িক বৃদ্ধি হইয়াছিল।

২

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা অংশ হ্রাসের কারণ খুঁজিতে বেশি দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। প্রথম দিকে ওই দেশটির প্রাধান্যের কারণ ছিল সে ভারতের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের দরুন যে-সব অদ্ভুত সুবিধা ভোগ করিত সেইগুলি।* রাজনৈতিক দিক হইতে সে ছিল এ-দেশে অপ্রতিহত প্রভাবের অধিকারী। আমাদের বাণিজ্যকে প্রায় পুরাপুরি ব্রিটিশ জাহাজের উপর নির্ভর করিতে হইত; অধিকাংশ রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী সংস্থা ছিল ব্রিটিশ; তেমনই ছিল বিনিময় ব্যাংকগুলি ও বীমা কোম্পানিগুলি। ভারতের রেলওয়ে বহুলাংশে ব্রিটিশ মূলধনের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থের পরিবর্ধক ব্রিটিশ জাহাজগুলির দ্বারা পরিচালিত হইত।†

কৃষিবিষয়ক শিল্পগুলির (তাহাদের কতকগুলির পিছনে ছিল ব্রিটিশ মূলধন) অনেকগুলির ব্রিটিশ বাজারে (যেমন চা, কফি) সরবরাহের উদ্দেশ্যে আরম্ভ ও উন্নয়ন করা হইয়াছিল।

সরকারের কৃষিনীতিও ব্রিটেনের রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে পাট, তুলা, গম ও তৈলবীজের মতো কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহদানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে উৎপন্ন পণ্যে ভারতের দাবি মিটানোর জন্য ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য শিল্পোন্নত দেশ। কয়েকটি উৎপন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে (যেমন তুলাজাত পণ্য) ভারত সরকারের শুল্ক-বিষয়ক আইন আমদানিকে সরাসরি উৎসাহিত করিত। ভারতের যে-সব উৎপাদনকারী শিল্প ওই দেশের সহিত আমাদের আমদানি বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত করিতে পারিত এই ধরনের আইন সেই-সব শিল্পের বৃদ্ধি পরোক্ষভাবে সীমিত করিত।

সুতরাং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্য ছিল দুইটি কারণের সম্মিলিত ফল: ওই দেশটির কাছে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব এবং পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পগত শ্রেষ্ঠত্ব।

পরে পৃথিবীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক

* ড. এস. জি. পনান্দিকর-এর 'ইকনমিক কনসিকোয়েনসেস অব দি ওয়ার ফর ইণ্ডিয়া' পৃ. ৬৬-৬৭; আর অধ্যাপক আর. এম. যোশীর 'ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট ট্রেড', পৃ. ১৬০-৬১ ও ১৬৪ দ্রষ্টব্য।

† প্রসঙ্গত রেলওয়ের উন্নয়ন গ্রেট ব্রিটেন হইতে আমদানি বৃদ্ধি করিয়াছিল, যেহেতু রেলওয়ে গঠনের জন্য সব উপকরণ সেখান হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল।

স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সহিত বাণিজ্যের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ব্রিটেনের অংশ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে। অ-ব্রিটিশ দেশগুলির সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে এই কারণে যে ভারতীয় বাজার প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকার মুক্ত বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেখানে ব্রিটেনই ছিল একমাত্র বড়ো শিল্পোন্নত দেশ, সেখানে জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো দেশগুলিতে পরবর্তী শিল্পোন্নয়নের ফল হইয়াছে এই যে প্রধানত গ্রেট ব্রিটেনের পরিবর্তে এই-সব দেশ হইতে বৃহত্তর পরিমাণে উৎপন্ন পণ্য আমদানি করা হইতেছে।

পক্ষান্তরে এই শিল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের উৎপাদন শিল্পগুলিকে বৃদ্ধি করার মতো কাঁচামালের নিশ্চিত ভাণ্ডার ভারতে পাইয়াছে ; কিন্তু নিজেদের পণ্যের জন্য ভারতীয় বাজার দখল করিতে তাহাদের ব্রিটেনের সহিত যে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা ভারত হইতে কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছিল না। কারণ, যেখানে অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের আমদানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন প্রতি পদে সংগ্রাম করিতেছিল এবং তাহা সংকুচিত করিতেছিল, সেখানে যে দেশ তাহাকে সর্বাধিক মূল্য দিত সে দেশের কাছে ভারতের কাঁচামাল বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভারতের ছিল। সুতরাং অ-ব্রিটিশ দেশগুলির পক্ষে ভারতীয় পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের পণ্য দ্বারা ব্রিটিশ আমদানিকে স্থানচ্যুত করা তুলনামূলকভাবে সহজতর ছিল।

এইজন্যই অ-ব্রিটিশ দেশগুলির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাদের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের বাণিজ্য অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে এই দেশগুলির দিকে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

৩

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না যে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের পরিমাণে প্রকৃত হ্রাস হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ভারত এবং অন্য যে-কোনো দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্বাধিক বাণিজ্য হইয়াছিল গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এবং নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে ইহার ইশারা পাওয়া যায় :

লক্ষ টাকার হিসাবে মূল্য

	ব্রিটেনে রপ্তানি	ব্রিটেন হইতে আমদানি	ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের মোট পরিমাণ
১৮৭৫-৭৬	২৮০৯	৩২২৮	৬০৩৭
১৮৮০-৮১	৩১০৫	৪৪০৩	৭৫০৮
১৮৯০-৯১	৩২২৭	৫৫০২	৮৭৭৯
১৯০০-০১	৩২০৫	৫৩১০	৮৫১৬
১৯০৫-০৬	৪০৭০	৭৬৮৫	১১৭৫৫
১৯১০-১১	৫২২৪	৮৩১১	১৩৫৩৩
১৯১৫-১৬	৭৬০০	৮৩৫২	১৫৯৫২
১৯২০-২১	৫২৯৭	২০৪৬০	২৫৭৫৭
১৯২৫-২৬	৮০৯৭	১১৫৩২	১৯৬২৯

এইভাবে ১৮৭৫-৭৬ হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্রিটেনের সহিত আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং এই বৃদ্ধির পরিমাণ অন্য যে-কোনো দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি। সুতরাং ব্রিটেনের শতকরা অংশে যে ক্রমিক হ্রাস ঘটিয়াছিল তাহা হইয়াছিল ভারতের সমগ্র বাণিজ্যের সাধারণ বৃদ্ধির সহিত তাহার তাল রাখার অসামর্থ্যের দরুন। নিম্নের সূচক সংখ্যাগুলি হইতে ইহার পরিমাণ অনুমান করা যায় :

	সমগ্র ভারতীয় বাণিজ্য	ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য
১৮৭৫-৭৬	১০০	১০০
১৮৮০-৮১	১৩১	১২৪
১৮৯০-৯১	১৭৭	১৪৫
১৯০০-০১	১৯৪	১৪১
১৯০৫-০৬	২৮২	১৯৪
১৯১০-১১	৩৫৪	২২৪
১৯১৫-১৬	৩৪৮	২৬৪
১৯২০-২১	৬৩৪	৪২৬
১৯২৫-২৬	৬৩০	৩২৫

আগেই যেরূপ বলা হইয়াছে ভারতের আমদানি বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্য অধিকতর সম্পূর্ণ। আমাদের সমগ্র আমদানি যে ব্রিটেন হইতে আমদানির সহিত সমতা রাখিয়া চলিয়াছে ইহার মধ্যে তাহা প্রতিফলিত। ওই দেশ হইতে দুই দিকে আমদানির হেরফেরের পরে অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়াছে আমাদের সমগ্র আমদানিতে অনুরূপ হেরফের। রপ্তানির ক্ষেত্রে কিন্তু এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই— কোনো কোনো বিশেষ বৎসরে ব্রিটেন হইতে রপ্তানির বিপরীত দিকে আমাদের রপ্তানির গতি দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহার কারণ হইল এই যে আমাদের সমগ্র রপ্তানির মাত্র এক ভগ্নাংশ ব্রিটেনে যায়। কিন্তু ভারতের আমদানি বাণিজ্যে ওই দেশের আধিপত্য এত সম্পূর্ণ যে অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য নির্বিশেষে প্রতি বৎসর আমাদের সমগ্র আমদানি ব্রিটেন হইতে আমদানির সহিত উহা উঠা-নামা করিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আমাদের আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে যে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পণ্যটি সহায়তা করিয়াছে তাহা হইল তুলাজাত পণ্য। তুলাজাত পণ্য উৎপাদনে ইংল্যান্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ এবং ভারত তাহার সর্বোত্তম ক্রেতা। বস্তুত যে-সব দেশ তুলাজাত পণ্য আমদানি করে তাহার মধ্যে ভারতের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। এই একটি পণ্য ব্রিটেন হইতে ভারতের সমগ্র আমদানির মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হইল ধাতুদ্রব্য,' যন্ত্রপাতি, রেলওয়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি। আমাদের পর্যবেক্ষণ কালের সাম্প্রতিকতম বৎসরগুলিতে ইহাদের প্রতিটি দফার আমদানি মূল্য ছিল দশ কোটি টাকারও বেশি। এগুলি ছাড়া, বহু গৌণ পণ্যও আছে। অবশ্য আমদানির অধিকাংশের মধ্যে আছে তুলাজাত পণ্য, ধাতুদ্রব্য ও তজ্জাত পণ্যাদি এবং এই-সব পণ্যের মধ্যেই ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের অগ্রগতি প্রধানত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

ব্রিটেনে রপ্তানির মূল্য সেখান হইতে আমদানির মূল্য অপেক্ষা কম হইয়াছে এবং আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম হইয়াছে— এই ঘটনা ছাড়াও আর-একটি বিপরীত ঘটনাও দ্রষ্টব্য। আমদানির দিকে তুলাজাত পণ্য বাণিজ্যের অধিকাংশ হইলেও রপ্তানির দিকে এরূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যেখানে আমদানির গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলি বরাবর নিজেদের তুলনামূলক অবস্থা ঠিক রাখিয়াছে সেখানে রপ্তানির দিকের পণ্যগুলির বৃদ্ধি ও তুলনামূলক গুরুত্বে সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

প্রথম দিকে রপ্তানির দ্রব্যগুলির মধ্যে কাঁচাতুলার ছিল প্রথম স্থান। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ডান্ডিতে পাটকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির সংগে সংগে পাট উৎপাদনকে বিশেষ উৎসাহিত করায় পাটের ছিল প্রথম স্থান। পরে যে চা-এর রপ্তানি ভারতের নবগঠিত শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি সহ ব্রিটিশ বাজার হইতে চীনা চা-কে দ্রুত তাড়াইয়া দিতেছিল তাহা সর্বপ্রথম সম্মানজনক প্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছিল ১৮৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দে। এইভাবে ১৮৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দে চা, খাদ্যশস্য, কাঁচা পাট ও তুলা যথাক্রমে প্রথম চারটি স্থান দখল করিয়াছিল এবং ইহাদের প্রত্যেকটির রপ্তানি মূল্য ছিল ৪ হইতে ৫ কোটি টাকার মধ্যে।

তাহার পর হইতে যেখানে কাঁচা তুলার রপ্তানি ভীষণভাবে পড়িয়া যাইতেছিল সেখানে অন্য তিনটি দ্রব্যের রপ্তানি আয়তনে বাড়িতেছিল। ১৮৯৯-১৯০০ সালে তুলার রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ২১ লক্ষ টাকার। পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া উল্লিখিত তিনটি দ্রব্য একে অপরটিকে ছাড়াইয়া প্রথম স্থান দখল করিতেছিল। শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু চা নিশ্চিতভাবে সর্বাগ্রগণ্য স্থান দখল করিয়াছিল এবং যদিও কোনো কোনো অস্বাভাবিক বৎসরে খাদ্যশস্যের রপ্তানি চা-কে ছাড়াইয়া গিয়াছিল চা কিন্তু সেই সময় হইতে প্রধান স্থান দখল করিয়া বিদ্যমান। খাদ্যশস্য ও পাটের তুলনায় চা-এর এই ক্রমবর্ধমান আধিপত্য নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য হইয়াছে।

ভারত নিজেই ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বলিয়া শস্যোৎপাদনের স্বল্পতা ও দুর্ভিক্ষ সাপেক্ষে শস্যের রপ্তানি শুধু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভব ছিল এবং ইহার বহু হেরফেরেরও সম্ভাবনা ছিল। পাটের ক্ষেত্রে ভারতে ও অন্যত্র পাট শিল্পে অগ্রগতির ফলে ব্রিটেনে পাটের রপ্তানি সংকুচিত হইয়াছিল। কিন্তু চা-এর উপর এই ধরনের কোনো প্রভাব ছিল না। স্বদেশে ইহার ব্যবহার ছিল নগণ্য এবং অন্যান্য দেশ হইতেও ইহার বেশি দাবি ছিল না। ব্রিটেনের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে চা শিল্প ভারতে চালু করা ও পোষণ করা হইতেছিল এবং ব্রিটেনই ছিল ভারতীয় চা-এর প্রায় একমাত্র বাজার, অন্যান্য দেশে রপ্তানি ছিল খুব কম। চা না থাকিলে ব্রিটেনের রপ্তানিতে আরো বেশি শতকরা হ্রাস দেখা দিত।

ওই দেশের সহিত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হইল কাঁচা ও শোধিত চামড়া, পাটজাত পণ্য, তৈলবীজ, কাঁচা পশম, লাক্ষা, কফি ও টিক কাঠ।

৪

ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা লক্ষ্য করা যাইবে যে আমদানি ও রপ্তানির অধিকাংশ পণ্য দুইদিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে ভোগে।

ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে আমদানির প্রধান পণ্য হইল তুলাজাত পণ্য ও ধাতুজাত পণ্য এবং এই দুইটিই স্বদেশী ও বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। পূর্বোক্তটির ক্ষেত্রে বর্ধমান স্বদেশী উৎপাদন ও জাপানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রিটেনের পক্ষে বড়ো রকমের বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে ইংল্যান্ড হইতে তুলাজাত পণ্যের আমদানি আয়তনে অনেক কমিয়া গিয়াছে। ধাতু এবং ধাতুজাত পণ্যের উৎপাদনে শেষ দিকে বেলজিয়াম ও জার্মানী গ্রেটব্রিটেনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে কতকগুলি ধাতুজাত পণ্যের উৎপাদনে, বিশেষ করিয়া লোহা ও ইস্পাতে, বেলজিয়াম ও জার্মানী হইতে আমদানি বহুলাংশে ব্রিটিশ আমদানিকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাদের দলে যোগ দিয়াছে। তাহার পরে আছে শুল্কের প্রাচীরের আওতায় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্ম।

রপ্তানি ক্ষেত্রে পাট, কাঁচা ও শোধিত চামড়া ও বীজের মতো কাঁচামালে বাণিজ্য সংকুচিত হইয়াছে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তীব্রতর চাহিদার ফলে এবং এই বাণিজ্য ব্রিটেন হইতে অ-ব্রিটিশ দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হইতেছে। পক্ষান্তরে কফি, তুলা ও চা-এর মতো পণ্য ব্রিটিশ বাজারে সরবরাহের ব্যাপারে বিদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং এইভাবে বিদেশের রপ্তানি ভারতের রপ্তানির স্থান দখল করিতেছে। খাদ্যশস্য ও পশমের মতো তৃতীয় একটা শ্রেণীর পণ্যাদিও আছে এবং এগুলির রপ্তানি দেশে যোগানের পরিমাণ ও বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহা দেখা যাইবে যে একমাত্র চা (ইহার রপ্তানিও কিছু পরিমাণে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন) ছাড়া অন্যান্য সকল দ্রব্যের রপ্তানি ক্রমশ গ্রেট ব্রিটেন হইতে অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত হইতেছে। গ্রেট ব্রিটেন ভারতীয় কাঁচাতুলা কিংবা পাটজাত পণ্যাদি আমদানি করিবে না। এই-সব পণ্যগুলির জন্যই শুধু নয় কাঁচাপাট, তৈলবীজ, কাঁচাচামড়া ও শোধিত চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামালের জন্যও ভারত অন্যান্য বাজার খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য প্রসঙ্গে আর-একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে ইহা গ্রেট ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে কম-

বেশি সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে যেখানে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়াছিল সেখানে গ্রেট বিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত তাহার অবস্থা পুরাপুরি সংরক্ষণ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গত যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িতেছিল— ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের বৃদ্ধি ব্রিটেনের সমগ্র বাণিজ্যে বৃদ্ধির অপেক্ষা বেশি ছিল। তাহার পর হইতে ভারতের এই বৃদ্ধি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল যেহেতু ব্রিটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের পরবর্তী উন্নয়ন, ভারতের সহিত তাহার বাণিজ্য অপেক্ষা কিছুটা দ্রুততর গতিতে হইয়াছিল। মোটামুটি ব্রিটেনের বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশ কম-বেশি একই থাকিলেও ভারতের বাণিজ্যে তাহার শতকরা অংশ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমিতেছিল। সুতরাং ভারতে ব্রিটিশ-বাণিজ্যের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করার গুরুত্ব আছে যে ব্রিটেন ভারতের সহিত তাহার বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের সহিত তাহার বাণিজ্যের মতো সমান অগ্রগতি প্রদর্শন করিয়াছিল। বৈপরীত্য প্রকৃতপক্ষে লক্ষণীয়।

নিম্নোক্ত সংখ্যা সূচকগুলি প্রমাণমূলক :

		ব্রিটেনের মোট বাণিজ্য	ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য
গড়	১৯৭৫-৭৯	১০০	১০০
”	১৮৮৫-৮৯	১০৪	১৪৪
”	১৮৯৫-৯৯	১২১	১৪১
”	১৯০৫-০৯	১৭৮	২১০
”	১৯১০-১৩	২০৮	২৬৫
”	১৯১৪-১৮	৩০১	২৭০
বৎসব	১৯২০	৫৮৫	৪২৮
”	১৯২১	৩২২	৩২৭
”	১৯২৫	৩৮৮	৩২৬

ব্রিটেনের সমগ্র বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশ সম্বন্ধে ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে ব্রিটেন যেমন ভারতে অগ্রণী অবস্থায় আছে ভারত ব্রিটেনের ক্ষেত্রে সেরূপ অগ্রণী অবস্থায় নাই। ব্রিটেনের সমগ্র বাণিজ্যের মধ্যে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য একটা ভগ্নাংশ মাত্র। ইহা সত্য যে ব্রিটিশ পণ্যের ব্যবহারক হিসাবে ভারতে। স্থান সর্বাগ্রগণ্য ; কিন্তু যেখানে এই পণ্য আমাদের মোট আমদানির প্রায় শতকরা

৫০ ভাগ সেখানে ইহা মোট ব্রিটিশ রপ্তানির শতকরা ১২ ভাগের মতো মাত্র। ভারতের পণ্য ব্যবহারক রূপেও ব্রিটেনের একই অবস্থা। এইভাবে ১৯২৪-২৫ সালে যেখানে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৫.৫ ভাগ, সেখানে ১৯২৪ সালে ব্রিটেনের আমদানি বাণিজ্যে আমাদের অংশ ছিল মাত্র শতকরা ৫.৭ ভাগ।

গ্রেট ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের কী স্থান তাহা স্পষ্টভাবে নীচের সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যাইবে :

১৯২৪ সাল : দশ লক্ষ পাউন্ডের মূল্যে

ব্রিটেন হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি		বিভিন্ন দেশ হইতে ব্রিটেনে আমদানি	
ভারত	৯০.৬	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২২.৬
অস্ট্রেলিয়া	৬০.৭	আর্জেন্টিনা	৭৫.২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৩.৮	ভারত	৬৫.১
জার্মানী	৪২.৬	ক্যানাডা	৬২.৭

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ১৯২৪ সালে গ্রেট ব্রিটেনের সমগ্র বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল মাত্র শতকরা ৮ ভাগ আর সেখানে ভারতের সমগ্র বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ ছিল শতকরা '৩৬ ভাগ।

৫

ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের শতকরা অংশ সে দেশ হইতে প্রাপ্ত আমদানি অপেক্ষা সে দেশে প্রেরিত রপ্তানিতে অধিকতর পরিমাণে কমিয়াছে।

যুদ্ধাবসানের পর হইতে অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেখানে ভারতের রপ্তানি যুদ্ধ-পূর্বস্তর রক্ষা করিয়াছিল, সেখানে ব্রিটেন হইতে আমদানি ইহা অপেক্ষা কম ছিল। ১৯২০-২১ হইতে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে যেখানে আমাদের আমদানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ শতকরা ৫৮.৮ হইতে কমিয়া শতকরা ৫০.৯ হইয়াছিল সেখানে আমাদের আমদানি বাণিজ্যে ইহা শতকরা ১৯.৪ হইতে বাড়িয়া শতকরা ২১.০ হইয়াছিল। গ্রেট ব্রিটেনের বাণিজ্যেও ইহা লক্ষিতব্য।

গ্রেট ব্রিটেনের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশ :

	রপ্তানি	আমদানি
১৯১০	১০.৬৯	৫.৫৩
১৯১৩	১৩.৩৮	৫.৪৮
১৯২২	১২.৮০	৪.২৫
১৯২৩	১১.২৪	৫.৭৬
১৯২৫	১১.১২	..

১৯২২ সালের পূর্বে ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত তুলনামূলক গুরুত্ব অর্জন করিতেছিল এবং তাহার আমদানি বাণিজ্যে গুরুত্ব কমিতেছিল। পরবর্তী উন্নয়ন ছিল বিপরীতমুখী। ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের প্রবণতায় পরিবর্তনের কারণগুলি ভারতীয় বাজারের উপর ব্রিটেনের আধিপত্য সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটন করিবে।

যুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি স্বাভাবিকভাবে সংকুচিত হইয়াছিল এবং জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলি নিজেদের পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ লইয়াছিল। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে ব্রিটেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছিল যে এই দুইটি দেশ বহুলাংশে বাজার দখল করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করা খুব কঠিন ছিল। জাপান শুধু ভারতীয় বাজারে নয়, অন্যত্রও ভয়ানক প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে তুলাজাত পণ্য ব্রিটেনের সহিত আমাদের আমদানি বাণিজ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু তাহার সরবরাহে জাপান ব্রিটেনের বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া, আমদানি শুল্কের বৃদ্ধি ও অন্তঃশুল্কের অবসান ভারতীয় পণ্যকে এমন সুবিধা দিয়াছিল যাহা পূর্বে তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। এইভাবে যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ তুলাজাত পণ্যের আমদানি দেশের আভ্যন্তরীণ এবং জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুরুতরভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যুদ্ধকালে ভারতের সহিত তাহাদের বাণিজ্য পুরাপুরি ভাঙিয়া পরা সত্ত্বেও জার্মানী ও বেলজিয়াম দ্রুত আবার কতকগুলি শ্রেণীর পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাজার দখল করিতে পারিয়াছিল। সেখানে ব্রিটেন তাহা পারে নাই এবং ইহা ওই দেশগুলির সহিত ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অসামর্থ্য প্রতিপন্ন করে। ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের মতো নূতন শিল্পের উন্নয়ন ব্রিটিশ আমদানি

বৃদ্ধির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এইভাবে দেখা যাইবে যে যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনের আমদানি দেশ-বিদেশে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছিল।

ভারত হইতে রপ্তানির ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে নাই। যুদ্ধের সময়কার উৎসাহ পরবর্তী স্তরে ইহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছিল। অধিকন্তু সাম্রাজ্যিক প্রাধিকার ও গ্রেট ব্রিটেনে কতকগুলি ভারতীয় পণ্যের উপর বিশেষ ধরনের শুল্ক আরোপের ফলে সেই দেশে আমাদের রপ্তানিতে কিছুটা উন্নয়ন দেখা গিয়াছিল।

এইজন্যই যুদ্ধোত্তরকালে ভারত হইতে ব্রিটেনে প্রেরিত রপ্তানি সে দেশ হইতে প্রাপ্ত আমদানি অপেক্ষা অধিকতর উন্নয়ন প্রদর্শন করিয়াছিল। এতদিন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি ছিল বিপরীত।

৬

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। ইহা সত্য যে আমরা গত চার বৎসর এই প্রসঙ্গের আলোচনা আমরা বাদ দিয়াছি বলিয়া এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উদ্বর্তন আমাদের বিবেচনায় আসে নাই কিংবা আমরা আমাদের বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া ব্রিটেনের সহিত আমাদের বাণিজ্যের উপর, সাম্প্রতিক স্বদেশী আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করি নাই। তৎসত্ত্বেও আমাদের মতানুসারে অর্ধ-শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা এ ব্যাপারে কয়েকটি অস্বাভাবিক বৎসরের প্রবহমান ঘটনাবলী অপেক্ষা নিশ্চিততার পথ প্রদর্শকের কাজ করিবে।

গ্রেট ব্রিটেন এখন ভারতের আমদানি বাণিজ্যে স্বদেশ এবং বিদেশের এমন কয়েকটি দেশ হইতে অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে যে দেশগুলি নিশ্চিতরূপে ভারতের প্রয়োজনীয় বহু তৈয়ারি পণ্য সরবরাহে অধিকতর সুবিধার অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় আমরা নিশ্চিত হ্রাস প্রত্যাশা না করিলেও ব্রিটেনের সহিত আমাদের আমদানি বাণিজ্যে খুব কম অগ্রগতিই প্রত্যাশা করিতে পারি।

ভারত হইতে প্রেরিত রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যতে কিছুটা উন্নতি প্রত্যাশা করিতে পারি, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে ব্রিটেনে সাম্রাজ্যের পণ্যগুলিকে উৎসাহিত করা হইতেছে এবং উপনিবেশিক পণ্য বৃহত্তর পরিমাণে ব্যবহারের নিয়মিত উদ্যোগ করা হইতেছে। কিন্তু এখানেও সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়। তাহাদের বিশাল কৃষি সম্পদ লইয়া ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ব্রিটেনে তাহাদের রপ্তানিতে বিশেষ

অগ্রগতি দেখাইতেছে। ইহা অসম্ভব নয় যে ভবিষ্যতে ভারত হইতে প্রেরিত কতক-গুলি পণ্যের স্থলে এই-সব উপনিবেশের কতকগুলি পণ্য ব্যবহৃত হইবে। গমের ক্ষেত্রে তাহারা ইতিমধ্যে ভারতকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে।

অধিকন্তু, ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে ভারতের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যের মোট পরিমাণ এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অধিকতর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সীমিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি ভারত ও অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার দ্বারা সংকুচিত হইয়াছে তেমনই ভারত হইতে রপ্তানি ব্রিটিশ বাজারে উপনিবেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা এবং অ-ব্রিটিশ দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যের অধিকতর দাবির দ্বারা সংকুচিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৩০ (?)

স্বামী বিবেকানন্দ

৬ মে ১৯৩২ সিওনি (সি. পি.) সাব জেল হইতে 'মারহাট্টা' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মি. এ. আর. ভাটকে লিখিত।

আপনারা সামর্থ স্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ কথা ঠিক যে স্বামীজীর যে-সকল পত্রাবলী এবং আলাপ-আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলি যে শুধু হৃদয়গ্রাহী তাই নয়, সেগুলি স্বামীজীর প্রকাশ্য বক্তৃতা ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানগর্ভ।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে আমি আত্মহারা হয়ে যাই, খুব কম লোকের পক্ষে— এমন-কি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর জটিল ও ঋদ্ধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ তাঁর এই লেখা ও বক্তৃতার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর বিশেষত বাঙালীর উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বে-হিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজী মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো— আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him' (আমার গুরু, আমি যেমন তাঁকে দেখেছি) পুস্তকে বলেছেন— "The queen of his adoration was his motherland"— অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবতা ছিল তাঁর মাতৃভূমি। পুরোহিত, উচ্চবর্ণ, এবং বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন— আপনারা তা পড়েছেন। সে-সব কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামি বলতে পারেন, স্বামীজীর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এ-সব অসহ্য বোধ হত। বক-ধার্মিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন— ফুটবলের মধ্য দিয়ে মুক্তি আসবে— গীতার মধ্য দিয়ে নয় ("Salvation will come through football and not through the Gita")। নিজে বৈদান্তিক হয়েও— তিনি ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত

ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে— "স্বামীজী আপনি কি বৌদ্ধ ?" তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল— তিনি কম্পিত স্বরে বললেন "কী ? বৌদ্ধ ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক— তস্য সেবক"। বুদ্ধের সম্মুখে তিনি নিজেকে ধুলার মতো নত করে দিতেন। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন— "শঙ্করাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়বত্তাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।"

এইভাবে তিনি একদিন খ্রীস্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলে— তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন —"যীশুখ্রীষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমার চোখের জলে নয়— আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।" অবনমিতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল সমুদ্রসমান। তাঁর সেই বাণী কি আমাদের স্মরণ আছে ?—

"দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বলো ভাই, উচ্চ কণ্ঠে বলো— ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ— দিবারাত্র প্রার্থনা করো, হে গৌরীপতি, হে শক্তিময়ী জননী— আমার দুর্বলতা হরণ করো আমার কাপুরুষতা হরণ করে আমায় মানুষ করো।"

স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ— তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী— সেইজন্যই তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক, তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। "শক্তি শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ বলেছেন"— স্বামীজী এই কথাই বার বার বলেছেন, চরিত্র গঠনের উপর তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না। এমনি ছিলেন তিনি মহৎ, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র— যেমন মহান, তেমনি জটিল। তাঁর বিষয় বলতে গেলে বলতে হবে যে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য— সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, জাতির ও মানবসমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা— এ কথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না।

যে ভাবে স্বামী দয়ানন্দ বা আর্য সমাজীরা সংগঠনের কাজ করেছেন— স্বামীজীর সে ইচ্ছা ছিল না— এবং সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। হতে পারে এটা একটা ত্রুটি কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে বলতেন— মানুষ তৈরি করাই

আমার ব্রত— "Man making is my mission." তিনি জানতেন যে যদি দেশে সত্যকার মানুষ তৈরি হয় তা হলে সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হতে দেরি লাগবে না। তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষিত করবার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন কিন্তু কখনো তাদের ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু বা স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করবার চেষ্টা করতেন না। এইজন্যই কোনো শিষ্যকে তিনি বেশি দিন নিজের কাছে রাখতেন না। তিনি বলতেন যে একটা বড়ো গাছের আওতায় অন্য একটা বড়ো গাছ কখনো বাড়তে পারে না। পরের যুগের মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর কতখানি প্রভেদ! তাঁরা স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না এবং তাঁরা চান যে আমরা তাঁদের পায়ে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সব সমর্পণ করে আমাদের সকল চিন্তার ভার তাঁদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি।

দলাদলির হোক অবসান

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন, যাঁহারা স্বভাবত নৈরাশ্যপূর্ণ ও নৈরাশ্য-বাদী। ইহাঁরা সদা সর্বদা এই কথা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত যে, বাঙালী জাতি নিজের শক্তি-সামর্থ্য হারাইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া ক্রমশ পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে-সব ব্যক্তি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা স্বভাবত আত্মবিশ্বাসহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন যে, সমগ্র জাতি তাঁহাদের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ— তাঁহারা যেরূপ উন্নতিশীলতা ও অগ্রগামীত্ব হারাইয়াছেন সমস্ত জাতি বুঝি সেইরূপ এই-সব বৃত্তি হারাইয়াছে।

আমি স্বভাবত আশাবাদী, তাই আমি সর্বদা অন্যের হৃদয়ে আশা ও আত্ম-বিশ্বাস জাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি মনে করি না যে, জাতি হিসাবে আমরা মূলত অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। তবে বাস্তবতার দিক দিয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান সময়ে আমাদের চরিত্রে এবং আমাদের সমাজে অনেকগুলি আবর্জনার সমাবেশ হইয়াছে। এইজন্যই আজ ভারত পরাধীন— এইজন্যই আমাদের মধ্যে এখনো পরপদলেহনকারী, বিশ্বাসঘাতক, কুক্কুর জাতীয় মানব পাওয়া যায়।

অন্য প্রদেশের তুলনায় রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার বিশেষ রকমের অসুবিধা হইয়াছে— দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেশবন্ধুর সম-সাময়িক নেতারা আজও জীবিত। তাঁহাদের শক্তি ও প্রভাবের ফলে ঐ-সব প্রদেশের কর্মধারা সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। (যেখানে এরূপ নেতা নাই, সেখান-কার অবস্থা বাংলা অপেক্ষাও হীন— যথা পাঞ্জাব) তার পর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসাইবার জন্য আমাদের ভাগ্যদেবতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে অকালে অপহরণ করিলেন। তথাপি আমি এ কথা বলিতে পারি যে নেতৃত্বের দিক দিয়া এত অসুবিধা ভোগ করিলেও বাঙালী জাতি ১৯২৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেরূপ ত্যাগ, জনসেবা, সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তাহা অন্য কোনো প্রদেশের অপেক্ষা কম নয়, বরং অনেক বিষয়ে অন্য প্রদেশের অপেক্ষা অধিক প্রশংসার্হ।

বাঙালীর অথবা ভারতবাসীর ত্রুটি এখনো পর্যন্ত অনেক আছে। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া একটি ত্রুটির কথা আজকার বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করিতে চাই।

ইউরোপের স্বাধীন জাতির সহিত তুলনা করিলে এই কথা সর্বপ্রথমে আমাদের চোখে ঠেকে যে, আমাদের (অর্থাৎ ভারতের, শুধু বাংলার নয়) প্রধান অভাব— উপযুক্ত নেতার। আমরা এখনো পর্যন্ত তেমন নেতা পাই নাই, যিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এবং ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেন। প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কয়জন ভারতীয় নেতা ধারণা করিতে পারেন? অধিকাংশ নেতা (এবং তার মধ্যে মহাত্মা-গান্ধীর নামও করিতে পারি) যখন স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের কথা বলেন তখন প্রকৃতপক্ষে Dominion Status-এর (অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনের) পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। যেখানে কল্পনা এত খাটো এবং আদর্শ এত ছোটো, সেখানে সাধনা যে পঙ্গু হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কোনো হেতু নাই। যাহা হউক, অতীতের জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগকে এইরূপ যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে যাহাতে অতীতের অক্ষমতার ও অসাফল্যের হাত হইতে আমরা চিরকালের জন্য মুক্ত হইতে পারি।

আমাদের প্রথম অভাব স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিকল্পনার। আমাদের দ্বিতীয় অভাব— উপযুক্ত মনোবৃত্তির। যেখানে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের হৃদয়ে এত বেশি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ এখনো বর্তমান সেখানে যে আমাদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই স্থানে বাংলার দলাদলির কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে আসিতেছে। এই দলাদলির জন্য আমি ব্যক্তি-বিশেষকে বা দলবিশেষকে দায়ী করিতে চাই না। দায়ী উভয় দলকেই আমি করি— কারণ এক হাতে তালি বাজে না। এতদ্ব্যতীত আমরা সকলে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে এই দলাদলির জন্য দায়ী, কারণ এই দলাদলিকে নির্মূল করিবার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করি নাই। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে, এই দলাদলির মূলে আছে আমাদের হীন ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তির মধ্যে। "দেশ উদ্ধার যদি হয় তো আমার দ্বারাই হউক, নতুবা হইয়া কাজ নাই"— এইরূপ মনোভাব· বাংলায় অনেক কংগ্রেস কর্মীর আছে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়। এইরূপ হীন মনোবৃত্তির পরিবর্তে এক নূতন মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, আমাদের ব্যক্তিত্ব দেশের ও দশের কল্যাণের মধ্যে সানন্দে ডুবাইয়া দিতে পারিব। এ ক্ষেত্রে আমার মনে পড়ে ১৯৩১

সালে শ্রীহট্টের দলাদলির কথা। দলাদলি মিটাইবার উদ্দেশ্যে আমি শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি যে সেখানে এরূপ অবস্থা যে একদল যদি স্বেচ্ছায় সরিয়া না দাঁড়ান তাহা হইলে ঝগড়ার অবসান হইবে না। তখন শ্রীহট্ট কংগ্রেসের অফিস ছিল তাঁহাদের হাতে, যাঁহারা আমার সমর্থনকারী বা পৃষ্ঠপোষক। আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদেরই অনুরোধ করি স্বেচ্ছায় সরিয়া যাইতে এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দের হাতে অফিস তুলিয়া দিতে। এই অনুরোধ করিবার সময়ে আমি তাঁহাদের বলি যে, এত বড়ো দাবি আমি করিতে সাহসী হইয়াছি শুধু এই নিমিত্ত যে আমি বিশ্বাস করি যে, প্রয়োজন হইলে আমিও তাঁহাদের মতো আত্মবিলোপ সাধন করিতে পারিব। আজও আমি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি যে, আমার বন্ধুরা কোনো প্রকার দ্বিধা না করিয়া আমার অনুরোধ অনুসারে শ্রীহট্টে দলাদলি শেষ করিবার জন্য সানন্দে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং অফিসের ভার অপর পক্ষের হাতে তুলিয়া দিলেন।

আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে— অথচ আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরো শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য ? যদি তাহা হয়, তবে ইহার কারণ কি ? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রমহলে "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। এ কথা কি সত্য ? যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্যসমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তি তদ্রূপ গড়িয়া উঠে। চরিত্র গঠনের জন্য "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

আমাদের তৃতীয় অভাব— উপযুক্ত সংঘের। জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) অবশ্য সমগ্র দেশকে সংঘবদ্ধ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে নিয়মানুবর্তী হইতে শিখাইয়াছেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, আরো উৎকৃষ্ট ও সুসম্বদ্ধ সংঘ আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে। সংঘের মধ্যে সামরিক কঠোরতা আনিতে হইবে। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার উপর যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ঐ সংঘ অটল হইয়া সকল প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিবে। এ বিষয়ে কংগ্রেসের

নেতৃবর্গের নীতি উপলব্ধি করা কঠিন। যেখানে কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা একান্ত দরকার— সেখানে তাঁহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। অথচ অন্য ক্ষেত্রে তাঁহারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং গত ৫/৬ বৎসর যাবৎ তাঁহারা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি হইতে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিকে একেবারে বাদ দিয়া আসিতেছেন— যার ফলে আজকার কার্যকরী সমিতি একটি পেঁাধরা কমিটিতে পর্যবসিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আমাদিগকে এমন একটা আদর্শ সংঘ গঠন করিতে হইবে যে, এক দিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকিবে এবং অপর দিকে সংঘের ভিতর সকল প্রকার মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও অধিকার সকলের থাকিবে। একদিকে Democracy এবং অপর দিকের Military Discipline এই উভয়ের সমন্বয়ে আদর্শ সংঘ গঠিত হইয়া থাকে।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আজ আমাদের প্রধান অভাব— উপযুক্ত নেতার। নেতা আকাশ হইতে আসে না— সংগ্রামের ভিতর দিয়া এবং কঠিন সাধনার সাহায্যে সর্ব যুগে ও সর্ব দেশে নেতা গড়িয়া উঠে। যাঁহারা অতীতে নেতৃত্বের ভার লইয়াছিলেন, সাধ্যমতো জনসেবা করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মনোবৃত্তি লইয়া আমাদিগকে কর্মক্ষেত্র আগুয়ান হইতে হইবে। এবং দেশবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া সংঘবন্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে কী উপায়ে, কী কৌশলে বিভিন্ন পরাধীন জাতি স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। এবং আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমান যুগে অন্যান্য দেশের সহানুভূতি ব্যতীত কোনো এক পরাধীন জাতির পক্ষে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব। তাই ভারতবাসীকে ঘরে এবং বাহিরে, একসঙ্গে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইতে হইবে। যে উপায়ে সর্ব যুগে পরপদানত জাতি মুক্তি লাভ করিয়াছে, সে উপায়ে যদি আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমরাও যে অতি শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই— কোনও সন্দেহ নাই।

১৯৩৩ (?)

এক নজরে এডেন

১৯৩৫ সালের ১৩ জানুয়ারি যখন বোম্বাই হইতে ইউরোপ যাইবার পথে লয়েড ট্রিয়েস্টিনোর এম. এন. ভিক্টোরিয়া জাহাজ এডেনে থামিয়াছিল, তখন এডেনের কিছু ভারতীয় অধিবাসী আসিয়াছিলেন এবং আমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন আমি তাঁহাদের সহিত তীরে অবতরণ করিয়াছিলাম তখন আমার জন্য এক আনন্দদায়ক বিস্ময় অপেক্ষা করিয়াছিল। আমি শেষবার এডেন দেখিয়াছিলাম ১৯১৯ সালে ইংল্যান্ড যাইবার পথে— কিন্তু এখন কী আনন্দদায়ক বিপরীত দৃশ্য দেখিলাম। এখন চোখে পড়িল সুন্দর সব পথ (সম্ভবত অ্যাশফল্টে তৈয়ারি), বিদ্যুতের পথ আলোকীকরণ ব্যবস্থা এবং দুই ধারে বিরাট বিরাট বাড়ি। সন্ধান করিয়া আমি জানিয়াছিলাম যে এডেনের জনসংখ্যা ৫০,০০০-এরও বেশি এবং ইহাদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা ২,০০০-এরও বেশ বেশি। ভারতীয় বসবাসকারীরা ব্যবসায়ী এবং তাহাদের অধিকাংশ কাঠিয়াওয়ার হইতে আগত। এডেন একটি সমৃদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ বর্ধমান। চামড়ার মতো কাঁচামাল ও কফির মতো দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে আনা হয় এবং জাহাজযোগে ইউরোপে পাঠানো হয়। তথাকথিত সভ্যতার প্রতীক বস্ত্র সহ প্রস্তুত খাদ্যাদি ইউরোপ হইতে আমদানি করা হয় এবং আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরভাগে পাঠানো হয়। প্রশাসনের উচ্চতর শ্রেণীতে ব্রিটিশ প্রাধান্য। নিম্নতর শ্রেণীতে কর্মচারীরা কতকাংশ আরব আর কতকাংশ ভারতীয়। বর্তমানে এডেন ভারত সরকারের প্রশাসনের অধীন।

এডেনের ভারতীয় বসবাসকারীগণ ভারত হইতে এডেনের প্রস্তাবিত বিচ্ছেদের সমস্যায় এখন উদ্বিগ্ন। তাঁহারা যদি ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হন এবং তাহার ফলে ভারতের জনমতের সমর্থন হারান, তাঁহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃত আশংকা আছে। এই প্রস্তাবের পিছনে কর্তৃপক্ষের মনে কী আছে তাহা আমি খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ভারতীয়রা এ ব্যাপারে যতটা সংশ্লিষ্ট তাঁহারা মনে করেন যে ইহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। ভবিষ্যতে কোনো এক সময় ভারত স্বরাজ পাইলে এডেন যাহাতে নিরাপদে তাঁহাদের হাতে থাকিতে পারে সেইজন্য সরকার এডেনকে একটি ঔপনিবেশিক অধিকারে পরিণত করিতে চান। এডেন ও সিংগাপুর ভারতের দুইটি

নৌ-প্রবেশ দ্বার এবং এই দুইটি প্রবেশদ্বারকে পুরাপুরি সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। পূর্বে এডেনে কিছু ভারতীয় বাহিনীও ছিল কিন্তু তাহাদের ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র হাজার দুয়েক ব্রিটিশ সৈন্য। রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি শক্তিশালী শাখাও এডেনে অবস্থিত। এডেনের ২৫ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ব্রিটেন কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা এবং তাহার বাহিরে সব স্বাধীন ভূখণ্ড।

এডেন লোহিত সাগরের প্রবেশপথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকায় ইহার সামরিক গুরুত্ব ছাড়াও এ স্থানটি ছবির মতো বলিয়া চিত্তাকর্ষক। এডেন কতকগুলি পাহাড়ের বুকে আশ্রিত। নগরের অধিকাংশ পাহাড়গুলির পাদদেশে অবস্থিত হইলেও সর্বাপেক্ষা সুন্দর কতকগুলি বাড়ি পাহাড়ের গায়ে ঊর্ধ্ব স্থানে নির্মিত এবং সম্পূর্ণ আধুনিক গড়নের আঁকাবাঁকা পথ সেই-সব বাড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হইয়াছে। এডেনে বৃষ্টিপাত খুব কম এবং সেইজন্য পানীয় জলের তীব্র সমস্যা আছে। বহু বহু কাল পূর্বে সুকৌশলী পদ্ধতিতে আরবগণ এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। পাহাড়ের বৃষ্টিপাত পাহাড়ের পাদদেশ প্রান্তে স্বাভাবিক পাথর দিয়া তৈয়ারি বিরাট মজবুত জলাধারে ধরিয়া রাখা হইত এবং পানের জন্য সারা বৎসর ব্যাপী জলাধারের এই জল ব্যবহার করা হইত। এই সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়াও ভারতের গ্রামগুলিতে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ খুব গভীর কূপও আছে। যেদিন আমরা এডেনে পেঁাছিয়াছিলাম সেদিন খুব বৃষ্টি হইয়াছিল এবং জলাধার বেশ পরিপূর্ণ ছিল।

আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম যে দেশে কী ঘটিতেছে না ঘটিতেছে এডেনের ভারতীয়রা তাহা ভালোভাবে জানেন। তাঁহারা সর্বশেষ সংবাদ আমার কাছে জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের গোষ্ঠী বৈঠকে এডেন সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম সে-সব সংবাদ আমাকে দিয়া তাঁহারা আমাকে কংগ্রেসের কর্মসূচী সম্বন্ধে বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমি বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত গঠনমূলক কর্মসূচী ও ভারতে খাদি-আন্দোলন সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলাম। সভা শেষ হইলে জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং পরে আমাকে গাড়িতে শহর ঘুরাইয়া দেখানো হইয়াছিল। জাহাজঘাটায় সুন্দর একটি বিদায়ানুষ্ঠানের পর আমি আমার জাহাজ এম. এন. ভিক্টোরিয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

যদি খ্যাতিমান ভারতীয়গণ কষ্ট করিয়া এডেনে নামেন এবং তাঁহাদের স্বদেশ-বাসীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তবে এডেনবাসী ভারতীয়রা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবেন। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এডেন পরিদর্শনের কথা তাঁহারা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়াছিলেন। সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রচারেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং সেই উদ্দেশ্যে যে-কোনো ভারতীয় সেখানে গেলে তিনি নিশ্চয়ই সাদর অভ্যর্থনা পাইবেন। বর্তমানে বারাণসীর পণ্ডিত কানহাইয়ালাল মিশ্র সেই কাজে সেখানে রত আছেন— তবে তিনি শীঘ্রই চলিয়া আসিবেন।

এডেনের ভারতীয়দের ইচ্ছা এই যে প্রস্তাবিত বিচ্ছিন্নকরণের বিরুদ্ধে ভারতে প্রবল বিক্ষোভ হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত যাহাই হউক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই প্রশ্নে অবিলম্বে ভারতীয় জনমতের সোচ্চার হওয়া উচিত।

'মডার্ন রিভিয়্যু'
মার্চ ১৯৩৫

কায়রো দিয়া যাইবার সময়

আধুনিক মিশরের রাজধানী কায়রোর মতো এত চমৎকার শহর খুব কম আছে। নীলনদ-লালিত ও সুউচ্চ পিরামিডগুলি দ্বারা রক্ষিত আরামপ্রদ আবহাওয়া, সবুজ বৃক্ষ শোভা, সুন্দর রাজপথ ও ছবির মতো গৃহ-সমন্বিত এই নগরী বিদেশীদের কাছে বিরামহীন আকর্ষণ আছে। কিন্তু যাঁহারা প্রতিনিয়ত সুয়েজ খাল দিয়া যাতায়াত করেন তাঁহাদের মধ্যে কত কম-সংখ্যক নরনারীই না কায়রো গিয়াছেন!

লয়েড ট্রিয়েস্টিনো কোম্পানিকে ধন্যবাদ যে তাঁহাদের ব্যবস্থার ফলে আমরা সুয়েজে এম. এম. ভিক্টোরিয়া ত্যাগ করিতে, গাড়িতে কায়রো যাইতে, একটা দিন সেখানে ভালোভাবে কাটাইতে এবং পোর্ট সৈয়দে জাহাজ ধরিতে পারিয়াছিলাম। ১৯৩৫ সালের ১৬ জানুয়ারি রাত্রি ৯টার মধ্যে আমরা সুয়েজে পৌঁছিয়াছিলাম। জাহাজ উপকূল হইতে অনেক দূরে নোঙর ফেলিয়াছিল এবং আমাদের খেয়া নৌকায় তীরে আসিতে হইয়াছিল। রাত্রিটি ছিল চন্দ্রালোকিত। রুপালি চন্দ্রা-লোকে বিশাল জলরাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের চতুর্দিকে ঝলমল

করিতেছিল সুয়েজ ও পোর্ট টৌফিক বন্দর দুইটির আলোকমালা এবং সমুদ্রের বুকে ইহাদের প্রতিচ্ছবি তারার মতো নাচিতেছিল। শুল্ক-ব্যবস্থার বাধা অতিক্রম করিয়া যে গাড়িটি আমাদের কায়রো লইয়া যাইবে তাহাতে চড়িয়াছিলাম। শীঘ্রই শহর পিছনে ফেলিয়া আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়া উত্তর দিকে ছুটিতেছিলাম। আমাদের একজন সংগীর আশা ছিল যে মরুভূমির বেদুইনদের হাতে পড়িয়া কিছুটা দুঃসাহসিক অভিযানের আস্বাদ পাইবেন কিন্তু তাঁহাকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। সারা পথ জুড়িয়া ছিল শান্তি— দুইদিকে সীমাহীন বালুকারাশি— সম্মুখে ধাবমান পথ এবং স্বর্গ হইতে ঝড়িয়া পড়া বিবর্ণ চন্দ্রের দ্যুতি। মধ্য-রাত্রের পরে আমরা কায়রো পেঁছিয়াছিলাম। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে বিরাট সৌধ-সমন্বিত চমৎকার আলোকমালায় সজ্জিত কায়রোর রাজপথগুলিকে অপার্থিব মনে হইয়াছিল।

পরদিন সকালে আমরা পিরামিড দেখিতে গিয়াছিলাম। আবহাওয়া ছিল শীতল এবং আমরা নীলনদ অতিক্রম করিবার সময় কনকনে হাওয়া ছিল। এই অবস্থায় আমরা দ্রুতবেগে প্রাতঃকালীন আকাশের পটভূমিকায় দণ্ডায়মান পিরামিডগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। শীঘ্রই আমরা তাহাদের পাদদেশে পেঁছিয়া উর্ধ্বদিকে তাকাইয়াছিলাম। এইগুলিই পাথরের সেই স্মারক স্তম্ভ যেগুলি নেপোলিয়নের মতো একজন যোদ্ধার কল্পনাকেও উদ্দীপিত করিয়াছিল। ফরাসী সম্রাট এইগুলির কাছে তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া তাহাদের পরিশ্রান্ত দেহকে এই বলিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন যে তাহাদের দিকে ৫০০০ বৎসর তাকাইয়া আছে। এই আবেদনে জাদুর মতো কাজ হইয়াছিল এবং ম্যামেলুকরা উড়িয়া গিয়াছিল ঝড়ের মুখে ধূলির মতো। পিরামিডগুলির চতুর্দিকে আমরা হাঁটিয়া বেড়াইয়াছিলাম এবং আমাদের জন্য পিরামিডের শিক্ষা কী তাহা ভাবিতে ভাবিতে কয়েকটি খননকার্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। হাঁ, আমরাও উদ্দীপনা অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। সীমাহীন ও ধূসর মরুভূমির পটভূমিকায় এই সুউচ্চ দৈত্যগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা মানুষের মহিমা ও আত্মার অমরত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। এই সৌধ-গুলির নির্মাতারা মহাকালকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের পাথরের মধ্যে অমর করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের অন্তদৃষ্টি আছে তাঁহারাই তাঁহাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

পিরামিডগুলির কাছেই ছিল চিরন্তন ধাঁধার উৎস সেই স্ফিংক্স। প্রস্তরের

তৈয়ারি একটি সুবিশাল মূর্তি— উদীয়মান সূর্যের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ। স্ফিংক্সের মধ্যে কোন্ ভাব রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে? একজন গাইড একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরীয়রা ছিলেন সূর্য-উপাসক এবং স্ফিংক্স হয় সূর্যের প্রতীক, নয়তো সূর্যপূজার প্রতিনিধি। কিন্তু কে তাহা জানে? যে আত্মা স্ফিংক্স নির্মাণ করিয়াছিল সে কথা বলে না এবং এ ধাঁধারও সমাধান হয় নাই। স্ফিংক্স-এর মাথার উপর স্থির হইয়া বসিয়াছিল একটি ছোটো পাখি। একজন গাইড আমাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করার জন্য বলিয়াছিলেন: "ঐটিই স্ফিংক্সের আত্মা। ও প্রতিদিনই ইহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসে।" আরো ঘনিষ্ঠভাবে স্ফিংক্সের মুখের দিকে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম যে ইহার নাসিকাটি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। আমাদের মনে হইয়াছিল যে ইহা আর-একটি সমস্যা। গাইডরা কিন্তু থামিবার পাত্র নন। তাঁহাদের একজন বলিলেন: "সম্রাট নেপোলিয়নের একটি কামানের গোলায় এ সর্বনাশ হইয়াছিল।" নেপোলিয়নের সহিত পিরামিডের সংযোগ সূত্র পাইয়া আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। কিন্তু আর-একজন গাইড প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন: "প্রাচীন মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে গিয়া মূর্তিভঙ্গকারী আরবরা এই কাজ করিয়াছিল।"

আমরা স্ফিংক্স সম্বন্ধে পূর্বের অপেক্ষা আরো বিভ্রান্ত হইয়া পিরামিডগুলির দিকে ফিরিয়াছিলাম। একজন গাইড জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনারা কি পিরা-মিডের মাথায় উঠিতে চান?" আমাদের উত্তর ছিল: "না, ধন্যবাদ, আমাদের হাতে সে সময় নাই।" তিনি বলিলেন: "মহাশয়, একজন লোক আছে যে আট মিনিটের মধ্যে পিরামিডের মাথায় চড়িয়া আবার নামিতে পারে।" ইহা আমাদের পকেট খালি করার আর-একটি কৌশল ভাবিয়া আমরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলাম যে এ ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ নাই। পরিবর্তে আমরা বৃহত্তম পিরামিডটির অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কার করিতে চাই। ইহা কঠিন কাজ ছিল না। পিরামিডের হৃদয়স্থলে একটা বড়ো হলে প্রবেশের সরু পথটিতে বিদ্যুতের আলো ছিল। কেবলমাত্র সিঁড়ি ভাঙার সময় প্রতিনিয়ত বাঁকা হইয়া থাকার ফলে আমরা যখন একটি বৃহৎ কক্ষে পেঁছিয়াছিলাম তখন পিঠ ব্যথা করিতেছিল। পিরা-মিডের মোট উচ্চতা ছিল ৪৪০ ফুট এবং কক্ষটি ছিল প্রায় মাঝামাঝি উচ্চতায় অবস্থিত। প্রাচীনকালের রাজাদের মমিগুলি এখানে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইত কিন্তু মমিগুলি যাদুঘরে লইয়া যাওয়ায় কক্ষ তখন শূন্য ছিল। নিম্নতর

স্তরে আর-একটি ক্ষুদ্রতর প্রকোষ্ঠ ছিল যেখানে রানীদের মমিগুলি রাখা হইত।

যেখানে স্ফিংক্স আছে সেই রাজার পিরামিডগুলি কায়রো হইতে প্রায় নয় মাইল দূরে অবস্থিত। মোট নয়টি পিরামিড আছে, তিনটি বড়ো ও ছয়টি ছোটো। বড়ো পিরামিডগুলি খুব ভালো অবস্থায় আছে— অনেক স্থানে শুধু অ্যালাবাস্টারের আস্তরণ খসিয়া পড়িয়াছে। আর-একটি পিরামিড গোষ্ঠী আছে কায়রো হইতে আরো দূরে, প্রায় কুড়ি মাইল দূরে— প্রাচীন শহর মেন্সফিসের কাছে এবং সেখানে প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের কিছু প্রতিমূর্তিও আছে।

কায়রোর প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘরটি পিরামিডগুলি অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নয়। ইহাতে মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত আছে। এই যাদুঘরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল সেই শাখাটি যেখানে মিশরের ঊর্ধ্বভাগস্থিত লাক্সরের টুটানখামেনের সমাধিস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি রাখা হইয়াছে। একবার কিংবা দুইবার দেখিয়া এগুলির প্রতি সুবিচার করা যায় না। প্রতিপদে এগুলি দেখিতে দেখিতে ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে কম করিয়া ২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ কালে প্রাচীন মিশরীয়গণ শিল্প ও সভ্যতার কী উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিলেন। শিল্পকর্মগুলি দেখিয়া মনে হয় যে সেগুলি যেন গতকাল মাত্র তৈয়ারি করা হইয়াছে। এগুলির কারুকার্যের চমৎকারিত্ব ছাড়াও যাহা মানুষের কল্পনাকে অভিভূত করে তাহা হইল এই যে মহাকালের অত্যাচারের হাত হইতে এগুলিকে রক্ষা করিবার এমন কার্যকরী ব্যবস্থা কী করিয়া করা হইয়াছিল।

মিশরের মতো ভারতও খুব সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার গর্ব করিতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে রক্ষণশিল্পে আমাদের তুলনামূলক অদক্ষতার দরুন আমরা যাহা নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি মনে করি না যে মিশরীয়দের মতো আমরা জীবনের জড় দিককে— শিল্প ও কারুকলাকে— তত উন্নত করিতে পারিয়াছিলাম। আমরা জোর দিয়াছিলাম সভ্যতার উপরে নয়, সংস্কৃতির উপরে, জীবনের জড় দিকের উপর নয়, বুদ্ধিবাদ ও অধ্যাত্মবাদের উপরে। সেইখানে আমাদের যেমন সুবিধা ছিল, তেমনই অসুবিধাও ছিল। আমাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষের দরুন আমরা সেই সময়ের জন্য জড়বাদী বিচারে পরাজিত হইলেও বহিরাগত আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করিতে পারিতাম এবং যথাসময়ে আমরা বহিরাগতকে এক করিয়া লইতে পারিতাম আর

প্রাচীন মিশরীয়রা তাহা পারে নাই বলিয়া আরব আক্রমণকারীদের সম্মুখে একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল।

পক্ষান্তরে বুদ্ধিবাদ ও অধ্যাত্মবাদের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে আমরা বিজ্ঞানের উন্নয়ন অবহেলা করিয়াছিলাম এবং জীবনের জড় ও ভৌতিক দিকে তুলনামূলকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলি ছিল তখন যখন আমরা অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের দাবির মধ্যে, আত্মা ও দেহের দাবির মধ্যে একটা মধ্যপন্থার সুবর্ণমণ্ডিত রেখা অবলম্বন করিতে পারিয়াছিলাম এবং সেইভাবে একই সঙ্গে দুইটি দিকে উন্নতি করিতে পারিয়াছিলাম। আত্মা ও দেহের মধ্যে অন্তঃসংযোগের দরুন দেহকে অবজ্ঞা করিলে তাহা দৈহিক দিক হইতেই শুধু জাতিকে দুর্বল করিয়া তোলে না, শেষ পর্যন্ত তাহাকে আধ্যাত্মিক দিক হইতেও দুর্বল করিয়া তোলে। বর্তমানে ভারত কেবল দৈহিক দুর্বলতায় ভুগিতেছে বলিয়া মনে হয় না, আধ্যাত্মিক অবসাদেও ভুগিতেছে— ইহা জীবনের একটি দিক উপেক্ষা করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল। আবার যদি আমাদের দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে একই সঙ্গে দুইদিকে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাউক। সকালের অভিযান শেষে আমরা বিকালটা কাটাইয়াছিলাম নগরটি ঘুরিয়া দেখার কাজে। কায়রো মসজিদ ও সমাধিতে পূর্ণ এবং প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছু ইহার মাটিতে লুক্কায়িত আছে। প্রতিটি মসজিদের নিজস্ব সৌন্দর্য ও নিজস্ব কাহিনী আছে। কখনো কখনো বাইবেলের যুগের দৃশ্যাবলীরও সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু সেগুলি কতটা খাঁটি তাহা বলা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, বড়ো দুর্গের (কায়রোর প্রাচীন দুর্গ) গাইড আমাকে একটি খুব গভীর কূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে উহা ছিল জোসেফের কূপ। এই দুর্গটি কায়রোর সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক স্থানগুলির অন্যতম এবং এ স্থান হইতে সমগ্র নগরীর একটা সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। মহম্মদ আলির যে রাজপ্রাসাদ হইতে এই দৃশ্য দেখা যায় দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা এখন অবহেলিত অবস্থায় আছে। যে কক্ষটিতে মহম্মদ আলি মামেলুকদের ভোজে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং যেখানে পরে তিনি অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের হত্যা করিয়াছিলেন সেই কক্ষটি গাইড আমাদের দেখাইয়াছিলেন। মাত্র একজন মামেলুক প্রাণে বাঁচিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই প্রাসাদের বাহিরে আছে মহম্মদ আলির প্রাসাদ এবং সৌভাগ্যক্রমে বহু ব্যয়ে ইহার পুনঃসংস্কার চলিতেছে। সুলতান

হাসানের মসজিদ, নীল মসজিদ, মামেলুকদের সমাধি, আল আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানগুলিও বিদেশীদের আকর্ষণ করে।

প্রাচীন মিশরের কিছুটা দেখিয়া আমাদের চিন্তা স্বাভাবিকভাবে ঘুরিয়াছিল আধুনিক মিশরের দিকে। আধুনিক কায়রো একটি চমৎকার নগরী এবং ইহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু রাজার বর্তমান প্রাসাদ এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। এমন-কি ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যারাকগুলিও ইহার অপেক্ষা অধিক আকর্ষক বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমাদের বলা হইয়াছিল যে মিশরের রাজা আছেন কিন্তু যখন আমরা শহরের মধ্যস্থলে ব্রিটিশ ব্যারাকগুলির উপর এবং দুর্গের উপরও ইউনিয়ন জ্যাক গর্বিতভাবে উড়িতে দেখিয়াছিলাম তখন আমরা রূঢ় আঘাত পাইয়াছিলাম। স্বাধীনতা বটে!

কিন্তু আধুনিক মিশরের জনগণের কথা কোথায়? আমি ওয়াফ্‌দ দল নামে অভিহিত মিশরের জাতীয়তাবাদী দলের কথা শুনিয়াছিলাম। এই দলের নেতৃত্ব একদা চমৎকারভাবে দিয়াছিলেন পুণ্যশ্লোক জগলুল পাশা এবং পরে তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন মুস্তাফা এল-নাহাস পাশাকে। এই মহান জাতীয়তাবাদী নেতার সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীত কায়রো পরিদর্শন অবশ্য অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। আমার হাতে সময় ছিল স্বল্প— তবু আমার আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি যখন তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ করি তখন তাঁহার সংগে ছিলেন তাঁহার যোগ্যতম দুই সহকর্মী মি. এফ. এফ. নোক্রাশি ও মি. মকরম এবিদ। আমি প্রত্যক্ষভাবে মিশর সম্বন্ধে কিছু জানিতে উৎসুক ছিলাম আর তাঁহারা উৎসুক ছিলেন ভারতের কথা জানিতে। নেশিম পাশার প্রধানমন্ত্রিত্বে মিশরে অর্ডিনান্সের রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছিল জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। জাতীয়তাবাদীরা আবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়া-ছিলেন। ১৯৩৫-এর ৮ ও ৯ জানুয়ারি তাঁহারা কায়রোতে ওয়াফ্‌দ দলের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ইহাতে ৩০,০০০-এরও বেশি মানুষ যোগ দেওয়ায় ইহা অভূতপূর্ব সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছিল। শীঘ্রই পার্লামেন্টে নির্বাচন হইবে বলিয়া প্রত্যাশা ছিল এবং ওয়াফ্‌দ দল যে নির্বাচনে বিপুল সাফল্য লাভ করিবে সে বিষয়ে তাঁহারা আস্থাশীল ছিলেন। সব মিলিয়া পরিস্থিতি খুব আশাজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং নেতৃবৃন্দ ছিলেন হর্ষোৎফুল্ল।

ভারতের বিষয়ে প্রশ্ন করিতে গিয়া মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা প্রথমেই মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে ১৯৩১

সালে মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতে ফিরিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার নিজের বাড়িতে তাঁহার দলের উল্লেখযোগ্য সদস্যগণের একটি সভায় গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করিয়া কায়রোতে আনার জন্য পোর্ট সৈয়দে তাঁহার সচিবকে পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় মহাত্মা আসিতে পারেন নাই। আমাদের আলোচনা তখন হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের দিকে মোড় ফিরিয়াছিল। যে-সব সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সর্বোত্তম স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিলেন মোস্তাফা তাঁহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি একটির পর একটি করিয়া জানিতে চান কোন্ কোন্ মুসলমান নেতা জাতীয়তাবাদী দলের সহিত কাজ করিতেছিলেন আর কাহারা সরকারের পক্ষ লইতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে মিশরে মিশরীয় মুসলমানগণ মিশরীয় খ্রীস্টানদের (কপ্ট নামে অভিহিত) সহিত পাকা বোঝা-পড়ায় আসিয়াছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায় একত্রে মিশরের উন্নয়নের জন্য কাজ করিতেছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ভারতেও শীঘ্রই সেই অবস্থার উদ্ভব হইবে। উপসংহারে আমি মুস্তাফাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলাম যে আমরা ভারতীয়রা অত্যন্ত সাগ্রহে মিশরীয় জনগণের ভাগ্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি এবং তাঁহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আমাদের সর্বান্তঃকরণের সমর্থন আছে। বিনিময়ে তিনি স্বাধীনতার জাতীয় সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের প্রতি মিশরীয় জনগণের আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

কায়রোতে একটি কর্মব্যস্ত দিন কাটাইয়া আমরা আমাদের জাহাজ ধরার জন্য ট্রেনে পোর্ট সৈয়দে রওনা হইয়াছিলাম। ট্রেনে কয়েকজন মিশরীয় সহযাত্রী ছিলেন এবং তাঁহাদের কয়েকজন ইংরেজী (ফরাসী মোটামুটি ইংরেজী অপেক্ষা মিশরে অধিকতর জনপ্রিয়) বলিতে পারিতেন বলিয়া আমরা শীঘ্রই আলোচনায় নিমগ্ন হইয়াছিলাম। মিশরের সাধারণ মানুষ ওয়াফদ দলকে কিভাবে গ্রহণ করেন তাহা জানিবার আগ্রহ আমাদের হইয়াছিল। একজন কপ্ট যাত্রী সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন এবং তিনি প্রথমে মুখ খুলিতে চান নাই। কিন্তু যখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আমরা নির্ভরযোগ্য তখন তিনি খোলাখুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মিশরীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত বলিয়াছিলেন যে মুসলমানই হউক আর খ্রীস্টানই হউক সকল মিশরীয় টারবুশ কিংবা ফেজ টুপি ব্যবহার করেন, কারণ ইহা মিশরীয় জনগণের জাতীয় শিরোভূষণ (তাহার আগে পর্যন্ত আমি ফেজ টুপিকে ইসলামের প্রতীক বলিয়া মনে করিতাম)।

রাত্রি ১১টার মধ্যে আমরা জাহাজে উঠিয়াছিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ পথে আমরা যে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার লেসেপ্‌স সুয়েজ খাল নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিমূর্তি দেখিয়াছিলাম এবং শীঘ্রই আমরা সমুদ্রে পড়িয়াছিলাম। ঢেউগুলি আয়তনে বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পোর্ট সৈয়দের আলোগুলি ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া উঠিয়াছিল। ভোর হইলে দেখা গেল যে জাহাজ ওলট-পালট করিতেছিল এবং আমরা অধিকাংশই অসুস্থ বোধ করিতেছিলাম।

'মডার্ন রিভিউ'
এপ্রিল ১৯৩৫

রোমাঁ রোলাঁ কি ভাবেন*

বুধবার, ৩ এপ্রিল, ১৯৩৫। সূর্যকরোজ্জ্বল সকালের জেনেভাকে চমৎকার দেখাইতেছিল। দূরে স্পষ্ট নীল আকাশের পটভূমিকায় দাঁড়াইয়াছিল স্যানিডের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি। আমাদের সম্মুখে ছিল ছবির মতো জেনেভার হ্রদ— তাহার কাঁচ-স্বচ্ছ হৃদয়ে বিরাট সৌধগুলি প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমি তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম। দুই বৎসর পূর্বে ইউরোপে আসার পর হইতে আমার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই মহান পুরুষ ও চিন্তাবিদ্, ভারতের ও ভারতের সংস্কৃতির মহান বন্ধু মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব। ঘটনাচক্রে ১৯৩৩ সালে এবং আবার ১৯৩৪ সালে আমাদের সাক্ষাৎকারে বাধা পড়িয়াছিল কিন্তু তৃতীয় প্রয়াস সার্থক হইতে চলিয়াছে। আমি বিশেষ উৎফুল্ল ছিলাম কিন্তু মাঝে মাঝে উদ্বেগ ও সন্দেহের একটা শিহরণ আমার মধ্যে দেখা দিতেছিল। আমি কি এই ব্যক্তিটির নিকট হইতে প্রেরণা পাইব কিংবা আমাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে? এই মহান স্বপ্নদ্রষ্টা এবং আদর্শবাদী মানুষটি জীবনের কঠিন ঘটনাবলী— প্রতি যুগে প্রতি দেশে, সংগ্রামীর পথের বিপদগুলি— কি উপলব্ধি করিবেন? সর্বোপরি, ভারতের ইতিহাসের দেয়ালে নিয়তি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা কি তিনি করিবেন?

তাঁহার ২২ ফেব্রুয়ারির চিঠির নীচের কথাগুলি আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিল: ..."কিন্তু চিন্তাজগতের মানুষ আমাদের প্রত্যেককে সেই প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যাহা ক্লান্তি ও অস্থিরতার মুহূর্তে আসে এবং যাহা আমাদিগকে যুদ্ধের বাহিরে একটা জগতে লইয়া যাইতে চায়— সে জগৎ ঈশ্বরেরই হউক কিংবা শিল্পেরই হউক কিংবা আত্মার স্বাধীনতারই হউক কিংবা মরমী আত্মার দূরস্থ কোনো অঞ্চলই হউক। কারণ সংগ্রাম আমাদিগকে করিতেই হইবে যেহেতু আমাদের কর্তব্য সমুদ্রের এপারে— মানুষের যুদ্ধক্ষেত্রে।"

দুই ঘন্টা একটানা আমরা লেকের ধারে আঁকাবাঁকা পথে গাড়িতে চলিয়াছিলাম। আবহাওয়া ছিল চমৎকার এবং সুইস রিভিয়েরা ধরিয়া চলার পথে আমরা সুইজারল্যান্ডের সুন্দরতম দৃশ্যাবলী উপভোগ করিয়াছিলাম। আমরা ভিলেনুভেতে পৌঁছানোর পর গাড়ির গতি মন্থর হইয়া শেষ পর্যন্ত ভিলা ওলগার সম্মুখে থামিয়াছিল— যেখানে সেই ফরাসী মনীষী বাস করিতেন।

---

* মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ এই প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

সেটিও ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সুন্দর স্থান। চার দিকে পাহাড়-শ্রেণীর দ্বারা আবৃত এই বাড়ি হইতে ওদের চমৎকার দৃশ্য দেখা যাইত। আমাদের চতুর্দিকে শান্তি, সৌন্দর্য ও মহনীয়তা বিরাজ করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা আশ্রমের উপযুক্ত একটি স্থান ছিল। আমি বেল টিপিবার সংগে সংগে খর্বাকৃতি অথচ সবিশেষ সহানুভূতিশীল সজীব মুখের অধিকারিণী একজন মহিলা দরজা খুলিয়া দিলেন। ইনিই মাদাম রোমাঁ রোলাঁ। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে-না-করিতেই আমাদের সম্মুখে আর-একটি দরজা খুলিয়া গেল এবং সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন একজন দীর্ঘাকৃতি মানুষ, যাঁহার মুখটি ছিল বিবর্ণ এবং চক্ষু দুইটি ছিল আশ্চর্য রকমের অন্তর্ভেদী। হাঁ, এই সেই মুখ, যে মুখ আমি পূর্বে বহু ছবিতে দেখিয়াছি এবং যে মুখ মানবতার দুঃখে ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। সেই বিবর্ণ মুখ ছিল সুন্দর বিষণ্ণতা মেশানো কিন্তু তাহাতে পরাজিতের মনোভাব ছিল না। কেননা তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিতে-না-করিতে তাঁহার সাদা গালে বর্ণাভার ঝলক দেখা দিল— চোখ দুইটি অসাধারণ আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত কথাগুলি ছিল জীবন ও আশায় ভরপুর।

স্বাভাবিক অভ্যর্থনাদি ও ভারত এবং ভারতীয় বন্ধুদের সম্বন্ধে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শীঘ্রই শেষ করিয়া আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নিমগ্ন হইলাম। ম' রোলাঁ ইংরেজী বলিতে পারিতেন না কিংবা বলিতেন না। আর আমি ফরাসী বলিতে পারিতাম না। কাজেই আমাদের দোভাষীরূপে কাজ মাদমোয়াজেল রোলাঁ ও মাদাম রোলাঁ করিয়াছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় পরিস্থিতির সাম্প্রতিকতম অবস্থা লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করা এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার বর্তমান মতামত জানা। সুতরাং আমি যেভাবে বিশ্লেষণ করি ও বুঝি সেইভাবে ভারতীয় পরিস্থিতি তাঁহার কাছে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে আমাকেই বেশি কথা বলিতে হইয়াছিল।

যে দুইটি মূল নীতিগত ১৪ বৎসর আন্দোলনের ভিত্তি ছিল সেগুলি প্রথমত, সত্যাগ্রহ কিংবা অহিংস প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় জনগণের সকল অংশের যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ মূলধন ও শ্রমের এবং জমিদার ও কৃষকের।

ভারতের বড়ো আশা ছিল যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিম্নোক্ত ধারায় শান্তিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলন ক্রমশ দেশের আসামরিক প্রশাসন অচল করিয়া দিবে। ভারতের বাহিরে সত্যাগ্রহে উচ্চ নৈতিকতাবোধ ব্রিটিশ

জনগণের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবে। এইভাবে বিরোধ-মীমাংসায় উপনীত হইয়া ভারত বিনা সংঘাতে ও বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন করিবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। ভারতের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিঃসন্দেহে অহিংস বিপ্লব আনিয়াছে, কিন্তু অসামরিক ও সামরিক উভয় শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের উপর ইহার কোনো প্রভাব পরে নাই এবং সেইজন্য 'রাজার গভর্নমেন্ট' যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিয়াছে। ভারতের বাহিরে মুষ্টিমেয় উদারমনা ইংরাজ নিঃসন্দেহে গান্ধী-নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। আত্মস্বার্থ নৈতিক আবেদনকে নিমজ্জিত করিয়াছে।

স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থতা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের আত্মানুসন্ধানে ব্রতী করিয়াছিল। কংগ্রেস-কর্মীদের একাংশ আইন-সভার পরিধিতে সাংবিধানিক কাজের পুরাতন নীতি অনুসরণ করিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার গোঁড়া অনুচরগণ আইন-অমান্য আন্দোলন (বা সত্যাগ্রহ) স্থগিত রাখার পর গ্রামগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকতর চরমপন্থী অংশ হতাশ হইয়া একটি নূতন আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ একত্রিত হইয়া কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছিলেন।

আমি একটি দীর্ঘ ভূমিকার পর প্রশ্ন করিয়াছিলাম: "যদি যুক্তফ্রন্ট ভাঙিয়া যায় এবং গান্ধী সত্যাগ্রহের শর্তগুলির সহিত যথেষ্ট সমতা বজায় না রাখিয়া যদি কোনো নূতন আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে সে সম্বন্ধে মঁসিয়ে রোলাঁর মনোভাব কী হইবে?"

মঁসিয়ে রোলাঁ বলিলেন যে গান্ধীর সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হইলে তিনি খুব দুঃখিত ও হতাশ হইবেন। মহাযুদ্ধের শেষে যখন গোটা জগৎ রক্তাক্ত সংঘাত ও ঘৃণার মনোভাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল তখন গান্ধী তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রামের নূতন অস্ত্র হাতে লইয়া আবির্ভূত হওয়ায় দিগন্তে নূতন আলোক দেখা দিয়াছিল। গান্ধী সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া মহতী আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম: "আমরা অভিজ্ঞতা হইতে দেখি যে গান্ধীর পদ্ধতি এই বস্তুতান্ত্রিক জগতের পক্ষে অত্যধিক উচ্চ এবং রাজনৈতিক নেতা রূপে তিনি তাঁহার বিরোধীদের সঙ্গে বড়ো বেশি সহজ-সরল আচরণ করিয়া থাকেন। আমরা

আরো দেখিতে পাই যে ব্রিটিশরা ভারতে অবাঞ্ছিত হইলেও, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উদ্ভূত অসুবিধা ও উপদ্রব সত্ত্বেও অধিকতর বলপ্রয়োগের সহায়তায় ভারতে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে। যদি শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয় তাহা হইলে মঁসিয়ে রোলাঁ অন্য পদ্ধতিতে জাতীয় উদ্যোগ পরিচালিত হইতে দেখিতে চান না, তিনি কি ভারতীয় আন্দোলনে আগ্রহ দেখানো বন্ধ করিবেন?"

তাঁহার দৃঢ় উত্তর ছিল: "যে-কোনো অবস্থায় হউক আন্দোলন চালু রাখিতে হইবে।"

"কিন্তু আমি এমন কতিপয় ইউরোপীয় ভারত-বন্ধুকে জানি যাঁহারা স্পষ্টভাবে আমাকে বলিয়াছেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁহাদের আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ পদ্ধতির দরুন?"

মঁ রোলাঁ তাঁহাদের সহিত আদৌ একমত নন। সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হ'লে তিনি দুঃখিত হইবেন। কিন্তু সত্যই যদি ইহা ব্যর্থ হয় তবে জীবনের কঠিন সত্যের মুখামুখি হইতে হইবে এবং তিনি আন্দোলনকে অন্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতে দেখিতে চাহিবেন।

এই উত্তরে আমার মনের কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। একজন আদর্শবাদীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যিনি শূন্যে দুর্গ নির্মাণ করেন না, বরং যিনি শক্ত মাটিতে দণ্ডায়মান।

আমি বলিলাম: "ইউরোপে এমন লোক আছেন তাঁহারা বলেন রাশিয়ায় যেমন পর পর দুইটি বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে— একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব; তেমনই ভারতেও পর পর দুইটি বিপ্লব হইবে— একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং একটি সামাজিক বিপ্লব। আমার মতে অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-আর্থিক মুক্তির সংগ্রাম চালাইতে হইবে। যে দল ভারতে রাজনৈতিক মুক্তি আনিবে সেই দলই সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমগ্র কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিবে। এ বিষয়ে মঁ রোলাঁর অভিমত কি?"

তিনি ভারতীয় পরিস্থিতির সকল ঘটনা জানেন না বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।

আমি বলিলাম: "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট নীতি যদি ভারতের স্বাধীনতা আনিতে ব্যর্থ হয় এবং এমন একটি বৈপ্লবিক দলের উদ্ভব

হয় যে দল কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত নিজেকে একাত্ম করিবে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে মঁ রোলাঁর অভিমত কী হইবে ?”

মঁ রোলাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল যে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের দৃঢ় মনোভাব গ্রহণের সময় আসিয়াছে। তিনি বলিলেন : “এই প্রশ্নে গান্ধীকে তাঁহার মন স্থির করার কথা আমি একটি চিঠিও লিখিয়াছি।”

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বিভেদ দেখা দিলে তাঁহার মনোভাব কী হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আরো বলিলেন : “আমি দুইটি রাজনৈতিক দলের কিংবা দুইটি প্রজন্মের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে আগ্রহী নহি। আমার কাছে যাহা আগ্রহের বিষয় এবং যাহার মূল্য আছে তাহা একটি উচ্চতর প্রশ্ন। আমার কাছে রাজনৈতিক দলগুলির কোনো মূল্য নাই ; যাহার প্রকৃত মূল্য আছে তাহা দলগুলির ঊর্ধ্বে একটি আদর্শ— বিশ্বের শ্রমিক সমাজের আদর্শ। আরো স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যদি দুর্ভাগ্যজনক কোনো পরিস্থিতিতে গান্ধী (কিংবা অন্য যে-কোনো দল) শ্রমিকদের আদর্শের সহিত এবং সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে তাহাদের প্রয়োজনীয় বিবর্তনের সহিত সংঘাতে জড়াইয়া পড়েন যদি গান্ধী (কিংবা অন্য কোনো দল) শ্রমিকদের আদর্শের দিকে মুখ ফেরান ও তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকেন তাহা হইলে চিরদিনের মতো আমি নির্যাতিত শ্রমিকদের পক্ষ লইব— চিরদিন আমি তাহাদের উদ্যোগের অংশীদার হইব…, কারণ তাহাদের দিকেই ন্যায় এবং মানব-সমাজের প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নের অনুশাসন রহিয়াছে।”

আমি আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। এমন-কি আমার সর্বাধিক আশাবাদী মনোভাবেও আমি ইহা কখনো প্রত্যাশা করি নাই যে এই মহান মনীষী এত স্পষ্টভাবে ও সাহসের সহিত শ্রমিক আদর্শের সমর্থনে মত প্রকাশ করিবেন।

আমাদের এই উদ্দীপিত আলোচনার ফলে পরিশ্রম বেশি হইয়াছিল এবং আমি গৃহকর্তার ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্‌বেগ বোধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, চা আসিবার সংবাদে স্বস্তি বোধ করিয়া আমরা সকলে পার্শ্ববর্তী একটি ঘরে গেলাম।

চায়ের কাপ সম্মুখে রাখিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের আলোচনা চলিল। আমাদের আড়াই ঘন্টার দ্রুত আলোচনায় অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল এবং ইহার গঠন সম্বন্ধে মঁ রোমাঁ রোলাঁ গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের

অব্যাহত কারাবাস তাঁহার গভীর উদ্‌বেগের কারণ হইয়াছিল। মহাত্মার সকল কর্ম, বক্তৃতা ও লেখা সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ বিস্ময়কর ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি তাঁহার পুরাতন নথি হইতে মহাত্মার এমন একটি বিবৃতি টানিয়া বাহির করিলেন যাহাতে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল।

আমরা মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার কৌশল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করি। আমি সাহস করিয়া এই মন্তব্য করিলাম যে মহাত্মা অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিত মনোভাব গ্রহণ করিবেন না। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থ-নৈতিক প্রশ্নে তিনি প্রকৃতিগতভাবে "সুবর্ণমণ্ডিত মধ্য পন্থায়" আস্থাশীল ছিলেন। তরুণতর প্রজন্ম তাঁহার নেতৃত্বে ও কৌশলে যেগুলি ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করেন অতঃপর আমি তাহার একটির উল্লেখ করি, যেমন তাঁহার হাতের সমস্ত তাস টেবিলে খুলিয়া ধরার সংশোধনাতীত অভ্যাস, রাজনৈতিক প্রতি-দ্বন্দ্বীদের সামাজিক বয়কট নীতির বিরোধিতা, ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়-পরিবর্তনে তাঁহার আশা প্রভৃতি। আমি বলি যে তিনি যখন সাম্প্রতিক ইতিহাসে যে-কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা দেশের বেশি সেবা করিয়াছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে ভারতের মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহার বিরোধিতা করায় এমন-কি তাঁহার সমালোচনা করায় আমরা কোনো সন্তুষ্টি পাই না। কিন্তু আমরা কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা দেশকে অনেক বেশি ভালোবাসি।

মঁসিয়ে রোলাঁ সারাজীবন যে-সব প্রধান নীতির ধারক এবং যেগুলির জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন সেগুলি সংক্ষেপে যদি তিনি দয়া করিয়া বর্ণনা করেন সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলেন : "সেই-সব মৌলিক নীতি হইল : ১. আন্তর্জাতিকতা (নির্বিচারে সকল জাতির জন্য সমান অধিকার সহ), ২. শোষিত শ্রমিকদের জন্য ন্যায়-বিচার— তাহার অর্থ এই যে আমাদের এমন এক সমাজের জন্য সংগ্রাম করা উচিত যেখানে কোন শোষক এবং শোষিত থাকিবে না— কিন্তু সকলেই সমগ্র সমাজের জন্য শ্রমিক হইবেন, ৪. সব অবদমিত জাতির জন্য স্বাধীনতা এবং ৪. পুরুষদের মতো নারীদের জন্য সমান অধিকার।" আর তিনি এগুলির কয়েকটি দফা ব্যাখ্যা করেন।

আমাদের আলোচনা সমাপ্তির দিকে আসিলে আমি মন্তব্য করি যে তিনি সেই অপরাহ্নে যে সব অভিমত প্রকাশ করেন সেগুলি অনেক মহলে বিস্ময় সৃষ্টি করিবে, কারণ সেগুলি তাঁহার চিন্তা-জীবনে সাম্প্রতিক বিবর্তন বলিয়া মনে হয়। এই মন্তব্য বৈদ্যুতিক বোতামের কাজ করিয়া এক সামগ্রিক চিন্তাধারাকে

সঞ্চারিত করে। যুদ্ধের পর হইতে তাঁহার সমাজ-সম্পর্কিত ধারণা এবং তাঁহার সমগ্র আদর্শবাদ সংশোধন করিতে গিয়া তিনি যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগিয়াছিলেন তাহার কথা মঁ রোলাঁ বলেন। তিনি বলেন: "নিজের মধ্যে এই সংঘাত একটি খুব বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া সম্প্রসারিত এবং অহিংসার সমস্যা ইহার একটি অংশ মাত্র। আমি অহিংসার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসি নাই কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে অহিংসা আমাদের সমগ্র সামাজিক কার্যের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হইতে পারে না। এখন পর্যন্ত পরীক্ষা সাপেক্ষে ইহা একটি উপায় মাত্র— ইহার প্রস্তাবিত রূপগুলির অন্যতম হইতে পারে।

তিনি আরো বলেন: "আমাদের সকল উদ্যোগের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিকতর ন্যায়সংগত ও অধিকতর মানবিক অপর একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা। ... আমরা তাহা না করিলে, সমাজের অবসান সূচিত হইবে।" তাহার পর কাজের পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন: "...কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার কাজ হইয়াছে, যে প্রাচীন ব্যবস্থা মানবতাকে শৃংখলিত ও শোষণ করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়াস করা ও শক্তিগুলিকে ... একত্রিত করা। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দলের যে বিশ্ব-কংগ্রেস ১৯৩২ সালে আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে এবং সেই কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত স্থায়ী কমিটিগুলিতে ইহাই আমার ভূমিকা ছিল। আমি এখনো বিশ্বাস করি অহিংসার মধ্যে একটা কঠিন অথচ সুপ্ত বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে, যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ব্যবহার করা উচিতও, ..."

আমি এই পর্যায়ে তাঁহাকে বাধা দিয়া বলি যে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষেরা তাঁহার বর্তমান ধারণাগুলি কি করিয়া জানিতে পারিবেন। ইহার উত্তরে তিনি বলেন: "আমার এই পনের বছরের সামাজিক প্রত্যয় সদ্য প্রকাশিত দুই খণ্ডের প্রবন্ধাবলীতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রিডার সংস্করণ, বুলেভার্ড সেন্ট জার্সেল ১০৮, প্যারী-৬-এর 'কুইঞ্জ-এ অ্যানস দ্য কম্ব্যাট' (পনের বৎসরের সংঘাত) নামক প্রথম খণ্ডে আমি আমার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আমার সামাজিক ধারণার বিবর্তনের কথা বলিয়াছি। সোস্যালেস ইন্টারন্যাশনালস্ সংস্করণ ২৪, রু র‍্যাসিন, প্যারী-৬-এর 'পার লা রেভোলিউশন লা পাইক্স' (বিপ্লব হইতে শান্তির পথে) নামক দ্বিতীয় পুস্তকে আমি যুদ্ধ, শান্তি, অহিংসা সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ... এবং প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের

উদ্যোগগুলির সমন্বয় সাধন লইয়া আলোচনা করিয়াছি।" তিনি আরো বলেন যে তাঁহার কিছু সংখ্যক বন্ধু, তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার সব মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং তাহারা যে অংশগুলির সহিত একমত কেবলমাত্র সেইগুলিই গ্রহণ করিতে চান। অবশ্য এই দুই খণ্ড বই* তাঁহার চিন্তা-বিবর্তনের বিশ্বস্ত বিবরণী হইয়া থাকিবে!

ইউরোপে বহু-আশংকিত ও বহু-বিতর্কিত যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ব্যতীত আমাদের আলাপ শেষ হয় নাই। আমি মন্তব্য করি: "অবদমিত জনসাধারণ ও জাতিগুলির পক্ষে যুদ্ধ অবিমিশ্র কুফল আনে না।" তিনি বলেন: "কিন্তু ইউরোপের পক্ষে যুদ্ধ চরমতম বিপদ হইবে। ইহার অর্থ এমন কি সভ্যতার অবসান হইতে পারে। আর রাশিয়াকে যদি তাহার সামাজিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী সম্পূর্ণ করিতে হয় তবে তাহার পক্ষে শান্তি অনিবার্যভাবে আবশ্যক।

গৃহকর্তার নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে আমি তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এবং তিনি আমাকে যাহা বলিলেন সেজন্য আমার পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। ভারতের প্রতি এবং তাহার আদর্শের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিকে আমি এত বেশি মূল্য দিতাম যে ভারতীয় পরি-স্থিতির সাম্প্রতিকতম বিবর্তনের সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিক্রিয়া কি হইবে ইহা যখনই আমি কল্পনা করার চেষ্টা করিতাম তখনই আমার হৃদয় উদ্বেগ ও ভয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

আমি যখন ভিলা ওল্‌গা হইতে বাহির হই তখনও জেনেভা হ্রদের নীল জলরাশিতে সূর্য উজ্জ্বল রশ্মি বিকিরণ করিতেছিল। আমার চতুর্দিকে তুষারাবৃত পর্বতগুলি দণ্ডায়মান। বাতাস ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ এবং ইহা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আমার মন হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া যায়। আমি প্রত্যয় বোধ করিয়াছিলাম যে ভারতের অব্যবহিত ভবিষ্যতের কিংবা ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, এই মহান মনীষী ও শিল্পী ভারতের পক্ষে ও তাহার স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াইবেন। আর এই প্রত্যয় লইয়া আনন্দিত চিত্তে আমি জেনেভায় ফিরিয়াছিলাম।

কার্লসবাদ, ২ জুলাই, ১৯৩৫

---

* আমি সবে মাত্র গ্রন্থকারের নিকট হইতে এই দুইটি বই উপহার পাইয়াছি ও কি পরিতাপের বিষয় আমি এগুলি মূলে পড়িতে পারি না। তবু এই বইগুলি পড়িবার জন্য হইলেও আমার ফরাসী শিখিতে ইচ্ছা করে।

সম্পাদকের মন্তব্য ঃ—ভারতে প্রচলিত সংবাদপত্র সম্পর্কিত আইনগুলি আমরা যতটা বুঝি তদনুসারে সেগুলির প্রয়োজন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রবন্ধের তারকাচিহ্নিত কতকগুলি অংশ বাদ দিয়াছি।

'মডার্ন রিভিউ'
সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দায়িত্ব-গ্রহণের ভালো-মন্দ

নির্বাচনোত্তর মন্ত্রীসভা গঠনের প্রাক্‌কালে প্রচারিত বক্তব্য।

এখন যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক যে-সব প্রদেশে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য আছে সেই-সব প্রদেশে কংগ্রেসের সদস্যগণকে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে তখন সম্মুখের বিপদগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। যদিও ব্রিটিশ-ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ছয়টিতে (অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্য-প্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে, সন্দেহ নাই যে আগামী কিছুকালের জন্য মন্ত্রিগণের ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির কার্যের প্রতি সারা ভারতের কংগ্রেস কর্মীদের এবং সাধারণভাবে জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে। সাংবিধানিক কার্যাদি এখন বড়ো হইয়া উঠিবে বলিয়া এতদিন পর্যন্ত আইন অমান্যের মতো যে-সব সংবিধান-বহির্ভূত প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র কংগ্রেসের হাতে ছিল সেগুলি পশ্চাদভাগে চলিয়া যাইবে। আবশ্যিকভাবে জনগণের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসিবে এবং বহু কংগ্রেসকর্মীর মনে পদাধিকারের রুটি ও মাছের প্রতি লোভ জন্মিবে। যে 'বিদ্রোহী মনোভাব' গড়িয়া তুলিতে কংগ্রেসের বহু বৎসর লাগিয়াছে তাহা আবার আত্মসন্তুষ্টি ও জড়তার কাছে আত্মসমর্পণ করিবে। বহু সম্ভাবনার মধ্যে এগুলি বর্তমানে মাথা চাড়া দিয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন যে ক্ষমতা-গ্রহণ নীতির দিক হইতে ভ্রান্ত আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন নই। নিঃসন্দেহে আইন-সভাগুলিতে প্রবেশ ও পদগ্রহণের মধ্যে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের কাছে আনুগত্য গ্রহণ জড়িত আছে। কিন্তু আমি সর্বদা এই ধরনের শপথ গ্রহণকে চরিত্রের দিক হইতে শুধুমাত্র সাংবিধানিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি। ১৯২২ ও ১৯২৫ সালের মধ্যে যখন কংগ্রেসী মহলে আইন-সভায় প্রবেশের প্রশ্নটি লইয়া তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন এরূপ প্রবেশের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে আনুগত্য গ্রহণ আবশ্যিকভাবে জড়িত আছে— বিরোধীদের এই যুক্তি কখনো আমার কাছে আবেদন জানায় নাই। মি. ডি ভ্যালেরা যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে আনুগত্য গ্রহণ করিয়া ডেইলে প্রবেশ করেন ও তাহার অবলুপ্তি ঘটান, তখন আমি তাহার মধ্যে নৈতিক দিক হইতে অন্যায় কিছু দেখি না। বিষয়টির মধ্যে যে-সব প্রশ্ন জড়িত সেগুলি

নীতিগত নয়, সেগুলি হইল কৌশলগত— আমি এইরূপে প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতাসম্মত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি।

আমার নিজের পৌরপ্রশাসনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে প্রশাসনের ক্ষেত্রে সাফল্য অসংখ্য খুঁটিনাটি অধিগত করার ক্ষমতা দাবি করে। সুতরাং প্রশাসনিক কাজে পুরাপুরি মনঃসংযোগ করিলে বৃহত্তর সমস্যার মোকাবিলা করার মতো বাড়তি সময় কিংবা উৎসাহ থাকে না। এরূপ লোক খুব কমই দেখা যায় যিনি একই সঙ্গে সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানও চিন্তা করিতে পারেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে ১৯২৪ সালে আমি যখন কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম-সচিব ছিলাম তখন আমি প্রশাসনের খুঁটিনাটিতে এমন ডুবিয়া থাকিতাম যে কংগ্রেসের কাছে আমি পুরাপুরি মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমি খোলা চোখে এই কাজ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কারণ এই আশ্বাস আমি পাইয়াছিলাম যে অব্যাহত শক্তিতে কংগ্রেসের কাজ চালাইবার মতো লোকের অভাব হইবে না।

আমি সর্বদা এই অভিমত পোষণ করিয়াছি যে যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন স্বাধীনতা অর্জিত হইলে 'যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের' দায়িত্ব তাঁহা-দিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের ব্রত শেষ হইয়াছে, এই অজুহাতে দায়িত্ব এড়ানো চলিতে পারে না। সুতরাং একটি রাজনৈতিক দল বিজয়ী হইবার পরেই তাহাকে মনেপ্রাণে প্রশাসনের কাজে ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয় এবং সেইভাবে ইহা প্রমাণ করিতে হয় যে সে যেমন ধ্বংস করিতে পারে তেমনই কার্যকরভাবে সৃষ্টিও করতে পারে। কিন্তু দল সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারার পূর্বে আকাঙ্ক্ষিত সময় আসিয়াছে কিনা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয় হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। আমাদের হাতে যে প্রশ্নটি আছে তাহা বিবেচনা প্রসঙ্গে আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হই। "আমরা যাহার জন্য প্রয়াস করিয়া আসিয়াছি ১৯৩৫-এর ভারত সরকারের আইন তাহা আমাদিগকে দিয়াছে কি? আর কেন্দ্রীয় সরকারের কথা এখন ছাড়িয়া দিলেও এমন-কি প্রদেশগুলিতেও ইহা আমাদিগকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন দিয়াছে?" ইহার স্পষ্ট জবাব— "না"।

অবশ্য যুক্তি দেখানো হইবে যে রাজনৈতিক এবং সামরিক সংগ্রামে যেমন আমরা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই তেমনই আমাদের প্রতিটি সুবিধাজনক স্থান দখল করিতে হয় এবং নিজেদের অবস্থা সুসংহত করিতে হয়। খুবই সত্য কথা।

কিন্তু আমরা কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে ক্ষমতার আসনগুলির মূল্য যাহাই হউক সেগুলি দখল করার চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা প্রশাসনের গোলকধাঁধার মধ্যে হারাইয়া যাইব না এবং যে 'বিদ্রোহী মনোভাব' সমস্ত রাজনৈতিক অগ্রগতির মূলমন্ত্র তাহা বর্জন করিতে আরম্ভ করিব না ? কংগ্রেস আজ স্পষ্টই একটি সমস্যার সম্মুখীন। যে স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনো অর্ধ-অর্জিত তাহা চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস তাহার প্রথম সারির সকল মানুষকে মন্ত্রীপদ গ্রহণের অনুমতি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি বিভিন্ন প্রদেশে প্রকৃত প্রথম সারির মানুষ কংগ্রেসী মন্ত্রী না হন তাহা হইলে সংবিধান আমাদিগকে যে-সব প্রভাব ও ক্ষমতার আসন দিয়াছে সেগুলির পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করিতে আমরা ব্যর্থ হইব। একমাত্র স্বর্গীয় ভি. জে. প্যাটেলের মতো প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ১৯২৪-৩০ সালে ভারতীয় আইন-সভার সভাপতিরূপে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করিবে, সংসদীয় নজির সৃষ্টিতে এবং সরকারী বেঞ্চের সদস্যগণকে তাঁহাদের নিজেদের স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইতেন। ভি. জে. প্যাটেলের পাশাপাশি সম্মুখম চেট্টিদের ও আব্দুর রহিমদের নগণ্য মেরুদণ্ড-বিহীন বলিয়া মনে হয়।

তাঁহারা যদি গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন কিংবা বলিবেন যে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রশাসনে অভিজ্ঞতা অপরিহার্য এবং নূতন সংবিধান সেইরূপ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়। কিন্তু সহজেই এ যুক্তির মোকাবিলা করা যায়। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের অভিজ্ঞতা একইরূপ এবং শেষোক্তটি যে-কোনো দলের সম্পদ হইলেও প্রথমোক্তটি অন্য রকম না হইয়া অধিকতর পরিমাণে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যুদ্ধোত্তর যুগে এবং সকল যুগে ও সকল দেশে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রশাসক যাঁহারা হইয়াছিলেন তাঁহারা যখন তাঁহাদের পূর্বসূরীদের নিকট হইতে পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ছিলেন তুলনামূলকভাবে তরুণ এবং প্রশাসনে অনভিজ্ঞও। আমায় যুক্তির সরলতা বুঝিতে সেদিন, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি ও কামাল পাশা প্রমুখ সফল প্রশাসকদের দিকে তাকাইতে হয়। ঘটনা এই যে বিপ্লবের (হিংসাত্মক কিংবা অহিংস যাহাই হউক-না-কেন) পর নূতন প্রশাসনের সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর নীতি ও প্রয়োগ-কৌশলের প্রয়োজন হয় এবং সাফল্যের সহিত নূতন পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে প্রয়োজন হয় সাহস, কল্পনাশক্তি ও দক্ষতার।

'অভিজ্ঞ' প্রশাসকগণ কি সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিংবা তুর্কীদের জন্য নূতন প্রজাতন্ত্র গড়িয়াছিলেন কিংবা ইটালীর জন্য নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিংবা নৈরাজ্য ও দুর্নীতির মধ্যে হইতে সৃষ্টি করেছিলেন নূতন পারস্যের ?

এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রীয় দুর্গ (ভারত সরকার) এখনো ব্রিটিশ সরকারের হাতে আছে এবং আমাদের হাতে যে প্রাদেশিক সরকারগুলি আসিয়াছে সেগুলি চৌকি মাত্র এবং সেগুলিও পুরাপুরি হাতে আসে নাই। এই অবস্থায় যদি আমাদের দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রশাসনের খুঁটিনাটিতে নিমজ্জিত থাকিতে মনস্থ করে তবে আমরা মূল সমস্যা হইতে লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া এবং আমাদের আদি উৎসাহের বহুলাংশ না হারাইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে পারিব কি ? এ প্রশ্নের অগ্রসিদ্ধান্ত-মূলক উত্তরের বেশি মূল্য নাই এবং কাল পূর্ণ হইলে ঘটনাবলীই আমাদের যথোচিত উত্তর জোগাইবে। কিন্তু যদি পদ গ্রহণের পক্ষপাতী দলের বিশ্বাস যুক্তিসংগত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে যে-সব বিপদ আমাদের সম্মুখে আসিতে পারে এবং প্রথম অনুচ্ছেদে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক ও সাবধান হইতে হইবে। যে প্রশ্ন সম্বন্ধে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহকের সিদ্ধান্ত চিরদিনের জন্য হইয়া গিয়াছে সে প্রশ্ন সম্বন্ধে পুনরালোচনা আরম্ভ করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়—আমার উদ্দেশ্য হইল এই যে নূতন সংবিধান হইতে শ্রেষ্ঠ ফয়দা উঠাইতে থাকিয়া আমরা যদি ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে অগ্রগতি সাধন করিতে চাই তাহা হইলে যে-সব বিপদ এড়াইয়া চলিতে হইবে সেই-সব বিষয় চিহ্নিত করা।

যে-কোনো ভারতীয় রাজনীতিবিদকে যে-সব বড়ো সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইবে সেগুলি হইল দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ব্যাধি ও নিরক্ষরতা। প্রভূত অর্থ-সামর্থ্যসমন্বিত মাত্র একটি জাতীয় সরকারের দ্বারা এই-সব সমস্যার সার্থক সমাধান হইতে পারে। এই-সব সমস্যার মোকাবিলা করার ইচ্ছা হইলে আমাদের সংগঠনের ও অর্থের প্রয়োজন হইবে। বৃহৎ পরিধিতে জাতি গঠনের কাজ করার মতো প্রয়োজনীয় সংগঠন ও অর্থ প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পাইবেন কি ? সংগঠন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে ঊর্ধ্বতন পদগুলিতে ব্রিটিশদের প্রাধান্য বর্তমান এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহ্যে লালিত-পালিত ও তাঁহারা এ-বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকিবেন যে তাঁহাদের বেতনাদি ও পেন্সন সংবিধানে

মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে সংরক্ষিত। কংগ্রেস মন্ত্রীগণ আবশ্যিকভাবে যে নূতন কর্মনীতি চালু করিবেন এই ধরনের অফিসারগণ কি তাহা অনুসরণ করিবেন ? যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটিবে ? সর্বাধিক ভালো অভিপ্রায় লইয়া তাঁহারা কি বাধাদানকারী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে সংগ্রাম করিতে পারিবেন ? ঊর্ধ্বতন পদের কর্মচারীদের পরিবর্তিত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে, কারণ এই-সব রাজকর্মচারী 'সংরক্ষিত' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যাহা মন্ত্রীগণের স্পর্শের অতীত। সুতরাং যতটা ভালোভাবে পারেন ইঁহাদের লইয়াই মন্ত্রীদের কাজ করিতে হইবে, যদিও ইঁহাদের বাধাদানকারী নীতির ফলে মন্ত্রীদের কাজ বাধা প্রাপ্ত হইবার বিপদ থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া কয়েকটি প্রদেশে বহুলাংশে ব্রিটিশ অফিসার এবং তাঁহাদের ভূতপূর্ব সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের বিষম দৃশ্যও আমাদের চোখে পড়িবে।

অর্থ সংস্থানের সমস্যা আরো বেশি ভয়ংকর। কংগ্রেস দল এমন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেগুলি সরকারী রাজস্বের মূলে আঘাত করিবে এবং তাহার দলে বৃহৎ পরিধিতে জাতিগঠনমূলক কাজ আরম্ভ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। জমির খাজনা হ্রাসের পর এবং আবগারির ক্ষেত্রে মাদক বর্জনের নীতি প্রবর্তনের পর মন্ত্রীসভা বাজেট ঘাটতির সম্মুখীনও হইতে হইতে পারেন। অন্য কোনো দেশ হইলে অর্থমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করিতেন। ভারতীয় প্রদেশগুলিতে ঊর্ধ্বতন পদের কর্মীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি স্পর্শ করাও যাইবে না এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীরা এত কম বেতন পান যে সেখানে ব্যয়সংকোচের কোনো অবকাশই নাই। ফলে এ ক্ষেত্রে ব্যয় ছাঁটাইয়ের কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সামরিক বাহিনী, রেলওয়ে, ডাক ও তার, শুল্ক প্রভৃতি কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়ায় এই-সব বিভাগগুলিতে ছাঁটাই কিংবা এগুলি হইতে আয় বৃদ্ধিও সম্ভব হইবে না। ভারতের বিরাট স্বর্ণ-মজুত-ভাণ্ডার থাকায় মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা অধিকতর অর্থ সংস্থান সম্ভব হইলেও কোনো প্রাদেশিক সরকার তাহা করিতে পারিবেন না কারণ মুদ্রানীতিও কেন্দ্রীয় বিষয়। এইরূপ অবস্থায় একমাত্র যে পথ প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষেত্রে খোলা থাকিবে তাহা হইল জাতিগঠনমূলক কাজের অর্থ সংস্থানের জন্য বড়ো ধরনের ঋণ সংগ্রহ করা। কিন্তু গভর্নর কি প্রাদেশিক আইন-সভার অনুমোদনের জন্য এরূপ ঋণ সুপারিশ করিবেন এবং সংবিধান অনুসারে যে ধরনের অনুমোদন প্রয়োজন সে ধরনের

অনুমোদন কি লর্ড লিনলিথগোর প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকার দিবেন ? ইহা যদি না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শূন্যে হতাশার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত বিচার-বিবেচনার আলোকে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা স্পর্শযোগ্য কী উপকার করিতে পারেন আসুন তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখি। প্রথমত তাঁহারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে পারেন, নিপীড়নমূলক আইন ও অর্ডিনান্সগুলি প্রত্যাহার করিতে পারেন এবং জনগণকে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহারা প্রাদেশিক প্রশাসনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতে পারেন এবং সকল শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের জন্য, বিশেষ করিয়া পুলিশের জন্য জনসেবার একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন। এইভাবে তাঁহারা সরকারের বর্তমান অফিসার ও কর্মীদের নিকট হইতে অধিকতর কাজ আদায় করিতে পারেন এবং প্রশাসনের মান উন্নত করিতে পারেন। তৃতীয়ত, যেখানে যেখানে সম্ভব সরকারী সহযোগিতা দিয়া তাঁহারা কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ-গুলিকে উৎসাহিত করিতে পারেন। চতুর্থত, তাঁহারা স্বদেশী শিল্পগুলিকে এবং বিশেষ করিয়া খাদিকে (হাতে কাটা সুতা ও হাতে বোনা কাপড়) উৎসাহ দান করিতে পারেন। সরকারী ভাণ্ডারের জন্য যখন জিনিসপত্র ক্রয় করা হয় তখন আমদানী করা পণ্যের বদলে স্বদেশী পণ্য কিনিয়া এই উৎসাহ দান করা সম্ভব। পঞ্চমত, তাঁহারা কয়েকটি ক্ষেত্রে (যেমন সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি), বিশেষ করিয়া যেখানে আইন প্রণয়ন অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ নয়, সেখানে কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। ষষ্ঠত, পৃষ্ঠপোষকতার সযত্ন বিতরণের দ্বারা তাঁহারা প্রদেশের জাতীয়তাবাদী উপাদানগুলিকে শক্তিশালী, প্রসংগত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দুর্বল করিতে পারেন। সপ্তমত, জনগণের সম্পদ, তাঁহাদের কর দিবার সামর্থ্য এবং বেকারত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রদেশের একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সমীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। অষ্টমত, তাঁহারা কোনো কোনো বিভাগে কিছু পরিমাণ ছাঁটাই করিতে পারেন। নবমত, তাঁহারা নিজেদের সরকারী পদ প্রয়োগ করিরা কেন্দ্রে ফেডারেশন প্রবর্তনে বাধা দিতে পারেন। সর্বশেষ হইলেও যাহা নগণ্য নয় তাহা হইল এই যে নিজেদের উদাহরণের মাধ্যমে তাঁহারা অন্য পাঁচটি প্রদেশের অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভার উপর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

আর যাহাই হউক, এগুলি তো খণ্ড খণ্ড সংস্কার মাত্র। এগুলি জনসমক্ষে

কিছুদিনের জন্য করিলে দীর্ঘদিনের জন্য সন্তুষ্ট করিবে না। প্রথম বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ব্যাধি, নিরক্ষরতা প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলি আবার গুরুতর আকার ধারণ করিবে এবং এবং দ্রুত প্রতিকার দাবি করিবে। কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও প্রাদেশিক অর্থ সংস্থানের সীমাবদ্ধতা লইয়া কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কি এই দাবির মোকাবিলা করিতে পারিবেন? দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মোকাবিলা করা যায় একমাত্র ব্যাংক ও ঋণ সুবিধাগুলির সম্প্রসারণসহ কৃষির উন্নয়ন ও জাতীয় শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের দ্বারা। এই সব-কিছুর জন্য অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইবে। ব্যাধি নির্মূল করার জন্য বহু পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে একদিকে প্রতিষেধক ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে এবং অন্যদিকে খেলাধুলা ও দৈহিক ব্যায়াম ব্যবস্থাদি প্রবর্তন-কল্পে। আর নিরক্ষরতা দূরীকরণ তো শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য বিনাবেতনে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া লয় এবং তাহা সম্ভব হইবে যখন মন্ত্রীদের হেফাজতে বিশাল পরিমাণ অর্থ আসিবে!

এই যে-সব মূলগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এখনো আজিকার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাগ্রসর জাতিগুলিও করিয়া উঠিতে পারে নাই সে-সব সমস্যার ভারতে সার্থকভাবে মোকাবিলা করা যাইবে তখন, যখন কেন্দ্রে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকিবে। ইহা ছাড়া আম্যর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ভারতের মতো যে পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র দেশকে অতীতের অনুন্নতির দায় মিটাইতে হয় তাহার অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন কখনো গোঁড়া অর্থনীতির নীতি কিংবা নজিরগুলি অনুসরণ করিয়া মিটানো যাইবে না। সুতরাং অদূরভবিষ্যতে আমি এমন একটা সময় কল্পনা করিতে পারি যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি তাঁহাদের খণ্ড খণ্ড সংস্কারের কর্মসূচী বহুলাংশ রূপায়িত করিয়া বুঝিবেন যে দিল্লীতে জনপ্রিয় সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং দেশের জনগণের কাছে ক্ষমতার পূর্ণ হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত আর অগ্রগতি সম্ভব হইবে না।

কিন্তু আমাদের ইহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে আমরা এই অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ বিনা বাধায় কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন। যে-সব অসুবিধা তাঁহাদের সরকারী জীবনে বাধা সৃষ্টি করিয়া চলিবে তাহাদের দুইটির ইংগিত আমি ইতিপূর্বে দিয়াছি অর্থসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং উর্ধ্বতন রাজকর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। প্রথম বিষয়টি লইয়া আর অধিক

আলোচনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি দ্বিতীয়টির উদাহরণ দিতে চাই। একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ গ্রহণ করুন : ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস। পুরাতন পরিকল্পনা অনুসারে এই সার্ভিসে ৩৮৬ জন ব্রিটিশ ও ২৬৩ জন ভারতীয় কর্মচারী ছিলেন। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিটিশ কর্মচারীর সংখ্যা ঠিক থাকিয়া যাইবে আর ভারতীয়দের সংখ্যা কমাইয়া ১৯৮ করা হইবে এবং এই সংখ্যার মধ্যে আবার থাকিবেন স্বল্পকালীন কমিশনের ৫৮ জন কর্মচারী। ভবিষ্যতে আই. এম. এস. অফিসারগণের মূল বেতন হ্রাস করা হইবে কিন্তু সাগরপারের ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশরা ইহার ক্ষতিপূরণ অপেক্ষাও বেশি লাভবান হইবেন। প্রসংগত ভারতীয় সদস্যগণকে এই সাগরপারের ভাতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। এইভাবে এই নূতন পরিকল্পনায় আই.এম.এস.-এর ব্রিটিশ সদস্যদের তুলনায় ভারতীয় সদস্যদের অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা আরো খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। আর বর্তমান অবস্থা আরো খারাপ হইবে এই কারণে যে দেশের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জেলায় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কাজ ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে। যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ এই অবস্থার জন্য দায়ী হইবেন না এবং যদিও ওয়াকিবহাল ও শিক্ষিত মানুষেরা তাঁহাদের অবস্থার অসারতা বুঝিবেন, তবু সাধারণ মানুষ ঊর্ধ্বতন পদগুলির ভারতীয়করণে এবং সেই-সব পদাধিকারীগণ যে অত্যধিক বেতন ও ভাতা পান তা হ্রাসকরণে অসামর্থ্যের সকল দায় হইতে প্রাদেশিক সরকারকে মুক্তি দিবেন না। ছয়টি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীগণ নিজেদিগকে একটা বিষম অবস্থায় দেখিতে পাইবেন, কারণ নামে তাঁহারা আই.এম.এস. অফিসারগণের প্রভু হইলেও কার্যত তাঁহারা ইঁহাদের প্রাপ্য একটি সুযোগ-সুবিধারও নড়চড় করিতে পারিবেন না। ঊর্ধ্বতম ভৃত্যদের অন্যান্য শাখার অবস্থাও হইবে আই. এম. এস.-এর মতো।

ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির যদি এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইলে অন্যান্য পাঁচটি প্রদেশের মন্ত্রীসভাগুলির কৃতিত্ব কতটা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই শেষোক্ত প্রদেশগুলির মন্ত্রীগণ তো মেরুদণ্ডহীন এবং তাঁহাদের একমাত্র উচ্চাশা হইল কোনোক্রমে পদে টিঁকিয়া থাকা। উদাহরণস্বরূপ বাংলায় গত চার মাসে মন্ত্রীসভার কৃতিত্ব কিংবা বরং কৃতিত্বহীনতা ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শক। যে-কোনো জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার কার্যসূচীর প্রথম দফাটিতেই তাঁহারা এখন সাহস করিয়া হাত দিতে পারেন নাই। আমি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলিতেছি। তাহা হইলে বাংলার যে কঠিন পাট সমস্যার

সমাধানের উপর অন্তত চল্লিশ লক্ষ না হইলেও ত্রিশ লক্ষ মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই সমস্যার সমাধানে মন্ত্রীসভার নিকট হইতে প্রত্যাশ করা যাইতে পারে ?

আমার মনে পরে যে ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি যখন ডাবলিনে ছিলাম তখন আমি কৃষিমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে কিছুটা একই ধরনের সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলাম। সে আলোচনার বিষয় ছিল আইরিশ ফ্রী স্টেটে বীট চাষের সংকোচন, চিনির কলগুলিতে ইহার প্রয়োজন এবং সেই দেশে উৎপন্ন চিনির বিপণন। আর তখন আমি বুঝিয়াছিলাম কলিকাতায় ও দিল্লীতে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সরকার থাকিলে বাংলার পাট সমস্যার সমাধান কত সহজ। আমি বিশ্বাস করি যে বাংলায় একটি জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা এমন-কি সংবিধানের সীমার মধ্যে থাকিয়া পাট সমস্যার সমাধানে অনেক কিছু করিতে পারেন অবশ্য যদি তাঁহাদের কয়েকটি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাহস থাকে যদিও যেখানে পাট উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হইবে সেখানে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবীরূপে বাধাগ্রস্ত থাকিবেন। কিন্তু বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভায় প্রতিভার যেমন অভাব তেমনই অভাব সাহসের এবং সেইজন্য এই মন্ত্রীসভার নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইতে পারে না।

তাহা হইলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হইবে যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নীতি হইতে সারবান কিছু পাওয়া যাইবে না ? নিশ্চয়ই না। যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর বিপরীতভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির মাধ্যমে দূরপ্রসারী সংস্কারের আশা আমি করি না, তবু আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নীতি পূর্ণতম পরিমাণে প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আমাদিগকে পুরোপুরি সজাগ থাকিতে হইবে এবং কংগ্রেস যাহাতে একটি মহান উদারনৈতিক সংঘ না হইয়া দাঁড়ায় তাহা দেখিতে হইবে। কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোকের অভাব নাই যাঁহারা সুযোগ পাইলে সাংবিধানিকতার অধিকতর আরামদায়ক পথে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন।

ক্ষমতা গ্রহণ হইতে সর্বাধিক যে উপকার পাওয়া যাইবে তাহা হইল এই যে ইহা জনসাধারণকে এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিরা তুলিবে যে কংগ্রেসই ব্রিটিশ সরকারের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী এবং সময় পূর্ণ হইলে ভারতে সমগ্র সরকারী যন্ত্রটি কংগ্রেস দলের হাতে আসিবে। ইহার ফলে প্রাপ্ত নৈতিক লাভ হইবে অপরিসীম এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির কল্যাণে আমাদের ভাগে যে বস্তুগত

লাভ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা ইহাকে আমি অনেক বেশি মূল্যবান বিবেচনা করি। দ্বিতীয়ত, দুর্বলমনা কংগ্রেসসেবীদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার স্বাদ আমাদিগকে নির্যাতন ও ত্যাগ বিজড়িত আরো কাজে প্রণোদিত করার জন্য শক্তিশালী উৎসাহ যোগাইতে পারে এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করিতে পারে। তৃতীয়ত, ইহা তবু বাহির হইতে নয়, ভিতর হইতে প্রাদেশিক সরকারগুলির মাধ্যমে ফেডারেশন প্রবর্তনের বিরোধিতা করায় কংগ্রেসকে সক্ষম করিয়া তুলিতে পারে এবং যদি এই দ্বিবিধ বিরোধিতার ফলে ফেডারেশনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত-ভাবে পর্যুদস্ত হয় তবে কংগ্রেস আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করিবে।

সর্বশেষ হইলেও যাহা নগণ্য নয় তাহা হইল এই যে, ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে কংগ্রেস মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নিজস্ব প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতে ও বহির্বিশ্বে এ কথা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে ১৯৩৫-এর সংবিধানের সীমার মধ্যে থাকিয়া দূরপ্রসারী সামাজিক পুনর্গঠনের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। এই অভিজ্ঞতা কংগ্রেসকে ও সাধারণভাবে দেশকে দিল্লী ও হোয়াইটহলের প্রতিক্রিয়ার দুর্গের উপর চরম আঘাত হানার জন্য মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে প্রস্তুত করিবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্তোষ অনেক বেশি বাড়িবে যদি দেখি যে ক্ষমতা গ্রহণের এই চতুর্বিধ ফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের ক্ষমতা গ্রহণে আস্থা নাই কিন্তু যাঁহারা ইহা ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া মানিতে বাধ্য তাঁহারা আমাদের দেশবাসীগণকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির জন্য একটি দশবার্ষিক কর্ম-সূচীর জল্পনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতে চান। ঐ জল্পনার সূত্রপাত করিয়াছেন কিছু কংগ্রেস নেতা যাঁহারা সম্ভবত ভবিষ্যতের জন্য সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত কর্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে উৎসুখ।

ইহা আনন্দের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসের মুখ্যতম নেতারা শুধু মন্ত্রিত্ব হইতেই দূরে সরিয়া থাকেন নাই, তাঁহারা আইন-সভাগুলিরও বাহিরে রহিয়াছেন। কংগ্রেস যে সংসদীয় কার্যকলাপের গোলকধাঁধায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না এবং সেইভাবে একটি পুরাপুরি সাংবিধানিক সংস্থা হইয়া দাঁড়াইবে না— এ সম্বন্ধে ইহা জামিনস্বরূপ হইয়া থাকিবে। (আমি এ ক্ষেত্রে 'সাং-বিধানিক' শব্দটি ইহার সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতেছি।) এই নেতৃবৃন্দ ইহা দেখিবেন যে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যেন স্বস্থানে থাকিয়া কংগ্রেসী ঊর্ধ্বতন কর্তৃ-পক্ষের নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধী যে তাঁহার

সাময়িক অবসর গ্রহণ সত্ত্বেও চিরজাগ্রত থাকিয়া ঘনিষ্ঠ আগ্রহে ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ রাখিয়াছেন তাহা হইতে প্রত্যেকের মনে এই প্রত্যয় জন্মিবে যে প্রয়োজন হইলে এবং খুব সম্ভব সে প্রয়োজন হইবে, তিনি আবার সম্মুখে আসিয়া কংগ্রেসকে সাংবিধানিক কাজ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাইতে ইতস্তত করিবেন না। কংগ্রেস যাহাতে ভারতের জন্য 'পূর্ণ স্বরাজে'র শেষ সংগ্রাম চালাইতে পারে সে জন্য তিনি 'গণ-সত্যাগ্রহে'র পতাকা তুলিয়া ধরিবেন।

আগস্ট ১৯৩৮

তথ্য ও উল্লেখ-পঞ্জী

পৃ. ১৫ ॥ স্বাধীনভাবে বিচরণে বাধা
পৃ. ৩১৭ ॥ রোমাঁ রোলাঁ কি ভাবেন

ভারতপ্রেমিক মঁ রোমাঁ রোলাঁ। ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসাল জে. ডব্লিউ টেলর সুভাষচন্দ্রকে বাদগাস্টাইন-এ পত্রযোগে সতর্ক করে দেন যে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে গেলে মুক্ত থাকার আশা যেন না করেন। এই পত্র পাবার পর সুভাষচন্দ্র মনস্বী রোমাঁ রোলাঁর মতামত চেয়ে পাঠান। তারও বছর খানেক পূর্বে সুভাষচন্দ্র রোলাঁকে *The Indian Struggle, 1920-34* গ্রন্থটি তাঁর সুইজারল্যান্ডস্থিত ভেলেনুভ-এর 'ওলগা ভিলা' নামক বাসভবনে পাঠালে রোমাঁ রোলাঁ ১৯৩৫, ২২ ফেব্রুয়ারি পত্রযোগে তাঁকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে গ্রন্থটিকে অনিবার্য সংযোজনরূপে বিবৃত করে রোলাঁ লেখেন যে তাঁর মতো একজন কর্মব্যস্ত মানুষ দলীয় মনোভাব-বর্জিত মন নিয়ে সব-কিছু বিচার করেছেন — এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

১৯৩৫, ৩ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অহিংস প্রতিরোধ, গান্ধী-নেতৃত্ব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন ইত্যাদি নানা সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। রোলাঁ সে-সম্পর্কে বিবরণী তাঁর ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। (Extracts from Romain Rolland's Diary No. 260 & No. 262 : Romain Rolland and Gandhi Correspondence : Publications Division. Govt. of India) এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণী সুভাষচন্দ্র লিপিবদ্ধ করে রোলাঁর অনুমোদন নিয়েছেন 'রোমাঁ রোলাঁ কি ভাবেন' শীর্ষক বিবৃতিটি তারই সংকলন।

পৃ. ৭৬ ॥ অভিভাষণ : হরিপুরা অধিবেশন

পরিকল্পনা কমিশন গঠন : ১৯৩৮ জানুয়ারিতে লন্ডনে থাকাকালীন সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা (গুজরাত) কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি সুদূরপ্রসারী ঘটনা। হরিপুরা অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণের বহুমুখিনতার মধ্যে পরবর্তীকালে সব চাইতে কার্যকর স্থান গ্রহণ করেছে জাতীয় 'পুনর্গঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন'। সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান কার্যকর করবার প্রস্তাব তিনি হরিপুরা ভাষণে দেন। তাঁর এই প্রস্তাবের পরিণতিতে

১৯৩৮-এর ১৬ ডিসেম্বর তিনি নিখিল ভারত প্ল্যানিং কমিটির উদ্‌বোধন করেন। সুতরাং, ১৯৫১ সালে ভারতে গঠিত প্ল্যানিং কমিশনের জনক কার্যত সুভাষচন্দ্র। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর পৃষ্ঠভূমিকা ও উপস্থাপন সম্পর্কে অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসুর "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১৪২ ॥ মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিত্ব-সংকট

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসের কিছুকাল পর থেকেই সংকট দেখা দেয়। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী শরীফের পদত্যাগ মে মাসে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হয়। শিক্ষা-সচিব নারী নির্যাতনের অপরাধে দণ্ডিত একজন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তারই ফলে এই পদত্যাগ।

অতঃপর মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় মহারাষ্ট্রীয় (মারাঠা-ভাষী) ও মহা-কোশলীয় (হিন্দি-ভাষী) দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এই দুই দলের মধ্যে মন্ত্রী নির্বাচন ও বিষয়-বিভাগ নিয়ে বিবাদের সূচনা হয়। প্রধান মন্ত্রী খারে মহা-রাষ্ট্রীয়। ১৯৩৮-এর মে মাসে পার্লামেন্টারী কমিটির সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যস্থতায় সাময়িক মীমাংসা হলেও মাস দুইয়ের মধ্যেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। খারে এবং অপর দুই মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রী গোলে এবং দেশমুখ পদত্যাগ করলেও পার্লামেন্টারী কমিটির নির্দেশ ছাড়া তিন মহাকোশলীয় মন্ত্রী পদত্যাগে অস্বীকার করলে, মধ্যপ্রদেশের গভর্নর মন্ত্রীত্রয়ের (মহারাষ্ট্রীয়) পদত্যাগ গ্রহণ এবং অপর তিন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করে খারেকেই নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে আহ্বান করেন। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে খারে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীসহ পদত্যাগ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি খারেকে আবার নেতৃত্বপদপ্রার্থী হতে দেন নি। খারের বিরুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের এবং গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দানের অভিযোগ ওঠে।

পৃ. ১৮৮ ॥ বসু-জিন্না পত্র-বিনিময়

মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিন্নার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মীমাংসার যে আলোচনা শুরু করেছিলেন তারপর ১৯৩৮-এর মে মাস থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিঃ জিন্নার যে পত্র-বিনিময় হয়েছে সেগুলি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। পত্রগুলি সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে, সংযত ভাষায়, সৌজন্য সহকারে রচিত এবং স্বয়ংব্যাখ্যাকৃত।

পৃ. ২১৩॥ আসামে নতুন মন্ত্রীসভা

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পর তাঁর উদ্যোগে আসামে প্রতিক্রিয়াশীল সাদুল্লা মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গোপীনাথ বরদোলই-এর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ইতিপূর্বে কংগ্রেস-নেতৃত্ব কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে অনমনীয় থাকায় বাংলায় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসীন হতে সক্ষম হন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি এই যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

নির্দেশিকা